২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ ■ আনন্দবাজার প্রকাশন ■ সাত টাকা

আনন্দমেলা

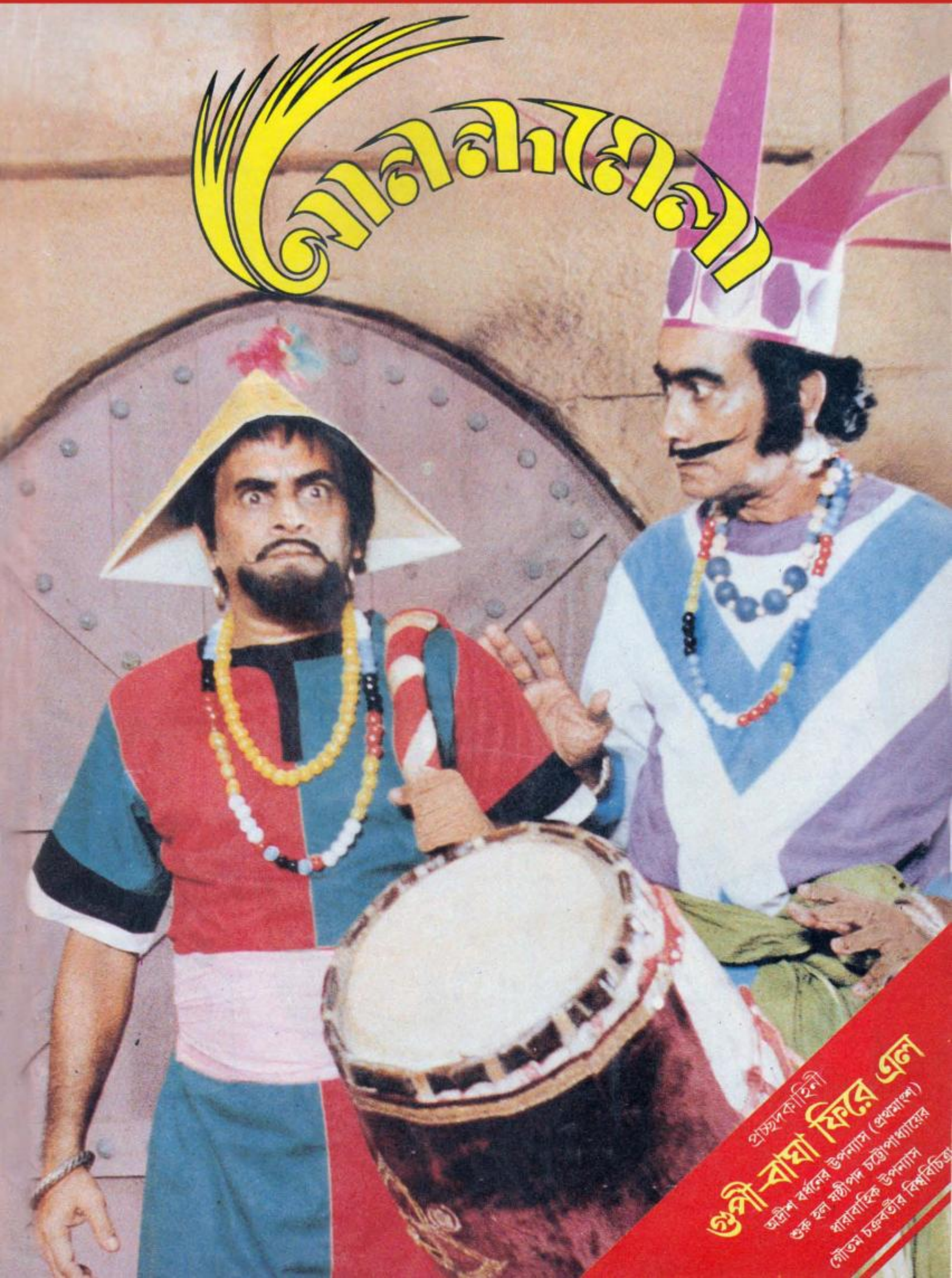

প্রচ্ছদকাহিনী
গুপী-বাঘা ফিরে এল
অতীশ বর্ধনের উপন্যাস (প্রথমাংশ)
শুরু হল ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস
গৌতম চক্রবর্তীর বিশ্ববিচিত্র

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

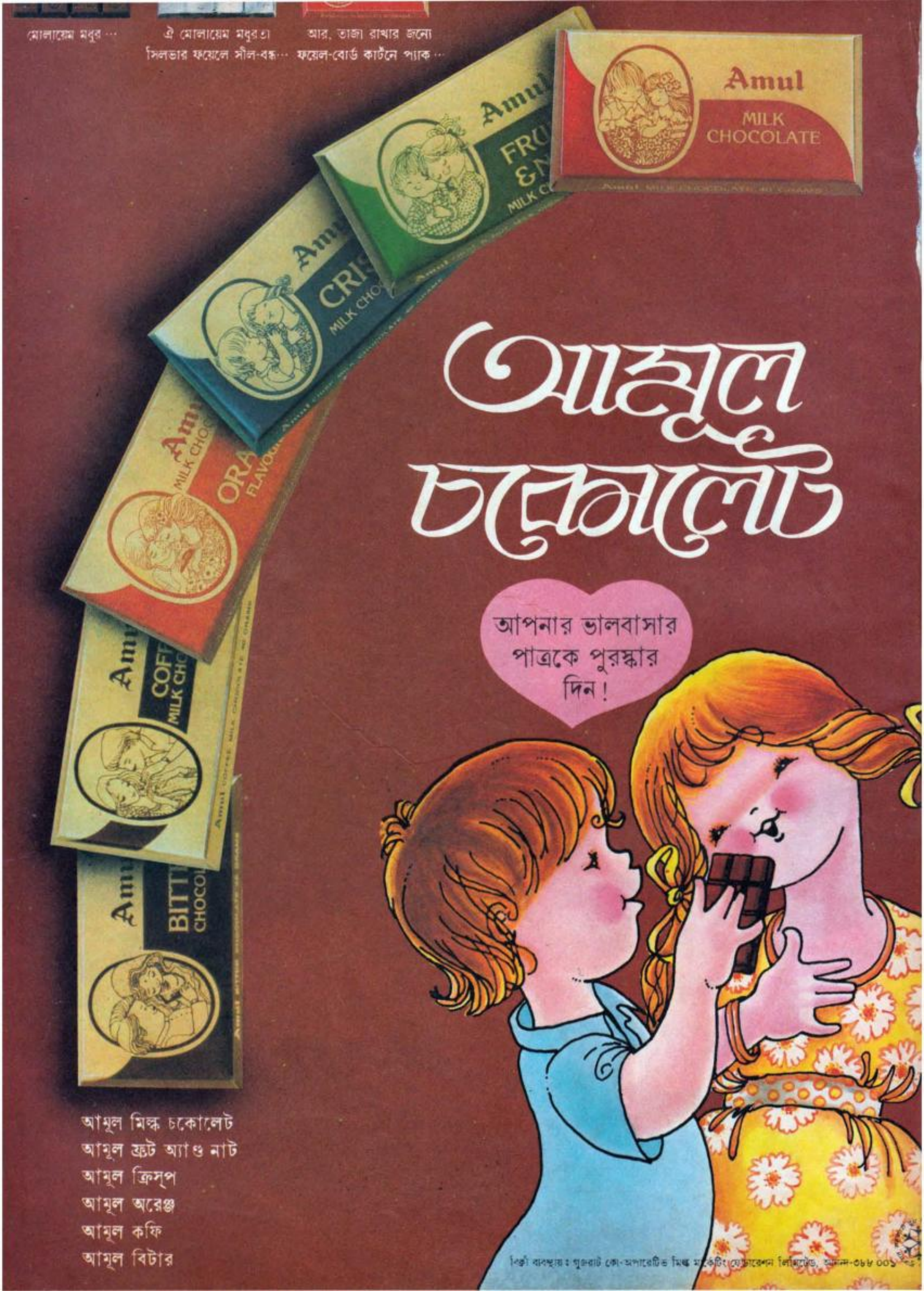

মোলায়েম মধুর ···
ঐ মোলায়েম মধুরতা
সিলভার ফয়েলে সীল-বন্ধ···
আর, তাজা রাখার জন্যে
ফয়েল-বোর্ড কার্টনে প্যাক ···
Amul
MILK CHOCOLATE
আমূলে চকোলেট
আপনার ভালবাসার
পাত্রকে পুরস্কার
দিন!
আমূল মিল্ক চকোলেট
আমূল ফ্রুট অ্যাণ্ড নাট
আমূল ক্রিস্প
আমূল অরেঞ্জ
আমূল কফি
আমূল বিটার
বিক্রী ব্যবস্থায়ঃ গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং কোরপোরেশন লিমিটেড, আনন্দ-৩৮৮ ০০১

আপনার বাচ্চাকে দিন তরিতরকারির পুষ্টি!

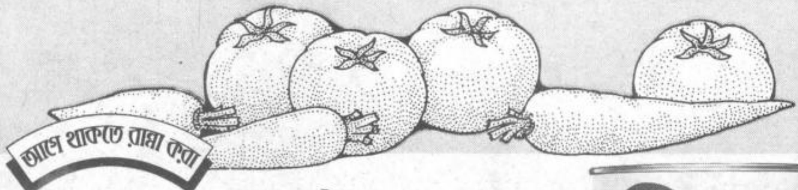

ফ্যারেক্স®-ভেজ

৬মাস বয়েস থেকে।

নতুন ফ্যারেক্স-ভেজ, ভিটামিন-সমৃদ্ধ তরিতরকারি—গাজর, টোম্যাটো আর মুগের ডালের *স্বাভাবিক* পুষ্টিগুণে ভরপুর।

আগে থাকতে রান্না করা, ফলে আপনার বাচ্চার কোমল হজমশক্তির উপযোগী।

ফ্যারেক্স-বেড়ে ওঠার এক স্বাদভরা উপায়।

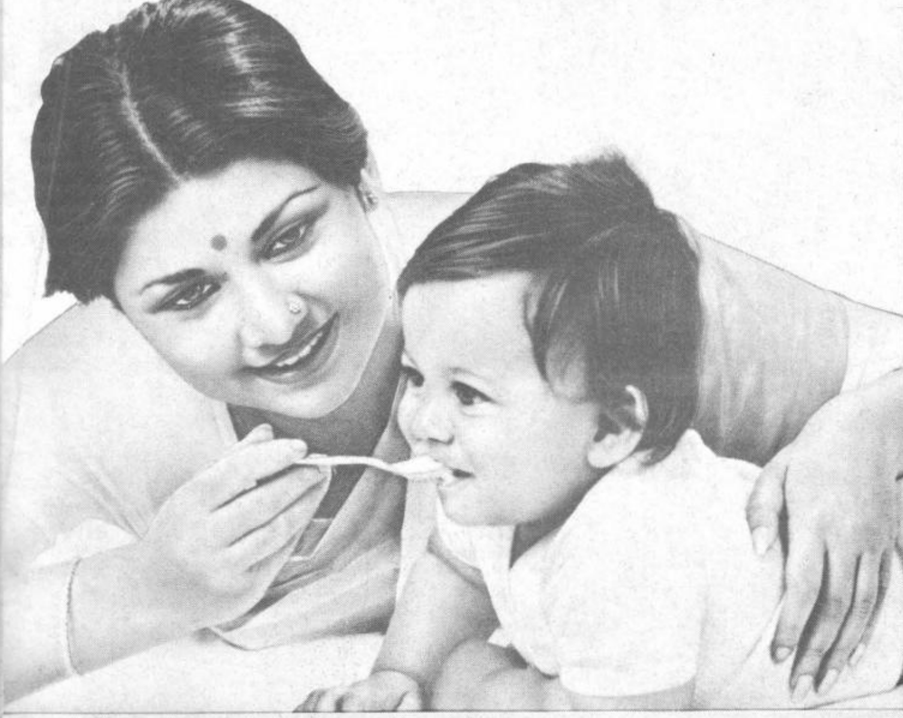

এখন ফ্যারেক্স দিয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভারে পাবেন: ১.দুধযুক্ত ফ্যারেক্স সিরিয়াল ২.ফ্যারেক্স-ভেজ ৩.ফ্যারেক্স-এগ্

GX/31/244BEN

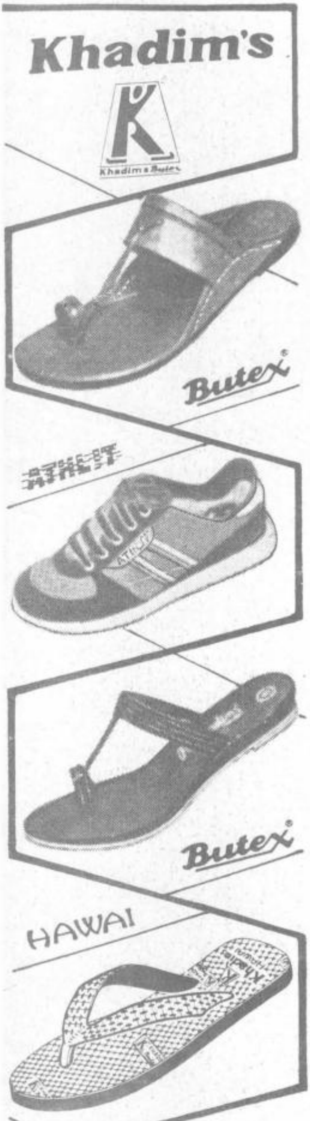

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি অদ্রীশ বর্ধন ৭০

গল্প

বাদামওলা আর টুলু শিশির কর ৬১
ডাক্তারবাবুর ম্যাপ চুনীলাল রায় ৯১

প্রচ্ছদকাহিনী

গুপী-বাঘা ফিরে এল ১২

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৮
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৩২

বিজ্ঞানবিচিত্রা

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ২৫
ওয়ের্নেহের ভন ব্রাউন চঞ্চল পাল ৩৯
জীবন্ত ফসিল সিলাকান্থ জয় সেনগুপ্ত ৫২

বিশ্ববিচিত্রা

অঙ্ক-ওলিম্পিয়াড গৌতম চক্রবর্তী ৫৫

কমিক্স

রোভার্সের রয় ২৩, টারজান ৩১, গাবলু ৬৯, টিনটিন ৮৭, পঙ্করঙ্ক ৮৯

কবিতা

শরতের গান শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ২১
এই শরতে সৌমেন্দু সামন্ত ২১

কেরিয়ার গাইড

ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজি অমর দাশ ৫৯

বিদ্যালয়-পরিচিতি

নব বারাকপুর উপনিবেশ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরেশচন্দ্র সরকার ৮৩

খেলাধুলো

হাবিবই সেরা সুধীর কর্মকার ৪১
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪২
মজার খেলা সেপক টাকরো চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪
'হিরো' একজনই, মার্ক টেলর সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৪৫
সোতো চলেছেন আকাশ ছুঁতে শ্যামল দত্ত ৪৬
খেলার খবর ৪৭
গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি ৪৯, জন ম্যাকেনরো ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, চেনা না-চেনা ৭, কুইজ ৮, আকাশ চেনো ২৬, আকাশে ওড়ার কথা ৩৭, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৪৮, শব্দসন্ধান ৬৭, কে প্রথম ৭৮, নিজের হাতে বানাও ৮৬, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

প্রচ্ছদ

নিমাই ঘোষ

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত.

৫২

এক সময় পৃথিবীর বুকে অবাধে ঘুরে বেড়াত এমন অনেক প্রাণীই এখন লোপ পেয়ে গেছে। অথচ লক্ষ লক্ষ বছরেও অদ্ভুতভাবে টিকে গেছে একটি মাছ। নাম

১২

সত্যজিৎ রায় করেছিলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি। তারপর দেখতে দেখতে কুড়ি বছর কেটে গেল। মাঝখানে 'হীরক রাজার দেশে'। আবার কয়েক বছর পর গুপী-বাঘা ফিরে আসছে। সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে সন্দীপ রায়ের নতুন ছবি ওদের নিয়েই। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির পর থেকেই গুপী-বাঘার নাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন যে ছবিটি তৈরি হচ্ছে, তাতে আবার ওদের মজার নানা কাণ্ডকারখানা দেখা যাবে। রঙিন ছবি। আরও আকর্ষণ এই ছবির গান, যার সুর দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

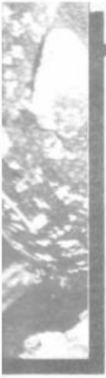

সিলাকান্থ। এত বছরেও এই মাছের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আর যেটুকু বা পরিবর্তন হয়েছে, তাও খুব সামান্য। সিলাকান্থকে নিয়ে তাই আবার নতুন করে গবেষণা শুরু হয়েছে।

৫৫

অঙ্ক নিয়েও যে ওলিম্পিক হয়, সে-খবর অনেকেরই জানা নেই। জানার কথাও নয়। কারণ, খেলাধুলোর ওলিম্পিকের খবরই বেশি প্রচারিত হয়। অঙ্ক ওলিম্পিকে অংশ নেয় সারা বিশ্বের অঙ্ককুশলী ছেলেমেয়েরা। কেমন এই ওলিম্পিক, সে-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে একটি নিবন্ধে।

৩২

এই সংখ্যা থেকে নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু হল 'সোনার গণপতি হিরের চোখ'। লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়।

৪৫

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে নতুন এক তারকার আবির্ভাব ঘটেছে। নাম মার্ক টেলর। অস্ট্রেলিয়ার এই ন্যাটা ব্যাটসম্যান আগেও টেস্ট খেলেছেন। আর এবারই বিপুলভাবে সবার নজর কেড়ে নিলেন। ইনিংসের সূচনা করতে এসে তিনি একাই যে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তাতেই ভরাডুবি ঘটেছে ইংল্যান্ডের।

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদকাহিনী

শারদোৎসব

আশাপূর্ণা দেবীর বড়গল্প

ভূত নয়তো কী

অদ্রীশ বর্ধনের উপন্যাস (শেষাংশ)

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি

Disproportionate
Returns for
SMALL
INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:
1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?

ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

মাইকেল জ্যাকসন ও তাঁর গান

মাইকেল জ্যাকসন সম্পর্কে স্বপ্নাতীত সরকার ও গৌতম চক্রবর্তীর লেখা দুটি পড়ে ভীষণ ভাল লাগল। লেখা দুটি থেকে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। স্বপ্নাতীত সরকারের লেখা 'মাইকেল জ্যাকসন'-এ একটি ভুল চোখে পড়ল। লেখক লিখেছেন, অ্যালবাম 'ব্যাড'-এ ৯টি গান সম্পর্কে। কিন্তু অ্যালবাম ব্যাডের মোট গানের সংখ্যা ১০টি। এ ছাড়া গানগুলির মধ্যে লেখক 'লিভ মি অ্যালোন' নামে একটি গানের উল্লেখ করেছেন, ব্যাড-এর মধ্যে কিন্তু ওই নামের কোনও গান নেই। অন্য দুটি গানের নাম

হল—'ডার্টি ডায়না' ও 'লিবারিয়ান গার্ল'। তবে লেখা দুটি খুবই সুন্দর। যদি আগামী কোনও সংখ্যায় মাইকেল জ্যাকসনের পুরোপাতা রঙিন পোস্টার ছাপেন, ভাল হয়।

অরিজিৎ হাজরা
ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩

নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি আমি। ৯ অগস্ট সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'মাইকেল জ্যাকসন', লিখেছেন স্বপ্নাতীত সরকার ও গৌতম চক্রবর্তী। দুটি লেখাই খুব ভাল লাগল। মাইকেল জ্যাকসনের জীবনের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। তাঁর গানের অ্যালবাম নিয়ে যদি আলাদা একটি লেখা থাকত, ভাল হত।

মনামী সিংহরায়
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

'আনন্দমেলা' ৯ অগস্ট সংখ্যায় মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী পড়লাম। পড়ে আমার দারুণ ভাল লাগল, তাই অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না। অনেকদিন ধরে জ্যাকসন সম্পর্কে অনেক কথা জানার আগ্রহ ছিল, এখন তা সম্পূর্ণ হল।

দেবাশিস কর্মকার
নূতনচটি, বাঁকুড়া
টুকু দেবনাথ
হাওড়া-১
উমেশচন্দ্র ঘোষাল
চন্দননগর, হুগলি
সম্রাট সেনগুপ্ত
কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরা

মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে আনন্দমেলা ৯ অগস্ট সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী পড়লাম। লেখা দুটি পড়ে জ্যাকসন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। তবে তাঁর গানের কথা যেভাবে আলোচিত হয়েছে, তাঁর নাচের সম্পর্কেও সেরকম কিছু আলোকপাত করলে ভাল লাগত।

অরিজিৎ শীট
ঘাটশিলা, বিহার

নিয়মিত আনন্দমেলা পড়ি আমি। ৯ অগস্ট সংখ্যায় মাইকেল জ্যাকসন সম্পর্কিত লেখা দুটি পড়ে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। মাইকেল জ্যাকসন আমার প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী এবং ড্যান্সার। আমি বেশ কয়েকটি পত্রিকাকে মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে লেখা প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়ে যখন প্রায় হতাশ, তখনই আপনাদের পত্রিকায় জ্যাকসনকে নিয়ে লেখা দেখে চমকে উঠলাম।

অরুণ ঘোষ
জগাছা, হাওড়া

গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়

এক বৎসর —
১৮২·০০ টাকার পরিবর্তে
১৫৫·০০ টাকা (২৬ সংখ্যা)
দুই বৎসর —
৩৫৪·০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০·০০ টাকা (৫২ সংখ্যা)

আপনি যদি গ্রাহক হতে ইচ্ছুক হন তবে সত্বর আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় ড্রাফট আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের নামে নিচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

কলাবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

নিয়মিত আমরা আনন্দমেলা পড়ি। 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগটি প্রকাশের পর থেকে আমরা আমাদের কেরিয়ার সম্পর্কে অনেকরকম চিন্তা-ভাবনা করতে পারছি। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি, এই বিভাগে প্রায় সব সংখ্যাতেই বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার তৈরির পরামর্শ থাকে। আমরা যারা কলাবিভাগ নিয়ে পড়াশুনো করছি, তাদের জন্যে কেরিয়ার গাইড বিভাগে কিছু পরামর্শ প্রকাশ করলে ভাল হয়। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি বা দর্শন নিয়ে পড়লে কি চাকরি শুধু মাত্র শিক্ষকতাতেই সীমাবদ্ধ ? বিশেষ করে ভূগোল নিয়ে যারা পড়াশুনো করছে, সেই ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার দিকে বা অন্যান্য চাকরিতে কীরকম সুযোগ আছে যদি জানান খুব উপকার হবে।

স্বাতী সেন, গৌতম গুপ্ত, রজত রায়, অরিন্দম পালধি, কিংশুক গুপ্ত, রণজয় শর্মা, মহুয়া দাশগুপ্ত, মুমু রায় ও দোলন পাল
পাইকপাড়া, কলকাতা-৩৭

মিলি মণ্ডল
মছলন্দপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

সম্পাদকীয় উত্তর : কেরিয়ার গাইডে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়, এ-কথা ঠিক নয়। আমরা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিভাগে একটি পরামর্শ প্রকাশ করেছি। তবে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে যারা পড়াশুনো করছে তাদের সুযোগ একটু বেশি। কলা বিভাগ নিয়ে পড়াশুনো করলে অনেক রকম সুযোগ আছে। যেমন স্নাতক শ্রেণী পাশ করার পর ডব্লিউ· বি· সি· এস· বা আই· এ· এস· পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাওয়া যায়। অর্থনীতি নিয়ে যারা পড়ছে, তারা ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিসের জন্যও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে পারে। এ ছাড়া এম· এ· পরীক্ষায় ভাল ফল করলে গবেষণার এবং অধ্যাপনার সুযোগ মিলতে পারে।

আমরা অনেক ফুল, পাখি, জীবজন্তু, স্মৃতিস্তম্ভ, মন্দির, দ্রষ্টব্য অনেক স্থান ও বিচিত্র সব বস্তুর নাম জানি, কিন্তু ফোটো দেখে সব চিনতে পারি না। এই সংখ্যায় শুরু হল ফোটো চেনার নতুন বিভাগ। প্রতি সংখ্যায় চেনা না-চেনা নানা বিষয়ের ফোটোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এই বিভাগে। প্রতিটি ফোটোর নীচে তোমাদের লেখার সুবিধের জন্য থাকবে ডট্‌স লাইন। ফোটো দেখে নাম লেখো। তারপর আগামী সংখ্যার উত্তর দেখে মিলিয়ে নিও ঠিক লিখলে কি না। এই সংখ্যায় থাকল কয়েকটি পাখির ফোটো।

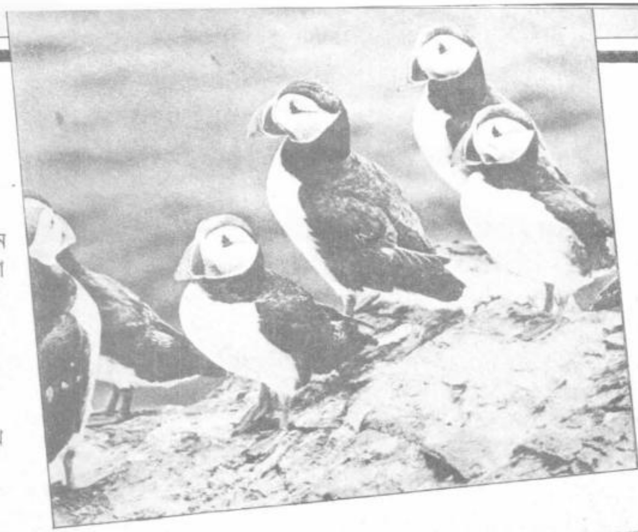

ক ....

খ ....

গ ....

ঘ ....

ঙ ....

চ ....

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

কাস্পিয়ান ও টিটিকাকা

বিশ্বে ভূপরিবেষ্টিত সবচেয়ে বড় সাগর বা লবণ হ্রদ হল কাস্পিয়ান সাগর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরানে অবস্থিত এই কাস্পিয়ান সাগর লম্বায় ৭৫০ মাইল এবং চওড়ায় ১৩০ – ৩০০ মাইল। উত্তরে খুব অগভীর হলেও এই সাগর মধ্য ও দক্ষিণাংশে ৩,১৯০ ফুট গভীর। সাগরের তলদেশে আছে হাইড্রোজেন সালফাইড, ফলে ১,৫০০ ফুটের নীচে কোনও প্রাণের জন্ম সম্ভব হয় না।

বিশাল ভল্‌গা নদীর জল কাস্পিয়ান সাগরে পড়ে। সাগরের জল কোনওদিকে বেরোবার পথ পায় না। গলে-যাওয়া নুন তাই জমতে থাকে সারা বছর। তবু একটি দিক ছাড়া অন্যত্র এই সাগরের জলে নুনের ভাগ কম।

জল কিছুটা চুঁয়ে যায়, কিছুটা যায় বাষ্প হয়ে উড়ে। তাই প্রতি বছর কাস্পিয়ানের জল কয়েক ইঞ্চি নেমে যায়। ১৯৩০ সাল থেকে এর জল আট ফুটেরও বেশি নেমে গেছে। ধীবরদের গ্রাম ও বন্দরের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন। কাস্পিয়ানে যাতে বেশি জল এনে ফেলা যায় তাই তাঁরা উত্তরমুখী পেচোরা নদীর সঙ্গে ভল্‌গার শাখানদী কামা নদীর সংযোগসাধনের কথা ভাবছেন। এর জন্য কিছু বিস্ফোরণও ঘটানো হয়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পেচোরা নদীর উষ্ণ জল অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে সুমেরু মহাসাগরের তাপমাত্রা কমে যাবে এবং এর ফলে আবহাওয়ায় একটা বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ সীমারেখা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানচিত্রীরা ভাবতেন কাস্পিয়ান হল উত্তর সাগরের একটি অংশ। আঠারো ও উনিশ শতকে এশিয়ায় জার সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় রুশরা কাস্পিয়ান নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন। তবে মাত্র ১০০ বছর আগে এই সাগরকে ব্যাপক বাণিজ্যিক পরিবহণের উপযোগী করে তোলা হয়। ককেসাস উপকূলে বাকু তৈলক্ষেত্র থেকে তেলের বড় বড় জাহাজ পশ্চিম রাশিয়ার শহরগুলিতে যায়। কাস্পিয়ান সাগর রাশিয়াকে দিয়েছে প্রথম শ্রেণীর মৎস্য শিল্প।

টিটিকাকা হ্রদ

কাস্পিয়ান সাগর (মানচিত্র)

দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় হ্রদ টিটিকাকা। বিশ্বে নৌ-পরিবহণযোগ্য সর্বোচ্চ হ্রদও এই টিটিকাকা। 'মেঘের সরোবর' নামে পরিচিত এই হ্রদ লম্বায় ১৩০ মাইল, চওড়ার গড়ে ৩৫ মাইল (সবচেয়ে চওড়া ৫০ মাইল)। ৩০টিরও বেশি দ্বীপ সমেত মোট হ্রদ-এলাকা ৩,৫০০ বর্গমাইল। সর্বোচ্চ গভীরতা ১,২০০ ফুট। তবে সচরাচর ৯০০ ফুটের বেশি গভীর নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই হ্রদ আড়াই মাইল ওপরে।

টিটিকাকার কিছু অংশ পড়েছে বলিভিয়ায়, আর বেশি অংশটা পেয়েছে পেরু। বহু নদী ও ঝরনার জল টিটিকাকায় এসে পড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নদীর উৎপত্তি হয়েছে তুষারাবৃত কাছের শৃঙ্গে। দক্ষিণে টিটিকাকার জল দেশাগুয়াদেরো নদী বেয়ে পড়ে একটি লবণ হ্রদে। সে-হ্রদের নাম পুপু।

পেরুর পুনো হচ্ছে টিটিকাকার সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। বলিভিয়ার রাজধানী লা পাজ রেলপথে ৪০ মাইল দূরে। বলা হয়, টিটিকাকারই একটি দ্বীপে প্রায় ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে দেবতারা ইনকা সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন। হ্রদের কয়েক মাইল দক্ষিণে প্রাচীন তিয়াহুয়ানাকো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তিয়াহুয়ানাকোর বংশধর অয়মারা ইন্ডিয়ানরা আছেন হ্রদের চারপাশে।

বনবেড়াল থেকেই টিটিকাকা নামের উৎপত্তি। বনবিড়ালকে বলা হয় টিটি। তারা থাকে পাথুরে দ্বীপগুলিতে, যাদের বলা হয় কারকা। সাঁতরে তারা ডাঙায় আসে খাবারের খোঁজে।

১৯৬৯ সালে সমুদ্রবিজ্ঞানী জ্যাক্‌স কস্তো টিটিকাকার জলের নীচে ডুবোজাহাজ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে এক ধরনের ব্যাঙ দেখতে পেয়েছেন। গভীর জলের ওইসব ব্যাঙ লম্বায় দু' ফুট।

প্রশ্ন

(১) কাম্পুচিয়ার রাজধানীর নাম কী ? **স্বরূপশোভন মুখোপাধ্যায়,** হিন্দু স্কুল ।
(২) 'দ্য কার্ডিনাল্স মিস্ট্রেস' কার লেখা ? **ধ্রুবজ্যোতি সাটিয়ার ও মৈনাক ঝাঁ।**
(৩) এবারের এফ.এ.কাপ চ্যাম্পিয়ান কে ? **মানস ভৌমিক,** কল-৪৫ ।
(৪) চিনের আইন-পরিষদের নাম কী ? **কৌশিক মিত্র,** কোন্নগর ।
(৫) সোল ওলিম্পিকে ভারতীয় টিমের মার্চ পাস্টের সময় জাতীয় পতাকা কার হাতে ছিল ? **দুলাল দাস,** রেলওয়ে হাই স্কুল, মরিয়ানি ।

(৬) ভরতের দুই ছেলের নাম কী ? **গৌতম মাইতি,** দুর্গাপুর ।
(৭) 'হেমাটোলজি' কী ? **সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী,** রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদা ।
(৮) 'Hill Women' ছবিটি কে এঁকেছেন ? **আব্দুল বারি,**

কুইজ

পার্কসার্কাস ।
(৯) কোন ক্রিকেটার 'দ্য মাস্টার' নামে পরিচিত ? **শুভ্রজিৎ সেনগুপ্ত,** মেদিনীপুর ।
(১০) 'বেনহুর' বইটি কার লেখা ? **সন্তু ও অন্তু সেনগুপ্ত,** বহরমপুর ।
(১১) সত্যজিৎ রায়ের 'গণশত্রু' ইবসেনের কোন নাটক অবলম্বনে রচিত ? **হারু তালুকদার,** আসানসোল ।
(১২) প্রেসিডেন্টস কাপে ভারতের অধিনায়কের নাম কী ? **তনু বসু,** আগরতলা ।
(১৩) তামিল ভাষায় জলকে কী বলা হয় ? **কিংশুক গুপ্ত,** ঝাড়গ্রাম ।
(১৪) বাংলাদেশে রামধনুকে কী বলা হয় ? **সঞ্চয়িতা রায়,** কল-৪৫ ।
(১৫) কার আত্মজীবনীর নাম 'স্যান্ডি স্টর্ম' ? **অঙ্কুর ঘোষ,** হিন্দু স্কুল, কলকাতা ।
(১৬) প্রধানত কোন্ দেশে 'ডিঙ্গো' নামে এক ধরনের বন্য কুকুর দেখা যায় ? **এন-কে-চৌধুরী,** উত্তরপাড়া ।
(১৭) ভারতের কোন্ রাজ্যে মহিলার সংখ্যা সর্বাধিক ? **অপরূপা মাহাত,** রানি বিনোদমঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম ।
(১৮) 'আসামী হাজির' উপন্যাসটি কার লেখা ? **ডোডো দাশগুপ্ত,** কল-১৪ ।
(১৯) কোন উপন্যাসের নায়িকার নাম 'শ্যামা' ? **অপরাজিতা গুপ্ত,** ঝাড়গ্রাম ।
(২০) টিনটিনের চিত্রকাহিনীতে যে প্রোফেসর ক্যালকুলাসকে আমরা দেখি, তাঁর পুরো নাম কী ? **বর্ণালী পাণ্ডে,** লালগোলা শৈলজা মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল, মুর্শিদাবাদ ।
(২১) 'কিস্তি' কথাটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ? **অরুণ মণ্ডল ও বরুণ দত্ত,** বেলডাঙা ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন ।
(২) গথাব ।
(৩) কোচিন ।
(৪) অন্নদাশঙ্কর রায়ের ।
(৫) দ্য টেমপেস্ট ।
(৬) মাইক টাইসন ।
(৭) অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু ।
(৮) রাডইয়ার্ড কিপলিং ।
(৯) ঋষি অরবিন্দের ।
(১০) ক্রিকেট ।
(১১) সোভিয়েত ইউনিয়নের খারকভ কারাগার ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

রাডইয়ার্ড কিপলিং

(১২) ১০ ।
(১৩) নেলসন ম্যান্ডেলাকে ।
(১৪) ৩৩তম ।
(১৫) মহারাষ্ট্রে ।
(১৬) পেট্রোলিয়মকে ।
(১৭) জন ওয়াকার ।
(১৮) শিলং ।
(১৯) কল্পনা লাজমি ।
(২০) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ।

কুইজ

বিষয় : মহাভারত

(১) মহাভারতের আসল নাম কী ?

(২) কৌরবরা ১০০ ভাই ও মাত্র এক বোন। তাঁর নাম কী ?

(৩) দুর্যোধন কর্ণকে কোন্ রাজ্যের রাজা করেছিলেন ?

(৪) মহাভারতের কোন্ চরিত্রের জন্ম হয়েছিল একটি পাত্রে ?

(৫) কবচ-কুন্ডল পাওয়ার পর ইন্দ্রের দেওয়া শক্তিশেল কর্ণ কার ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন ?

(৬) রাজা বিরাটের সেবায় ছদ্মবেশে থাকার সময় যুধিষ্ঠির প্রকাশ্যে কোন নাম ব্যবহার করতেন ?

(৭) রাজা বিরাটের সভায় ছদ্মবেশে থাকার সময় ভীম কোন পেশা গ্রহণ করেছিলেন ?

(৮) শকুনির পাশা কী দিয়ে তৈরি হয়েছিল ?

(৯) পান্ডবদের কুলগুরু কে ছিলেন ?

(১০) দ্রৌপদীর অপমানের যোগ্য জবাব দিতে ভীম কার রক্তপানের শপথ নিয়েছিলেন ?

(১১) মহাভারতের যুদ্ধে প্রবীণতম যোদ্ধা কে ?

(১২) অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণী শোনাতেন ?

(১৩) সেনা-পরিচালনার সময় দ্রোণ কী ব্যূহ রচনা করেছিলেন, যা ভেদ করা শুধু অর্জুনের পক্ষেই সম্ভব ছিল ?

(১৪) অর্জুনের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধে কর্ণের সারথি কে ছিলেন ?

(১৫) দ্রোণ কার হাতে নিহত হন ?

(১৬) ধৃষ্টদ্যুম্নকে কে হত্যা করেন ?

(১৭) যুধিষ্ঠির অবসর নেওয়ার পর হস্তিনাপুরের সিংহাসনে কে আরোহণ করেন ?

(১৮) পরীক্ষিতের জন্মের সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। কী সেই ঘটনা ?

(১৯) মহাপ্রস্থানের পথে পান্ডব-ভাইদের মধ্যে প্রথম কে ও কেন পড়ে গিয়েছিলেন ?

(২০) অর্জুনের কোন বংশধরকে মহাভারত আবৃত্তি করে শোনানো হয়েছিল ? ব্যাসদেবের কোন শিষ্য এই আবৃত্তি করেছিলেন ?

উত্তর : (১) জয়া। (২) দুঃশলা। (৩) অঙ্গ। (৪) দ্রোণ। (৫) ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ। (৬) কঙ্ক। (৭) পাচক। (৮) শকুনির প্রয়াত পিতার উরুর হাড় দিয়ে। (৯) ধৌম্য। (১০) দুঃশাসনের। (১১) শান্তনুর ভাই বহ্লিক। (১২) সঞ্জয়। (১৩) চক্রব্যূহ। (১৪) শল্য। (১৫) ধৃষ্টদ্যুম্ন। (১৬) ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘুমিয়ে থাকার সময় দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থামা তাঁকে পায়ে পিষে মেরে ফেলেন। (১৭) অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ। (১৮) পরীক্ষিৎ যখন মাতৃগর্ভে, অশ্বত্থামা তাঁকে মেরে ফেলেন। মৃত অবস্থাতেই তাঁর জন্ম হয়। কৃষ্ণ তাঁকে জীবিত করে তোলেন। (১৯) সহদেব। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, কেউ তাঁর সমকক্ষ নন। (২০) বৈশম্পায়ন আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন জনমেজয়কে।

পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর বন-গমন

কামাক-বনে পাণ্ডবদের নিকটে বিদুরের আগমন

ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান

যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান

কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

কর্ণের সেনাপতিত্বে কৌরবদের যুদ্ধযাত্রা

লাইসেন্স যাঁর গুলি চালাবার সেই জেম্‌স বন্ড এবার কমিক্‌সে

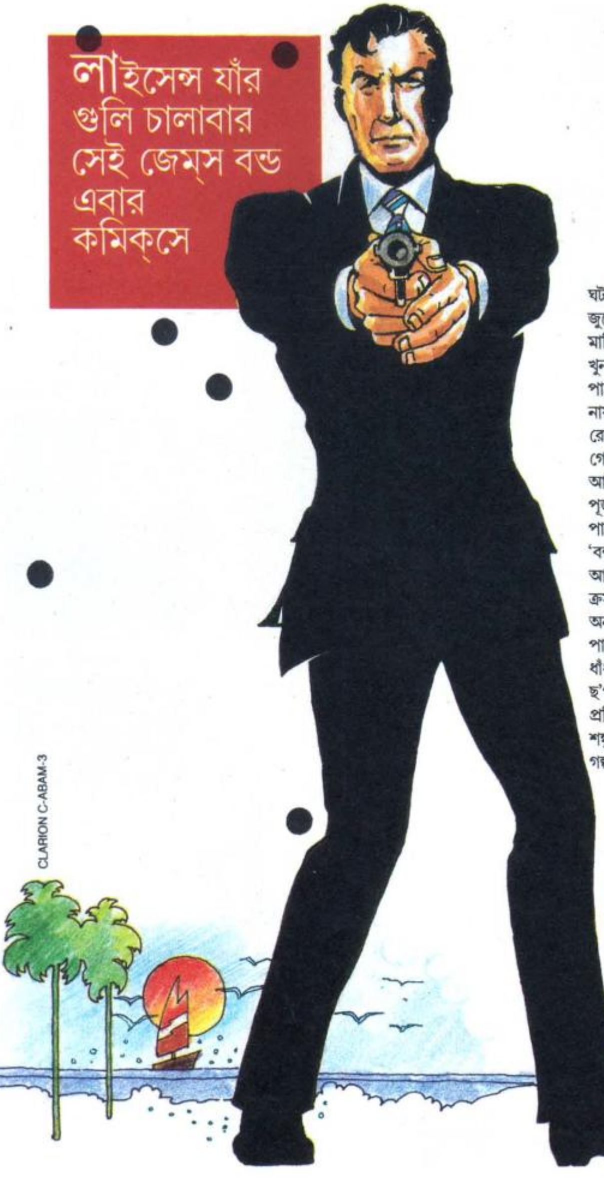

ঘটনাস্থল জামাইকা । কুড়ি হাজার একর জুড়ে জামাইকার সবচেয়ে দামি খামারের মালিক কর্নেল হ্যাভলক ও তাঁর স্ত্রী হঠাৎ খুন হলেন । তারপর ? চিফ 'এম' ডেকে পাঠালেন জেম্‌স বন্ডকে । সেই ডাকসাইটে নায়ককে ঘিরে পাতার পর পাতা, রহস্য ও রোমাঞ্চপূর্ণ কমিক । নাম ? 'একান্ত গোপনীয়' । বন্ডের বিখ্যাত 'ফর ইওর আইজ ওনলি'-র চিত্রকাহিনী ।
পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় এবার এ-ছাড়াও পাচ্ছ আরও একটি অসাধারণ কমিক 'বন্দুকের শাসন ।' শুধু এই দু'টিই নয়, আরও আকর্ষণ চারশো ঘরের সুবৃহৎ ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল (শব্দসন্ধান) । বাংলা বা অন্য আঞ্চলিক ভাষায় এত বড় ক্রসওয়ার্ড পাজল আগে আর প্রকাশিত হয়নি । ধাঁধা-মজা ছাড়াও আছে নিল ও' ব্রায়েনের ছ'পাতা জোড়া কুইজ । তা ছাড়াও প্রতিবারের মতো সাতটি উপন্যাস, শঙ্কুকাহিনী, তিনটি বড় গল্প, প্রচুর কবিতা ও গল্প এবং ভ্রমণকাহিনী ।

আনন্দমেলা

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

দাম : ৪৪·০০ টাকা

CLARION C-ABAM-3

গুপী-বাঘা ফিরে এল

গুপী-বাঘাকে কে না চেনে ! উপেন্দ্রকিশোরের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় করেছিলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি । সেই কুড়ি বছর আগে । মাঝখানে 'হীরক রাজার দেশে' । আর এখন সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে সন্দীপ রায় করছেন নতুন ছবি 'গুপী-বাঘা ফিরে এল' । এই ছবির গল্প সন্দীপ রায় এখনই প্রকাশ করে দিতে চান না । কিন্তু গুপী-বাঘার নতুন কীর্তিকাহিনী জানার জন্য ছোটদের সঙ্গে বড়রাও কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন । গুপী-বাঘাকে নিয়ে এবারের প্রচ্ছদকাহিনী । আগের দু'টি ছবির কথা তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে নতুন ছবিটির বিষয়ে সন্দীপ রায়ের সাক্ষাৎকার এবং শুটিংয়ের কিছু খবর ।

রাজসভার একটি দৃশ্য : ক্ল্যাপস্টিক দেওয়া হচ্ছে

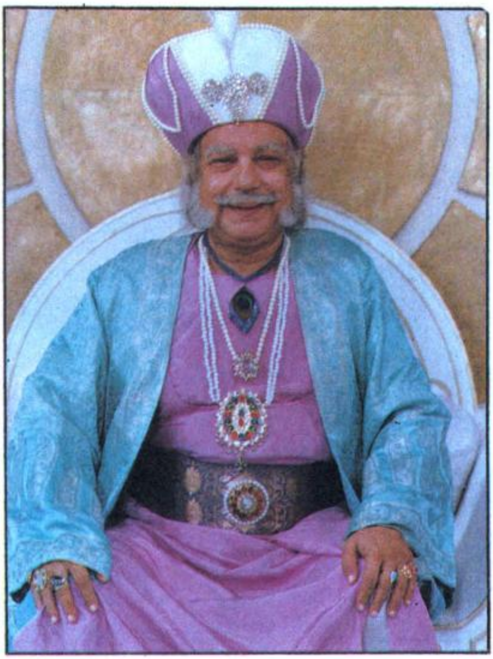

রাজামশাইয়ের চরিত্রে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

গুপী ও বাঘা

খোকা মুখার্জি ও অজিত ব্যানার্জি

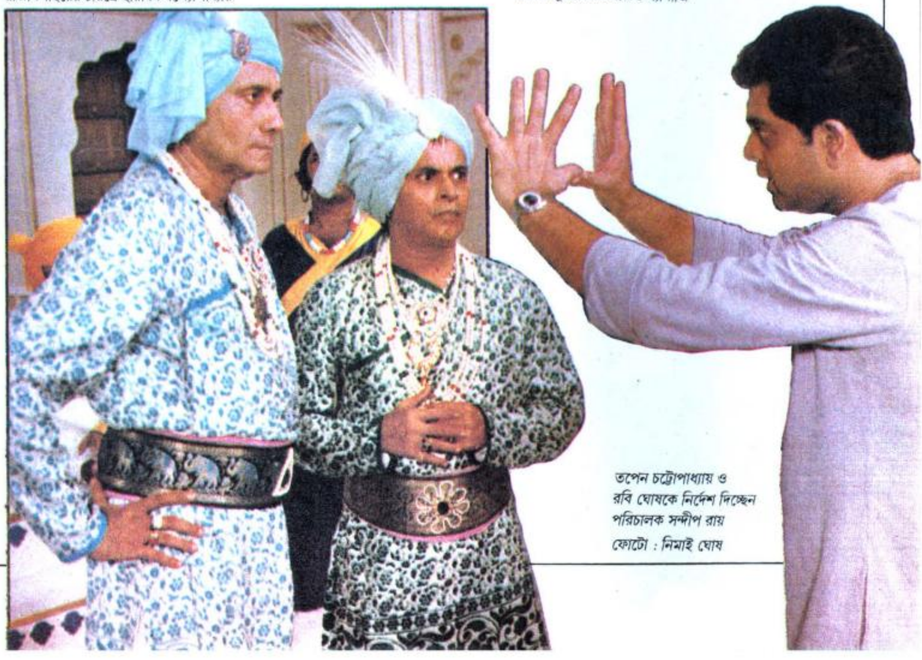

তপেন চট্টোপাধ্যায় ও
রবি ঘোষকে নির্দেশ দিচ্ছেন
পরিচালক সন্দীপ রায়
ফোটো : নিমাই ঘোষ

গল্প, উপন্যাস, খেলাধুলো, কমিক্‌স ও কুইজে পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা এবার আরও জমজমাট

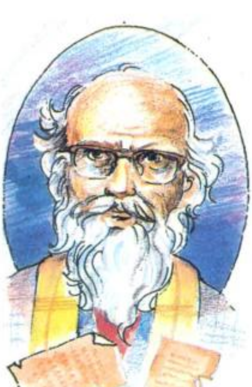

শঙ্কু-কাহিনী
ডন ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী
সত্যজিৎ রায়

সাতটি সুবৃহৎ উপন্যাস
শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা
বিমল কর
কাকাবাবু ও বজ্র লামা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বনি
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
নারান
মতি নন্দী
দেড়দিন
সমরেশ মজুমদার
নতুন দিনের নায়ক
শৈলেন ঘোষ
পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

কমিক্‌স
এই প্রথম জেম্‌স বন্ডের 'ফর ইওর আইজ ওনলি'-র চিত্রকাহিনী 'একান্ত গোপনীয়', আরও দু'টি কমিক্‌স 'বন্দুকের শাসন' ও 'বিলির বুটজোড়া'।

তিনটি বড় গল্প
লীলা মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও দুলেন্দ্র ভৌমিক।

বিশেষ আকর্ষণ
সন্দীপ রায় পরিচালিত
'গুপী বাঘা ফিরে এল'
ছবির একটি গান
লিখেছেন সত্যজিৎ রায়
একমাত্র পূজাবার্ষিকী
আনন্দমেলাতেই
এই গান প্রথম
প্রকাশিত হচ্ছে

আরও আকর্ষণ
ফুলের সভা
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অপ্রকাশিত কাব্য-নাটিকা

বালক রবির হারিয়ে যাওয়া
অমুদ্রিত কবিতা
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রচুর গল্প
আশাপূর্ণা দেবী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বুদ্ধদেব গুহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, আনন্দ বাগচী, শিবশঙ্কর মিত্র, সমরজিৎ কর, আবুল বাশার, হিমানীশ গোস্বামী, শেখর বসু, শিবতোষ ঘোষ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হর্ষ দত্ত।

কবিতা ও ছড়া
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুনীল বসু, তারাপদ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, শ্যামলকান্তি দাশ ও আরও অনেকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্ববিচিত্রা
পার্থসারথি চক্রবর্তী, বিমল বসু, অনীশ দেব, অরূপরতন ভট্টাচার্য, চঞ্চল পাল ও সাধনা মুখোপাধ্যায়।

ভ্রমণ
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

খেলাধুলো
চুনী গোস্বামী, সুভাষ ভৌমিক, অরুণলাল, রূপক সাহা, গৌতম ভট্টাচার্য ও তানাজি সেনগুপ্ত।

অন্যান্য আকর্ষণ
বিখ্যাত খেলোয়াড়দের রঙিন ছবির অ্যালবাম,
নিল ও'ব্রায়েনের ছ' পাতা জোড়া কুইজ, বিশাল ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল (শব্দসন্ধান) ও ধাঁধা-মজা।

আনন্দমেলা

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

দাম ৪৪·০০ টাকা

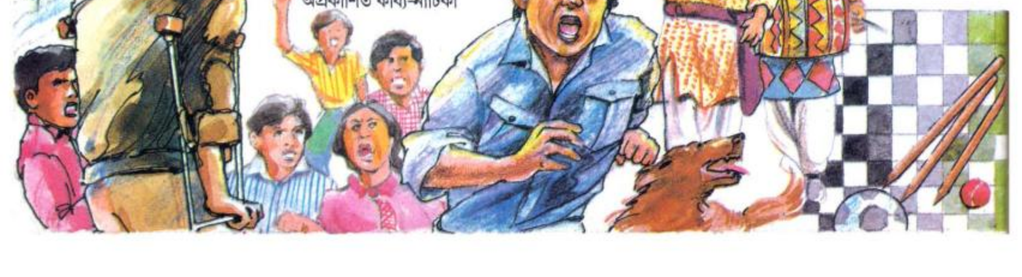

ছেলেবেলা থেকেই সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় গুপীর গল্প

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

"তোমরা গান গাইতে পার ? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত । তার নাম ছিল গুপী কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন, তার একটা মুদির দোকান ছিল । গুপী কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে-গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত গুপী 'গাইন' ।"

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপী গাইন' গল্পের এই শুরু । চৈত্র ১৩২১ থেকে ভাদ্র ১৩২২ পর্যন্ত ছ' মাসে ছ'টি কিস্তিতে এই গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায় । ধারাবাহিকভাবে গল্পটি যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন কে জানত গ্রামের সাদাসিধে দু'টি ছেলে একদিন সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের নায়ক হয়ে উঠে বিশ্বজয় করবে !

গুপী ও বাঘাকে অবশ্য শুধু সাদাসিধে বললে ভুল হবে । তারা ছিল আসলে মজার চরিত্র । প্রথমে গুপীর কথা বলি । উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন :

"গুপী যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত ; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত । যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত । যখন সে মাঠে গিয়ে গাইত, তখন মাঠের যত গরু, সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত । শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না । তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চলে গেল ; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতরে গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল ।"

যেমন গুপীর গান, তেমনই বাঘার ঢোলক-বাজনা । বাঘা ঢোলক বাজাত, আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙত । তার বাবা পাঁচু আর তার ঢোলকের পয়সা দিতে পারে না । তখন গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে এসে বলল, "আমাদের গ্রামে একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে ?" গ্রামের লোকেরা সবাই ঠিক করল, তারা চাঁদা করে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দেবে, সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি হবে খুব মজবুত, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে ।

সেই ঢোলক পেয়ে বাঘা খুশি হয়ে বাজাতে শুরু করল । একটানা দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও সে সেটাকে ছিঁড়তে পারল না । ততদিনে তার বাজনা শুনে বাবা-মা পাগল হয়ে গেলেন, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল । একদিন গ্রামের সবাই মোটা-মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বলল, "লক্ষ্মী, দাদা । তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব !"

বাঘাকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হল । সে বনে গিয়ে আশ্রয় নিল । উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন :

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি করার সময় সত্যজিৎ রায়

ফোটো : নিমাই ঘোষ

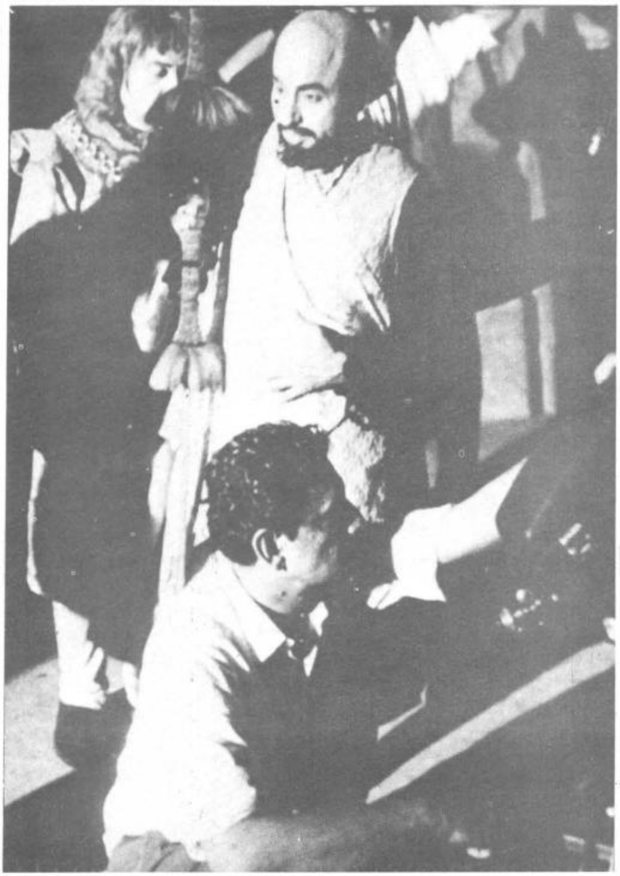

"এখন আর কেউ আর তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ ভালুক কিছু নাই। আছে খালি একটা ভারী ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায়নি। শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো! ওটা এলেই তো আমার ঢোলক শুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে।'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু আর কেউ নয়, সে গুপী গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে। সে গুপীরই গলা ভাঁজা। গুপীও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মতো ভয়ে কাঁপে।"

এর পর দু'জনেই বন থেকে পালাতে গিয়ে দু'জনের মুখোমুখি হয়, দু'জনের মধ্যে ভাব হয়ে যায়, আর তখনই তারা ঠিক করে দু'জনে মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে। বাকিটা তো গল্প।

উপেন্দ্রকিশোরের এই গল্পটিকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় প্রথম ছবি করার কথা ভেবেছিলেন ১৯৬৩ সালে। সেটা উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবর্ষ। শিশু ও কিশোরদের জন্য যিনি লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, সেই উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবর্ষে ছোটদের জন্য ছবি করাই হবে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। তবে, সত্যজিৎ রায়কে ছোটদের জন্য ছবি করার প্রথম অনুরোধ জানিয়েছিলেন পুত্র সন্দীপ রায়। সন্দীপের বয়স তখন ১০। আর ১৯৮৯-তে সেই সন্দীপই গুপী বাঘাকে নিয়ে নিজে ছবি করছেন।

সত্যজিৎ রায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটি শুরু করেছিলেন ১৯৬৮-র গোড়ায়। সাত মাসের মধ্যেই ছবিটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৯-এর ৮ মে। সত্যজিৎ রায়ের সুরে অনুপকুমার ঘোষালের গলায় গুপীর গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, একটানা ১০২ সপ্তাহ চলেছিল 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। আর কোনও বাংলা চলচ্চিত্র এতদিন চলেনি। এটা এক অসাধারণ রেকর্ড।

সেই ছবিতে প্রতিটি অভিনেতাই দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন। তপেন চট্টোপাধ্যায়ের গুপী, রবি ঘোষের বাঘা, সন্তোষ দত্তের শুণ্ডি রাজা, হাল্লা রাজা, জহর রায়ের হাল্লার কুচক্রী মন্ত্রী, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জাদুকর বরফিকে কেউ কখনও ভুলতে পারবেন না।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, মুখে-মুখে এ-ছবির নাম হয়ে

সন্ন্যাসী, তারপর নাগা,

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ৬ নং ফ্লোরে রাজসভার দৃশ্য। তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯। এখন যেখানে জমকালো রাজসভা, মাত্র দু' সপ্তাহ আগে সেখানেই ছিল সম্মোহনকক্ষ। রহস্যময়, আলো-আঁধারি পরিবেশ। দেওয়ালে তান্ত্রিক প্রতীক। একটা জায়গায় আগুন জ্বলছে। যজ্ঞবেদি। আর সেই সম্মোহনকক্ষ থেকে আঁকাবাঁকা একটা সুড়ঙ্গ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে।

ছায়াছবির এটাই ম্যাজিক। পরিচালকের নির্দেশে আর্ট-ডিরেক্টর সম্মোহনকক্ষের সেট ভেঙে ফেলে সেখানেই গড়ে তুলেছেন চমৎকার এক রাজসভা। জাম্বো হাতির বিশাল দু'টি দাঁত সেখানে সাজানো আছে। ঝলমল করছে সিংহাসন। মার্বেল পাথরের মেঝে। সিপাহি-সান্ত্রী। এ-সবই ম্যাজিক। চলচ্চিত্রের ম্যাজিক। টুকরো-টুকরো ছবি তুলে, পরে চিত্রনাট্য অনুযায়ী সেগুলো এডিটিং টেবিলে কাট-ছাঁট করে, সাজিয়ে-গুছিয়ে তবেই তৈরি হয় চলচ্চিত্র। এ-দিন রাজসভাতেই ঘটল এক আশ্চর্য কাণ্ড। সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাকে দেখা গেল গুপী ও বাঘাকে। দু'জনে দু'জনের হাতে হাত দিয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, "নাগা।" পর-মুহূর্তেই তারা হয়ে গেল নাগা। সন্ন্যাসীর পোশাকও তৎক্ষণাৎ বদলে গেল। গেরুয়া পোশাকের জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম দু'জনের পরনেই নাগাদের বেশভূষা। মাথায় পালক-দেওয়া টুপি। বাঘার হাতে বল্লম। আর তার গলায় হার। সেই হারের লকেটটা হল মানুষের ছোট্ট একটা মুণ্ডু। তবে, সত্যিকারের মুণ্ডু নয়। কাঠের তৈরি লকেট, দেখতে অবিকল ওরকম!

এর পরেই গুপী ও বাঘা আবার দু'জনে দু'জনের হাত মিলিয়ে বলে উঠল, "বেদুইন।" তখনই দেখা গেল, ওদের গায়ে বেদুইনদের সাদা আলখাল্লা! বেদুইনদের পোশাক ও সাজসজ্জার সব উপকরণই ওদের গায়ে। বেদুইনের পর ওরা হয়ে গেল রোমান সৈন্য। তার আগে গুপী ও বাঘাকে হাতে হাত মিলিয়ে বলতে শোনা গেল, "সৈন্য।" কোথায় নাগাল্যান্ড, কোথায় আরব-মরু, আর কোথায় বা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ইতিহাস ও সময়ের সব সীমা লেপে-মুছে দিয়ে ওরা এভাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে পৌঁছে গেল। একেই বলে রূপকথা, অন্য স্বাদের রূপকথা!

আর একেই বলে শুটিং! ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ৬ নং ফ্লোরে রাজসভার সেটের পাশে সেদিন একটি আলনায় পর-পর সাজানো ছিল গুপী ও বাঘার এইসব পোশাক। সন্দীপ রায় ক্যামেরা অপারেট করছিলেন। বেদুইনের শট কোনও রিহার্সাল না দিয়েই

তারপর বেদুইন...

তিনি টেক করলেন। নাগা গুপী ও বাঘার শটের অবশ্য দুটো টেক করেছিলেন। কীভাবে তিনি পর-পর শটগুলি নিলেন? সন্ন্যাসীর শট নেওয়া শেষ হতেই ক্যামেরা, সাউন্ড, আলো ইত্যাদি অফ করে দেওয়া হল। সেটের পাশে মেক-আপের জায়গায় তখন চলে এল গুপী ও বাঘা। সেখানে গুছিয়ে রাখা আছে বিভিন্ন পোশাক, গয়নাগাটি, চটি-জুতো ইত্যাদি। যখন যেটা দরকার দু'জন সহকারী তা গুপী-বাঘাকে পরিয়ে দিচ্ছে। সন্ন্যাসীর পোশাক বদলে নাগাদের বেশভূষা নিতে তাই গুপী-বাঘার বিশেষ সময় লাগল না। নাগারা কীভাবে চাদর পরে, তা সন্দীপ রায় নিজে এসে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। মেকআপ শেষ হতেই ঠিক আগের জায়গাতেই আবার শট নেওয়া হল।

ছায়াছবিতে দৃশ্য ও ঘটনার ধারাবাহিকতা নিখুঁতভাবে বজায় রাখতে হয়। সন্ন্যাসীর শট নেওয়ার পরেই তাই সন্দীপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, "জুতো মার্ক করে রাখো।" অর্থাৎ,এর পরের শটে যেন ঠিক আগের জায়গাতেই গুপী-বাঘা দাঁড়াতে পারে। শটের পর গুপী ও বাঘা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, আর-একজন গিয়ে চকখড়ি দিয়ে ওদের জুতোর মাপে দাগ বুলিয়ে রাখল মেঝেতে। পরের শটে ওরা ঠিক সেই জায়গাতেই এসে দাঁড়াল।

সাজসজ্জা, বেশভূষা সবকিছুই সন্দীপ রায়ের নিজের পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। এ-ব্যাপারে তিনি দারুণ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গুপী-বাঘার সামান্য দু' জোড়া নাগরাও যে কত সুন্দর হতে পারে, তা সেদিন দেখা গেল। নাগরায় দুটো চোখ আঁকা। তা ছাড়াও আছে নকশা। অন্যান্য পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেও তাই। কোনওটাতেই তিনি মনোযোগ কম দেননি। সেদিন ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়, বিজয়া রায়, রুমা গুহঠাকুরতা ও অরূপ গুহঠাকুরতা। সত্যজিৎ রায় চেয়ারে বসে দেখছিলেন, সন্দীপ ন্যূনতম সময়ে কীভাবে এক-একটা শট নিচ্ছেন। বিজয়া রায় অবশ্য দু-একবার উঠে এসে গুপী-বাঘার মেকআপে সাহায্য করছিলেন। বাইরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি। ফ্লোরে শুটিংয়ের নানা জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি। সেটে চড়া আলো জ্বলছে। একটা বা দুটো নেট হাতে নিয়ে কেউ-কেউ কোনও-কোনও আলোর সামনে ধরে আছে। শটের প্রয়োজনে আলো ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই এইসব ব্যবস্থা। সারা ফ্লোর জুড়ে ইলেকট্রিকের তার। সাবধানে হাঁটা-চলা করতে হয়। আলো-ছায়া। এরই মধ্যে গুপী-বাঘাকে নিয়ে সন্দীপ রায় নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে আছেন।

যায় 'গুগাবাবা'। এটা যদিও রূপকথাধর্মী ছবি, তবু এর মধ্যেই অনেকে পেয়েছিলেন যুদ্ধবিরোধী মানবিকতার অভ্রান্ত বক্তব্য।

সাদা-কালো ছবির শেষটা রঙিন। দুই রাজার দুই মেয়ে মণিমালা ও মুক্তমালার সঙ্গে গুপী-বাঘার বিয়ে হয়। বড় কথা, গান-বাজনার জোরে গুপী-বাঘা দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ হতে দেয় না।

উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন' গল্প ছেলেবেলা থেকেই সত্যজিতের প্রিয়। সেই গল্পটিকেই তিনি দিলেন নতুন মাত্রা। মূল গল্পের কাঠামোয় অনেক নতুন চরিত্র ও ঘটনার সংযোজন করতে হয়েছিল। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, "ছবিটি দেখে কেউ-কেউ মন্তব্য করেছিল, এতে শান্তির বাণী প্রচার করা হয়েছে। আমি যখন ছবিটি করি তখন আমার মনে তেমন কোনও ধারণা ছিল না। আমি কেবল একটি মজাদার গল্পই বলতে চেয়েছিলাম।

"গুপী গাইন ছবি ছোটরা সাদরে গ্রহণ করে, এবং এখনও ছবিটি দেখানো হলেই ছেলেমেয়ের দল ভিড় করে দেখতে যায়।"

এর পরের ছবি 'হীরক রাজার দেশে'। 'গুগাবাবা' করার সময় যে সত্যজিৎ এই ছবিটির কথা ভেবেছিলেন, তা হয়তো নয়। মাঝখানে কয়েকটা বছর কেটে যায়। ১৯৮০-র ছবি 'হীরক রাজার দেশে'। প্রথমে ছবিটির নাম ঠিক হয়েছিল 'গুপী বাঘা রাজার জামাই'। পরে হয় 'হীরক রাজার দেশে'। আর আশির দশক শেষ হওয়ার আগেই সন্দীপ রায় শুরু করলেন 'গুপী-বাঘা ফিরে এল'। এখন পর্যন্ত এই নামটাই ঠিক আছে। জানি না, পরে বদলে যাবে কি না। আর কয়েক মাসের মধ্যেই এই ছবিটির কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং ১৯৯০-এ ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা।

সন্দীপ রায় বলেছেন, তাঁর ছবিটিকে শুধু ছোটদের ছবি হিসেবে তিনি চিহ্নিত করতে চান না। সেভাবে আগে থেকেই কোনও ছাপ মেরে দিতে চান না তিনি। বরং তিনি বলবেন এটা পারিবারিক ছবি।

বস্তুত, দর্শকদের দিক থেকে এটা শুধু পারিবারিক ছবিই নয়, এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার প্রাচীন একটি পরিবারের শিল্প ও সংস্কৃতি সাধনার দীর্ঘকালের গৌরবময় ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় বাহিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থেকে শুরু করে সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় ও এখন সন্দীপ রায় পর্যন্ত এই ঐতিহ্যের ধারা অটুট থাকল।

সেই ঢোলক, সেই পোশাক শুধু বদলেছে স্ট্র্যাপ

বিশপ লেফ্রয় রোডের তিন তলার বাড়ি। বিশাল ড্রয়িং-রুমের দেওয়ালে সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর', 'অভিযান', 'নায়ক', 'চারুলতা' ও আরও কয়েকটি ছবির পোস্টার। পোস্টারগুলিও এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়। পেডেস্টাল ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলো সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি আলমারি জুড়ে শুধু বই আর বই। যে-টেবিলে সন্দীপ রায় পড়াশোনা করেন, তার সামনের দেওয়ালেও একটি পোস্টার। সত্যজিৎ রায়ের 'গণশত্রু'-র। টেবিলে সন্দীপ রায়ের নতুন ছবি 'গুপী-বাঘা ফিরে এল'-র শুটিং স্ক্রিপ্ট। নানা কাগজপত্র। ঘরে রংচঙে অনেক পোশাক। গুপী, বাঘার তো বটেই, ছবির অন্যান্য চরিত্রেরও। আর চোখে পড়ল একটি ঢোলক।

সত্যজিৎ রায়ের মতোই সন্দীপ রায়ও ছবির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি সমান মনোযোগী। প্রচারবিমুখ এই তরুণ পরিচালকের কাজের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরাই এটা জানেন। তাঁর নতুন ছবিটি নিয়ে 'আনন্দমেলার' পক্ষ থেকে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেই সাক্ষাৎকারই এখানে প্রকাশিত হল।

প্রশ্ন : 'ঘরেবাইরে'-র পাঁচ বছর পর সত্যজিৎ রায় 'গণশত্রু' করলেন। আপনার প্রথম ফিচার ছবি 'ফটিকচাঁদ'-এর প্রায় ছ' বছর পর আপনার এই দ্বিতীয় ফিচার—

সন্দীপ রায় : মাঝখানে অজস্র ছবি—

প্রশ্ন : টিভি সিরিয়াল— সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস-ওয়ান অ্যান্ড টু। কিশোরকুমারকে নিয়ে তথ্যচিত্র 'জিন্দাগি এক সফর'।

উত্তর : জিন্দাগি এক সফর তো প্রায় ফিচার লেংথ-এর।

প্রশ্ন : গুপী-বাঘা ফিরে এল, কী ফরমাট-এর ছবি হবে ?

উত্তর : এটা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর ট্রিলজি। গুগাবাবা তৈরি হয়েছিল ১৯৬৮-তে। ছবিটা রিলিজ করে ১৯৬৯-এর মে মাসে। কুড়ি বছর তো হল। হীরক রাজার দেশে ১৯৮০-র ছবি। সুতরাং, আমার ছবিতে সময়ের দিক থেকে একটা ধারাবাহিকতা রাখতেই হচ্ছে। ছবিতে তা উল্লেখও করা হবে। গুপী, বাঘার বয়সটা যে বাড়ছে সে কথা বলা হবে। প্রথম ছবিতে সরল যে ব্যাপার ছিল, তা ফিরে আসবে। হীরক রাজার দেশে তত সরল ছবি নয়। ওই ছবির দুটো স্তর আছে। এক একজন এক একভাবে ওই ছবিটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমার ছবিটা গুগাবাবার মতোই সরল।

প্রশ্ন : কোনও অ্যালিগরি, বা রূপক ?

উত্তর : না, ওরকম কিছু নয়। ভেতরের কোনও মানে থাকছে না। প্রথম ছবির মতোই খুব সহজ।

প্রশ্ন : গুগাবাবা তৈরি হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপী গাইন' গল্প অবলম্বনে। হীরক রাজার দেশে ছিল অপ্রকাশিত।

উত্তর : হীরক রাজার দেশে সরাসরি স্ক্রিনপ্লে করা হয়েছিল। এ-ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। প্রথমে গান। গানটাকে ঘিরে গল্প।

প্রশ্ন : আপনি আমাদের আগে জানিয়েছেন, গল্পটা এখন প্রকাশ করা যাবে না।

উত্তর : হ্যাঁ। ছবি রিলিজ করার আগে আমি গল্পটা জানিয়ে দিতে চাইছি না। গল্পটা এমনই যে, আগে থেকে তা জানিয়ে দিলে মজাটাই মাটি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : গুগাবাবা ছিল সাদা-কালো ছবি। হীরকরাজার দেশে রঙিন।

উত্তর : এখন 'কালার' ছাড়া ছবি করার কথা ভাবাই যায় না। আর 'কালার' বলেই পোশাক-আশাকের ঝামেলা আছে। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবিতে 'কালার ক্ল্যাশ' ভাবা হয় না। কিন্তু রঙিন ছবিতে অনেক রংকে 'ব্যালান্স' করতে হয়। কালার-এ সমস্ত ব্যাপারটাই বদলে যায়।

প্রশ্ন : এদিক থেকে আপনার ছবি নতুন মাত্রার ছবি হতে যাচ্ছে ?

উত্তর : আগের দুটো ছবির কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করছি। এর বেশি আর কী বলব ? তবে রংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার টিভি সিরিয়ালে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ছবিটার কথাই ভাবুন। স্পেসশিপ আসার আগে পর্যন্ত কোথাও 'পিংক' বা গোলাপি রংটা নেই। লালও নেই। গোলাপি রংটাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই এটা করতে হয়েছিল। নতুন ছবির ক্ষেত্রেও এরকম অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে।

প্রশ্ন : দু' একটা সিকোয়েন্স বা ঘটনার কথা কি জানানো যেতে পারে ? বা কোনও একটা দৃশ্যের পিকচারাইজেশন-এর কথা—

উত্তর : দেখুন, একটা ইনট্রোডাকটরি সঙ আছে। তারপর গল্পে চলে যাচ্ছি। কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত বাবার। আমার প্রথম ছবিতেও তা'ই।

প্রশ্ন : কোনও পরিবর্তন ?

উত্তর : অ্যাডিশন, অলটারেশন সব সময়ই হয়। আমার টিভির ছবিতেও তাই হয়েছে। তবে, আমাদের চিত্রনাট্যে কোনও টেকনিক্যাল মারপ্যাঁচ নেই শুটিং-স্ক্রিপ্ট আমার। ছবি কীভাবে তোলা হবে, চরিত্ররা কে কোথায় দাঁড়াবে—এ সব আমার। শট

ডিভিশন আমার। তবে শট নেওয়ার সময় অদল-বদল হয়েই থাকে। আমার ধারা বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। আগে থেকেই সব খাতায় লেখা থাকে।

টেকনিক্যাল কারণেই এটা করতে হয়। আইডিয়া নানা সময়ে আসে। প্রধান কাঠামো কিন্তু ঠিক থাকে। সবটাই মাথায় রাখতে হয়।

প্রশ্ন : আপনি তো ক্যামেরা নিজেই 'অপারেট' করেন।

উত্তর : ক্যামেরা নিজে না করলে অস্বস্তি হয়। ফটিকচাঁদ-এ গোড়ায় করিনি। পরে দেখলাম, কনফিডেন্স হচ্ছে।

ফটিকচাঁদ ছবিটা পরে খুঁটিয়ে দেখে মনে হয়েছে, প্রথম দিকের কিছু শটে হয়তো 'জুমিং'টা আগে হতে পারত, কিংবা শটটা নেওয়ার সময়ে চরিত্রগুলোকে অন্যভাবে ফ্রেমে আনা যেত।

প্রশ্ন : আপনার ক্যামেরাম্যান তো বরুণ রাহা ?

উত্তর : হ্যাঁ। উনি সুব্রত মিত্রের সঙ্গে ছিলেন। 'লাইটিং' ওঁর ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া ভাল ইলেকট্রিশিয়ানরা আছেন। এই লাইটিং-এর ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুড কোথায় কী, কী ধরনের লাইটিং দরকার, 'স্পেশাল এফেক্ট'-এর জন্য কীভাবে কী করতে হবে সবই আগে থেকে ঠিক করে নিতে হয়।

প্রশ্ন : ফটিকচাঁদের কথা যখন উঠল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এখন এই ছবিটা আপনার কেমন লাগে ? বিশেষ কোনও শট বা সিকোয়েন্স—

উত্তর : ফটিকচাঁদ অত্যন্ত খাটুনির ছবি। আপাতদৃষ্টিতে এটা বোঝা যায় না। যতদিনে শুটিং শেষ করব ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি সময় লেগেছিল। ফটিকচাঁদ আমার প্রথম ছবি। এর কস্ট্যুম, কালার-ম্যাচিং—কোনওদিকেই ত্রুটি রাখিনি। ফটিকচাঁদের কস্ট্যুম অবশ্য অধিকাংশই রেডিমেড। কিন্তু এখন যে ছবিটা করছি, তার গয়নাগাটি ছাড়া প্রায় সবই তৈরি করতে হচ্ছে। অনেক ঝক্কি। যেহেতু আগে দুটো ছবি আছে, তাই কাজটা আরও কঠিন।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় ছবি ? ফটিকচাঁদ ? টিভি সিরিয়ালের কোনও ছবি ?

উত্তর : ফটিকচাঁদ-এ কিছু ভাল জিনিস আছে। ময়দান, বস্তি। বিশেষ করে বস্তির দৃশ্যগুলোর কথাই ভাবুন। তবে হ্যাঁ, এখন করলে কেমন হত বলা কঠিন।

আবার গুপী-বাঘা

প্রশ্ন : ফটিকচাঁদ খুব খাটুনির ছবি বললেন।

উত্তর : জুন-জুলাইয়ের গরমে মেঘের আশায় বসে থাকতে হত। প্রথমে হারুন খেলা দেখাচ্ছে। ফটিকও মুগ্ধ। ঝলমলে দিনে তুলছি। পরের দৃশ্য মেঘলায়। সেটা গুণ্ডাদের দৃশ্য। সবাইকে রেডি রাখতাম। হারুনের খেলার দৃশ্য তুলতে গিয়ে যদি মেঘ করে আসত তখন আর সেই শটটা নিতাম না। মেঘলার পরের শটটা নিতাম। আবার মেঘ চলে গেলে হারুনের খেলায় ফিরে আসতাম।আর আমার টিভি সিরিয়ালের অনেক ছবিই বেশ প্রিয়। ঠিক যেটা চেয়েছিলাম তার অনেকটাই, তা ৭৫%, পেয়েছি তিন পর্বের শোধ-এ। অভিনয়ের স্ট্যান্ডার্ড ছিল বেশ ভাল। ওম, অনুপম, তনুজা। ফেলুদার সিরিয়াল একসঙ্গে দেখানো হলে জমবে বলেই আমার মনে হয়। বঙ্কুবাবুর বন্ধুর মধ্যেও ভাল জিনিস আছে। তার ওপর সাধু মেহেরের অভিনয়। তবে এখন মনে হয়, আর একটু সময়, আর একটু টাকা পেলে আরও ভাল হত। বঙ্কুবাবুর বন্ধুর শুটিং আট দিন হওয়ার কথা ছিল। লেগেছিল ১৫ দিন।

প্রশ্ন : ফেলুদার টিভি সিরিয়াল নিয়ে একটা কথা মনে পড়ল। আপনার ছবিতে ফেলুদা চরিত্রে আমরা শশী কাপুরকে দেখেছি। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হয়েছেন ফেলুদা। আপনি আপনার নতুন ছবিতে রবি ঘোষ ও তপেন চট্টোপাধ্যায়কেই রেখেছেন। আগের ছবিতে তাঁরা অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তা ছাড়া, গুপী-বাঘা চরিত্রে তাঁদের জায়গায় অন্য কাউকে ভাবাও যায় না। চরিত্র দু'টির সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনি ফেলুদার সময়—

উত্তর : হিন্দি টি ভি সিরিয়াল বলেই শশী কাপুরের কথা ভেবেছিলাম। আলাদা মাধ্যম, আলাদা ভাষা। তাই আইডেন্টিফিকেশনের সমস্যা ছিল না।

প্রশ্ন : গুগাবাবার সময় যারা বাচ্চা ছিল তারা এখন বড় হয়েছে। কুড়িটা বছর। হীরক রাজার দেশের সময় যারা বাচ্চা ছিল, তারাও কিছুটা বড় হয়েছে। আর এবার একেবারে নতুন প্রজন্মের শিশুদের আপনার ছবির দর্শক হিসেবে দেখা যাবে।

উত্তর : আমার ছবি যে বাচ্চাদের ছবি সেভাবে আমি ছাপ মারতে চাই না। আমার ছবি পারিবারিক ছবি। গুগাবাবা ও হীরক রাজার দেশে এতবার দেখানো হয়েছে যে অনেকেরই তা মনে আছে। আমাকে নতুন করে কিছু এশটাবলিশ করতে হবে না। এই গল্পের আলাদা কোনও ভূমিকা থাকছে না।

প্রশ্ন : আপনার ছবির এক কথায় যদি পরিচয় দিতে হয়—

উত্তর : রূপকথা। ঠিক প্রচলিত নয়, ভিন্ন স্বাদের।

প্রশ্ন : রূপকথা ছাড়া আর কিছু বলবেন না ?

উত্তর : মিউজিক্যাল ফ্যান্টাসি। প্রথম দুটোর মতো এতেও ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব।

প্রশ্ন : আপনি তো গুগাবাবার ফরমাটটাই রাখছেন। কস্ট্যুম তো নতুনভাবে করতে হচ্ছে। আচ্ছা, ওই ঢোলকটা ? ওটা কি গুগাবাবা ছবির ?

উত্তর : গুগাবাবার ঢোলকটা নেই। এটা হীরক রাজার দেশের ঢোলক। ঢোলকের পোশাকটা আছে, তবে স্ট্র্যাপটা বদলাতে হয়েছে। গুগাবাবার অবশ্য ছিল দুটো ঢোলক। একটা ডামি। আগের ছবির খুঁটিনাটি থেকে আমি একটুও সরছি না। *ফোটো : নিমাই ঘোষ*

বছর-বছর গুপী সাজতে ইচ্ছে করে

তপেন চট্টোপাধ্যায়

আমরা থাকতাম কালীঘাটের দিকে। আমার কাকা চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রাক-যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কালে তিনি কবি হিসেবে বেশ খ্যাতিমান ছিলেন। সেই সূত্রে সে-বাড়িতে আসতেন অনেক গুণিজন, শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যেমন বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, শম্ভু মিত্র এবং সত্যজিৎ রায়ও। তখন খুব ছোট আমরা। তখন ওই দীর্ঘ মানুষটির পরিচয়ও জানতাম না। পরে সুকুমার রায়ের লেখা পড়তে-পড়তে এক সময় জানলাম, উনি সুকুমার রায়ের একমাত্র পুত্র। তারপর সত্যজিৎ পথের পাঁচালি করেছেন। দেশে-বিদেশে খ্যাতি হয়েছে তাঁর। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর তেমন যোগাযোগ ছিল না। তারপর ১৯৬০-'৬১ সালে তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকা আবার নতুন করে প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। সে-সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গ্রুপ থিয়েটার চালাতেন। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে আমার একটু ঝোঁক ছিল। আমি তখন সেই নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এবং ছাত্রাবস্থার পর পুরোপুরি বেকার। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাকে সত্যজিতের 'সন্দেশ' পত্রিকায় কাজ দিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। সেখানে মানিকদার সঙ্গে আবার দেখা হল।
'মহানগর' ছবিটি তিনি যখন করছেন, তখন আমাকে একদিন ডেকে জানতে চাইলেন, আমি ছবিতে অভিনয় করতে ইচ্ছুক কি না। আমি তো তৎক্ষণাৎ রাজি। ছোট্ট ভূমিকা, কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে সুযোগ পাওয়া তো! সর্বসাকুল্যে দুটো ছোট্ট শট, দুটো সংলাপ—অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে,ব্যস্!
১৯৬৪ সালে 'সন্দেশ' ছেড়ে দিয়ে অন্য চাকরিতে যোগ দিলাম। মানিকদার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় রইলই না। ওই সালেই একদিন হঠাৎ দেখা ওঁর সঙ্গে। বললেন, "নতুন ছবি করছি, একদিন বাড়িতে এসো।" গেলাম, শুনলাম তিনি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' করছেন। চিত্রনাট্য শোনালেন। আমি তখনও জানি না যে, তিনি 'গুপী' চরিত্রে আমার কথা ভেবেছেন। হঠাৎই বললেন, "তোমাকে গুপীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।"
ছেলেবেলা থেকে অভিনয়ের ঝোঁক ছিল, সিনেমা-জগতে তেমন সুযোগ পাইনি। তাই হঠাৎ মানিকদার প্রস্তাব শুনে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। ওঁর কথামতো একদিন, ২৫ ডিসেম্বর, গেলাম নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। স্ক্রিন টেস্ট হল। উতরে গেলাম।
গুপী গাইন ছবিটাই আদ্যোপান্ত আমার কাছে একটা উজ্জ্বল ঘটনা।
রামপুরহাট থেকে সিমলা, সিমলা থেকে রাজস্থান—সে এক ব্যাপক ছোটাছুটি! ফিরে এসে শুণ্ডিরাজার সভা, হাল্লারাজার দরবার ইত্যাদি কিছু অংশের শুটিং হয়েছিল নিউ থিয়েটার্স-১ নং স্টুডিওতে। আউটডোরে আমাদের সঙ্গী গর্দভটি ছিল মস্ত মূল্যবান এক অভিনেতা! আমরা এক লোকেশন থেকে আর-এক লোকেশনে যাচ্ছি হয়তো পায়ে হেঁটে, গর্দভ চলেছেন গাড়িতে। 'হীরক রাজার দেশে'-র কথা বলি। আমার মনে হয়, গুগাবাবার চেয়ে হীরক রাজা অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ।
তারপর আবার ১০ বছর পর গুপী-বাঘা ফিরে আসছে। এবার পরিচালক সন্দীপ রায়। গল্প, চিত্রনাট্য, গান ইত্যাদি সব সত্যজিতের হলেও ছবিটি পুরোপুরি সন্দীপেরই।
আমার বছর-বছর গুপী সাজতে ইচ্ছে করে। এবার আরও ভাল লাগছে। কেননা, খোকনের অনুরোধেই মানিকদা গুগাবাবা করেন, আজ সেই খোকন গুগাবাবার তৃতীয় পর্বের পরিচালনার দায়িত্বে, এটা ভাবলেই আমার দারুণ আনন্দ হয়।

আমরা থাকব না, গুপী-বাঘা থেকে যাবে চিরকাল

রবি ঘোষ

আমার বেশ মনে আছে, 'অভিযান' ছবির শুটিং চলার সময় মানিকদা (সত্যজিৎ রায়) আমায় একদিন বললেন "গুপী গাইন ছবি করব, তুমি বাঘা করবে, তৈরি থেকো।" ...সে বহুকাল আগের কথা।
আমার দীর্ঘ অভিনয়-জীবনে নানা ধরনের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, কিন্তু বাঘা চরিত্রে অভিনয় করে যে-আনন্দ, যে-তৃপ্তি পেয়েছি, তার কোনও তুলনা হয় না। বলতে দ্বিধা নেই, আমার অভিনয়-জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র বাঘা।
'গুগাবাবা', 'হীরক রাজা'র পর আবার ফিরে আসছে সেই বিখ্যাত মানিক-জোড় গুপী আর বাঘা। ছবির নাম এখনও পর্যন্ত 'গুপী-বাঘা ফিরে এল'। তাদের এই ফেরার জন্য আমরা অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করছিলাম। মানিকদাও চেয়েছিলেন। অবশেষে আমাদের সেই চাওয়াটা পূর্ণ হতে চলেছে। ছবির শুটিং শুরু, আমি নিজে তো এখন দিনরাত বাঘা, রবি ঘোষ নই।
তবে, এবারে পরিচালনার দায়িত্ব সন্দীপ রায়ের। কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত সত্যজিতের হলেও ছবিটি পুরোপুরি সন্দীপেরই ছবি। পরিচালনার ক্ষেত্রে মানিকদা একেবারেই নির্লিপ্ত। কখনও-সখনও হয়তো ফ্লোরে আসেন, চুপচাপ এককোণে নীরবে বসে সন্দীপের, আমাদের কাজ দেখেন, চলে যান। তাঁর আর কোনও ভূমিকাই নেই। সন্দীপের হাতে পারিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন তিনি। সন্দীপও অসম্ভব যোগ্য পরিচালক।
আবার প্রায় বছর-দশেক পর বাঘা সাজতে যে কী ভাল লাগছে, তা বর্ণনা করা যায় না। ট্রিলজিতে অভিনয় করার সুযোগ তো পৃথিবীতে খুব কম অভিনেতার ভাগ্যেই জোটে। এইজন্য বিশেষ করে আরও আনন্দ হচ্ছে। ২০ বছর আগে যুবক বয়সে যে-চরিত্রটিতে প্রথম অভিনয় করেছিলাম, তখন অভিনেতা হিসেবে যেসব দোষ-গুণ ছিল, সেগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। চরিত্রটিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছি। ভাবলে ভাল লাগে, একদিন আমরা থাকব না, থেকে যাবে গুপী-বাঘা এক কিংবদন্তি হয়ে। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে জীবনে!

অনুলিখন:
গৌতম ঘোষদস্তিদার

শরতের গান

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

শিউলিঝরা সকালবেলায় মিষ্টি রোদের একটু আঁচ,
যেই লেগেছে এই এখানে, প্রাণটা দিল অথই নাচ ।
কতই রঙের ফুল ফুটেছে, গন্ধ ছোটে দিগ্‌বিদিক,
বন্ধ ঘরের দরজাগুলো যায় খুলে যায়, ঠিক ম্যাজিক !
শিশির কিছু ঘাসের বুকে, সোনার কুচি, লাগছে বেশ,
সেই পুরাতন সুরটি গানের নতুন করে ছড়ায় রেশ ।
নীল পাহাড়ের চুড়োয় বসে আঁকছে ছবি মেঘ-কিশোর,
ভেতর আমার উঠল বেজে, কাটল চোখে ঘুমের ঘোর ।
সূর্য নরম ছড়ায় কুসুম, একটু ভেজা ঘাসগুলো,
যাই মাড়িয়ে স্ফটিককণা, ঠিক যেন একরাশ তুলো ।
হাওয়ায় জাগে কাশবনে গান, সুর ভাসে তার চতুর্দিক,
বিশ্ব সবার হাতের মুঠোয়, যে পারে সে জেনেই নিক ।
জীবন কিছু গলিঘুঁজির পথ খুঁজে নেয় চোখ দিয়ে,
চিলের ডাকে দুপুর ভরে, বিষণ্ণতা তাই কি এ ?
অথচ খুব খুশির সময় থাকার কথা আজ সবার
সামনে আছে অকালবোধন, বছরে তা হয় ক'বার !
বাদ্যি বেজে উঠল বলে, দেশান্তরে ছুটল মন,
ঢাকের কাঠির ওঠা-পড়ায় ছন্দে মাতে তিন ভুবন ।
আজ শরতের হালকা রোদে নিই কুড়িয়ে খুশির গান,
ছুটির মেজাজ জমল ভাল, লাগল চোখে হাসির টান ।
দূর ভ্রমণের গন্ধ আসে, ছুটির পিছে তাই ছুটি,
চোখের পাতায় ঘুম নামে না, গল্পে-ছড়ায় খুনসুটি ।

এই শরতে

সৌমেন্দু সামন্ত

আকাশ ছিল নীল, গাঢ় নীল, সূর্য ছিল তেজে
ডুবল আলো যেই না মেঘের বাদ্যি ওঠে বেজে ।
ঝম্ ঝমা ঝম্ বৃষ্টি এল নূপুর পরে পায়
নাচল বৃষ্টি পলাশপুরে চন্দনাদের গাঁয় ।

এই মেঘে ওই ঢাকল আকাশ, আবার আকাশ আলো,
এই বৃষ্টি এই রোদ্দুর বেশ মজা বেশ ভাল ।
এ-গাঁয় যখন বৃষ্টি, ও-গাঁয় হলুদ রোদের ছটা,
টিংকু টুয়ার মাথায় গায়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ।
এই শরতে মেঘ আর রোদের এমন যে খুনসুটি,
দেখছে কেবল পলাশপুরের চন্দনা আর পুঁটি ।
দেখছে ভেজা নতুন-হাওয়ার রেল চলে ঝিক্‌ঝিক্
এ সত্যি, একরত্তিও নয় ভুল বা কাল্পনিক ।

মাঠের পরে বরফকুচির বিশ্ব গড়ার মতো,
কাশ ছেয়ে যায় সাদায়-সাদায় এদিক-ওদিক কত ।
এই শরতে চন্দনাদের খোলা বারান্দায়,
শিউলি ফুলের গন্ধ, ফুলে উঠোন ভরে যায় ।
ঢাকের কাঠির কুড়-কুড়-তাক যায় শোনা যায় দূরে,
দুগ্‌গা পুজোর ধুম পড়ে যায় সারা পলাশপুরে ।
এই শরতেই চন্দনাদের গায়ে নতুন জামা,
কিনে দেবেন আগের মতোই পুঁটির পটলমামা ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, জিৎ কিংবা হার ! একবাক্যে সবাই কিন্তু এর সাপোর্টার...

কলকাতা বলতে ফুটবল। কথায় বলে কলকাতা হোলো ভারতের ফুটবল রাজধানী। এ দল জিতলো তো ইলিশের দর বাড়ল — ও দল জিতলো তো চিঙড়ীর। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা গরম। বাড়িতে বাড়িতে আসর জমজমাট।

আর এই কলকাতার ফুটবলের মতই আরও এক ঐতিহ্য হরলিক্‌স। ঘরে ঘরে এর সমাদর প্রতিদিনের, চিরদিনের। কারণ স্বাস্থ্য রাখতে, ফুর্তি যোগাতে যে হরলিক্‌স-এর জুড়ি নেই। তাই তো সব দলই হরলিক্‌স-এর সাপোর্টার

কলকাতা
১৬৯০-১৯৯০

প্রাণের শহর কলকাতায়, পুষ্টি যোগায়, মনমাতায়, হরলিক্‌স

HTA 3791

রোভার্সের রয়
রোভার্সের প্রশিক্ষক ট্যাফি মর্গ্যান রয়কে দাঁড়াতে সাহায্য করল…
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! অন্তত হাঁটতে পারছে !
তবু আমি কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না । ওকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করো…
রয় ঠিক এই ভয়ই করছিল— মরসুমের শুরুতেই একগাদা চোট !
এইজন্যেই ও আমাদের খেলতে দিতে চায়নি…
একটু পরে লফটি পিক রয় আর ট্যাফির সঙ্গে যোগ দিলে…
জঘন্য বল, রয় ! এক্স-রে করাতে তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে…
লফটি, মনে হয় তার দরকার নেই…
…সতর্কতা হিসেবে ক্রিকেটের মোজার নীচে শিন-প্যাড পরে নিয়েছিলাম !
আর এখন সতর্কতা হিসেবে তোমার আর খেলা চলবে না…এটা আদেশ !
এদিকে রোভার্স তখন লড়ে যাচ্ছে…
উফফ !
জিমি স্লেডের দুর্দান্ত ফিল্ডিং !
ক্যাভেলিয়ারদের প্রতিটি রান লড়াই করে নিতে হচ্ছে ।
এবং ব্ল্যাকি গ্রে-র বলের স্পিন আদৌ নিরীহ ছিল না…
ইহহ !
দারুণ ক্যাচ, নোয়েল !
র‍্যালফ মিকার, কেটে পড়ো !
কিন্তু রয় যখন শেষ ক'টি ওভার দেখতে খুঁড়িয়ে বাইরে এল…
দুঃখিত রয়… যথেষ্ট রান পেলাম না । ওরা পাঁচ উইকেটে জিতেছে !
দুঃখের কিছু নেই ! পেশাদার দলের বিরুদ্ধে জিততেও ওদের এত কষ্ট হবে না…

...তুমি আসবার আগেই আমি হাসপাতালে ফোন করেছিলাম ! চার্লি কার্টারের কণ্ঠার হাড় ভেঙেছে, আর মারভিন ওয়ালেসের হাতের হাড়ে চিড় ধরেছে...
...অতএব ঢের হয়েছে ! ওদের বিরুদ্ধে ফিরতি খেলায় আমি পেশাদার ক্রিকেটার নিয়ে দল গড়ব !
ঠিক বলেছ, রয় ! প্রথমেই তোমার কথা আমাদের শোনা উচিত ছিল !
পরে, রোভার্সের খেলোয়াড়দের কেউ-কেউ যখন গাড়ি খুঁজতে যাচ্ছে...
বাহ্ ! এ যে দেখছি জখমিদের মিছিল ! বাড়ি পৌঁছতে পারবে তো ?
কী বলতে চাইছ, মিকার ?
বলতে চাইছি, ক্রিকেট পুরুষের খেলা ! তোমরা বরং হাওয়াভরা থলেতে লাথি মারতেই নিজেদের ব্যস্ত রাখো, খোকারা !
তবে রে, তুমি...
আমরা পুরুষ কি না ফিরতি খেলাতেই তার প্রমাণ পাবে, মিকার !
হে ! হে ! আমার তর সইছে না...
কী হচ্ছে ? ফিরতি খেলার কথা কী শুনছিলাম ?
ওই ক্যাভেলিয়াররা ! নতুন লোক নিয়ে দল গড়ার কথা ভুলে যাও, রয়...
...মিকার বলে গেল আমরা অপদার্থ...আর কথাটা আমার ভাল লাগেনি !
আমারও নয় ! মিকারের দম্ভ চূর্ণ করতে পারি শুধু আমরা —মেলচেস্টার রোভার্স !
ওহ, না !
ক্রমশ
রয় কি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে ? পরের সংখ্যায় জানা যাবে !

শ্রমিক-মৌমাছির রহস্য

মৌমাছি, তার চাক এবং জীবনযাত্রা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা আজ নতুন নয়। এই আশ্চর্য পতঙ্গ মুগ্ধ করেছিল স্বয়ং ডারউইনসাহেবকেও। কিন্তু বহুযুগ ধরে এত যে গবেষণা তা এখনও ভেদ করতে পারেনি এই পতঙ্গের যাবতীয় রহস্য। বিশেষ করে শ্রমিক-মৌমাছি বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বেশি রহস্যময়। একটি মৌমাছির চাকের ভেতরে হাজার-হাজার শ্রমিক-মৌমাছি নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। তাদের এই কাজের ধরন অনেক রকমের। শ্রমিক-মৌমাছির এক-একটি দল এক-এক ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকে। যেমন, ডোম-মৌমাছির কাজ হল চাকের ভেতরে কোনও মৌমাছি মারা গেলে তার মৃতদেহটি চাকের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া। ছবিতে ঠিক এই

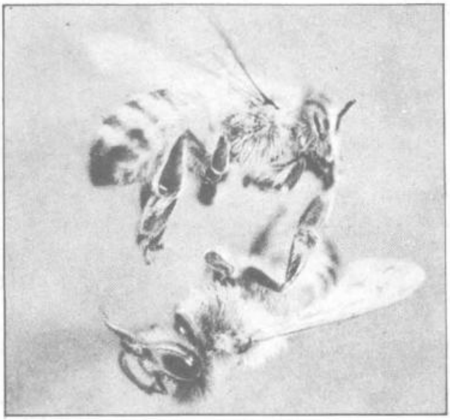

ঘটনাটিই দেখানো হয়েছে। এইরকম বহু ধরনের কাজ শ্রমিক-মৌমাছিরা করে যায় শুধু পরের জন্য। এরকম নিঃস্বার্থ কর্মী পতঙ্গ জগতে খুঁজে পাওয়াই ভার। সম্প্রতি শ্রমিক-মৌমাছির নিঃস্বার্থ শ্রমের রহস্য খুঁজতে কিছুটা আলোকপাত করতে পেরেছেন দু' দল বিজ্ঞানী। প্রথম দলটি হল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের—যার প্রধান দুই গবেষক পিটার ফ্রামহফ এবং জেইন বেকার। আর দ্বিতীয় দলের দু'জন হলেন ওহাহি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন রবিনসন ও রবার্ট পেজ। দু' দল একটি বিষয়ে একমত যে, শ্রমিক-মৌমাছিদের বন্ধ্যাত্বই তাদের নিঃস্বার্থ শ্রমের কারণ নয়। তাদের শ্রমের মূল কারণ লুকিয়ে রয়েছে তাদের 'জিন'-এর মধ্যে। সেইজন্যই তারা নিজেদের অগ্রগতির স্বার্থে পরিশ্রম করে জীবনপাত করে রানি-মৌমাছি ও পুরুষ-মৌমাছিদের জন্য। তবে এ-বিষয়ে গভীরতর গবেষণা এখনও চলছে।

আধুনিক ই· সি· জি· যন্ত্র

উইসকনসিনের খ্যাতনামা চিকিৎসা-যন্ত্র তৈরির কম্পানি 'মিল্টন' তৈরি করেছে অত্যাধুনিক এই ই· সি· জি· যন্ত্র। যন্ত্রটির নাম—'ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি রেকর্ডার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'। এতে রয়েছে হার্টের রুগির ই· সি· জি· করার ব্যবস্থা। এই ই· সি· জি·'র লেখচিত্র ফুটে ওঠে একটি এল· সি· ডি· প্যানেলে। ইচ্ছে করলে সাধারণ ই· সি· জি· যন্ত্রের মতো এই লেখচিত্র ছাপিয়ে নেওয়া যায় রেকর্ডারের চার্টে। এ ছাড়া রুগির ই· সি· জি· লেখচিত্র বিচার করে এই যন্ত্রের ভেতরে খুদে কম্পিউটার চিকিৎসককে জানিয়ে দেবে রুগির হার্টের ত্রুটির সম্ভাব্য কারণ কী কী, আর একই সঙ্গে দেবে মূল্যবান ডাক্তারি পরামর্শ। এটা সম্ভব হয়েছে যন্ত্রটির কারিগরি ডিজাইনের সময়ে প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে গবেষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন চিকিৎসকেরা।

সুবাস কম্পিউটারে ধরে রাখা সম্ভব

সুন্দর মনোরম সুবাস আমাদের আপ্লুত করে। কাজ করার উৎসাহ জোগায়, অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে। এই সুবাস বা মনোরম গন্ধ তৈরি হয় বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে। পশ্চিম জার্মানির এক সংস্থা, সম্ভবত এটিই পৃথিবীর প্রাচীন কৃত্রিম সুবাস উৎপাদক সংস্থা Haarmann & Reimer Gmbh। এই সংস্থায় ২৫,০০০ ধরনের সুবাস কম্পিউটারের মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। এর জন্য প্রায় হাজার রকমের জিনিস ব্যবহার করা হয়।

গত শতাব্দীতে সমস্ত সুবাসই প্রস্তুত করা হত প্রকৃতি থেকে। বর্তমানে সমস্ত কিছুই গবেষণাগারে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকারকরা সবাই কৃত্রিম উপায়ে তৈরির বিরোধী ছিলেন। ক্রমে-ক্রমে আবিষ্কার হতে থাকে সুবাসের বৈচিত্র্য।

বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোনও সুবাস নেই যা শুধুমাত্র প্রকৃতি থেকে নেওয়া। তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম পদ্ধতি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে।

প্রাকৃতিক গন্ধের প্রায় সবটুকুই আসে গাছ থেকে, বিশেষ পদ্ধতিতে ফুল, পাতা এবং বৃন্ত থেকে সংগ্রহ করা হয়। পাতন পদ্ধতিই হল এর প্রাচীনতম পদ্ধতি। কিন্তু এই প্রাচীন প্রথায় বেশি উত্তাপের ফলে বস্তু তার নিজস্ব গন্ধ হারিয়ে ফেলে। আধুনিক পদ্ধতিতে এখন বহু ধরনের সুবাস সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে।

আশ্বিনের আকাশ

অরূপরতন ভট্টাচার্য

(৪ আশ্বিন রাত্রি দশটা ও ১৩ আশ্বিন রাত্রি সাড়ে ন'টা এবং ২০ আশ্বিন রাত্রি ন'টার তারাশোভিত আকাশপট—আমাদের অঞ্চলের আকাশসঙ্গী।)

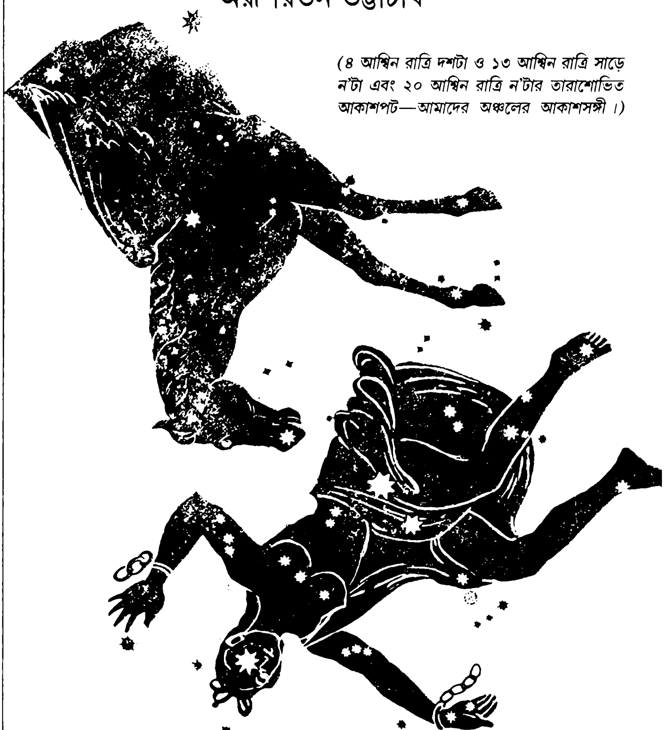

ভাদ্র মাস শেষ হল। ঋতু হিসেবে এখন শরৎকাল। এখন যে আকাশ আমাদের নজরে আসবে, তা বৃষ্টি-ধোয়া মেঘহীন আকাশ নয়, একেবারে শরতের দিগন্তছড়ানো চোখজুড়নো, মনভুলনো, নীলের চাঁদোয়া খাটানো সেই আকাশ।

সন্ধের অন্ধকারেই তারা ফুটতে আরম্ভ করে আকাশের এখানে-ওখানে। যাদের ঔজ্জ্বল্য বেশি, তাদেরই দেখা যায় সকলের আগে, কিন্তু রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত আকাশ জুড়ে তারাদের মেলা বসে যায়। এই তারাদের নিয়েই বিভিন্ন তারকামন্ডলের কল্পনা। সেসব কল্পনার সঙ্গেই সুদূর অতীতের মনীষার সম্পর্ক।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, যে আকাশ নজরে এসেছিল শ্রাবণ-ভাদ্রের আকাশে, এখন আর ঠিক সেই আকাশটিকে ওই সময়ে মাথার উপরে দেখতে পাওয়া যাবে না। রোজ সামান্য পরিমাণে পশ্চিম দিকে সরতে সরতে এখন সে নেমে গেছে খানিকটা পশ্চিমে। ব্রাহ্মণের উপবীতের মতো ছায়াপথ, হংসের মতো সিগন্যাস মন্ডল, উজ্জ্বল অভিজিৎকে নিয়ে আর-একটি মন্ডল লাইরা, তা ছাড়া শ্রবণা তারাযুক্ত অ্যাকুইলা আর রাশিচক্রের নবম রাশি ধনু রাশি—এরা সবাই এখন পশ্চিমের যাত্রী, ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিগন্ত লক্ষ্য করে। সঙ্গে-সঙ্গে পূর্বের তারারা উঠে আসছে মাথার উপরে।

এ-সময়ে যে যে তারকামণ্ডল বিশেষভাবে আমাদের নজরে আসবে, তার মধ্যে আছে উত্তর আকাশের তারকামন্ডল ক্যাসিওপিয়া (Cassiopia)। উজ্জ্বল তারায়-তারায় মন্ডলটার আকৃতি অনেকটা ইংরেজি বড় হাতের W -এর মতো। পাঁচটা বেশ বড় তারা এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, চিনতে এতটুকু ভুল হওয়ার কথা নয়। ক্যাসিওপিয়া তারকামন্ডল হিসেবে অতি বিশিষ্ট। তা ছাড়া মন্ডলটি আছে একেবারে ছায়াপথের কোলের উপরে, উত্তর আকাশে ছায়াপথের ঠিক পশ্চিমে। ফলে মন্ডলটি চেনার সঙ্গে-সঙ্গে ছায়াপথটিও লক্ষ করা যাবে।

ক্যাসিওপিয়া সুদূর উত্তর আকাশের তারকামন্ডল বলে এর থেকে বেশি দূরে নয়, দেখতে পাওয়া যাবে বিখ্যাত ধ্রুবতারাকে। ধ্রুবতারা হল Pole star। Pole অর্থ মেরু। ধ্রুবতারাকে দেখা যায় মেরুর কাছাকাছি। ক্যাসিওপিয়া থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে হবে খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে, তা হলে ধ্রুবতারাকে ঠিক চেনা যাবে। কলকাতার আকাশে যদি ধ্রুবতারাকে লক্ষ করার চেষ্টা করো, তা হলে তাকে দেখতে পাবে উত্তর দিকে—পৃথিবী যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে, সেখান থেকে কিছুটা উপরে।

ধ্রুবতারার আসল বৈশিষ্ট্য হল, ধ্রুবতারা স্থির। ধ্রুব অর্থও তাই। যার গতি নেই। আকাশে সূর্য, চন্দ্র আর সব তারাকে দেখা যায় চলমান—নির্দিষ্ট পথে তারা চলে নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে। ব্যতিক্রম কেবল ধ্রুবতারা। আসলে যে কল্পিত অক্ষরেখাকে ঘিরে পৃথিবী পাক খাচ্ছে, ধ্রুবতারা আছে প্রায় সেই অক্ষরেখার উপরে। সেইজন্য পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গে যখন সব তারাকে একটু-একটু করে আকাশপটে আমরা সরে যেতে দেখি, তখন ধ্রুবতারা অচঞ্চল। ধ্রুবতারা যে বিশেষ উজ্জ্বল তারকা, তা নয়। কিন্তু কাছাকাছি আর তেমন কোনও উজ্জ্বল তারা না থাকায় চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না। ধ্রুবতারা শিশুমার মন্ডলের তারকা। শিশুমারের বিদেশী নাম উর্সা মাইনর (Ursa minor)।

এ-মাসে ছায়াপথকে ঘিরে ক্যাসিওপিয়া আর ধ্রুবতারাকে নিয়ে শিশুমার মন্ডলকে দেখা যাচ্ছে ছায়াপথের পশ্চিমে। কিন্তু ছায়াপথের পূর্বে, নদীর অন্য তীরের মতো, ক্যাসিওপিয়ার উলটো মুখে উঠে আসছে এনড্রোমিডা আর পেগাসাস মন্ডল। গভীর রাতে এদের মাথার উপরে দেখা যাবে ভালভাবে।

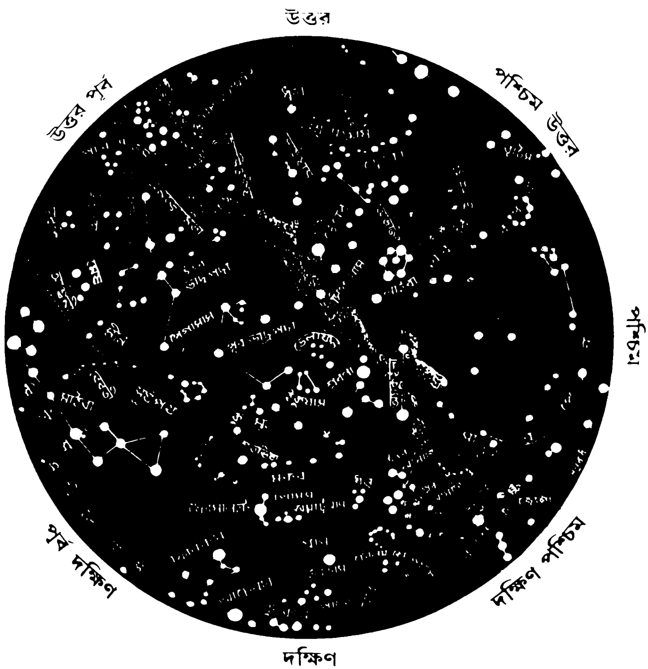

এনড্রোমিডায় ছোট-বড় তারার সংখ্যা অনেক, আকাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এর বিশেষ উজ্জ্বল তারাদের মধ্যে আছে আলমাক (Almak) আর মিরাক (Mirach)। উজ্জ্বল তারাদের বিচারে আলমাক মন্ডলের একেবারে উত্তর প্রান্তের তারকা। আর আলমাকের দক্ষিণের উজ্জ্বল তারাটির নাম মিরাক। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলমাক আর মিরাক তারা দুটি কিন্তু অত্যন্ত বিশিষ্ট। আলমাক মন্ডলের তৃতীয় উজ্জ্বলতম তারকা—ক্লাসের থার্ড বয়ের মতো, মিরাক তা হলে হবে সেকেন্ড বয়। অনেক দূরের তারা বলে আমরা আলমাককে ছোট দেখি। আসলে এ-তারাটা একটা দানবাকৃতি তারকা। দেখতে কমলা রঙের। আর একটা তারা হিসেবে বললে কী হবে, এতে আছে তিনটে তারকা।

মিরাক তারাটিও অবহেলা করার মতো ছোট আকারের কোনও তারকা নয়। দানবাকৃতি, লাল রঙের—এনড্রোমিডা মন্ডলে এটিও নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ভাস্বর।

কিন্তু এনড্রোমিডা মন্ডলে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা কোন্‌টি ? এ তারাটির নাম সিরা (Sirrah), আছে মন্ডলের একেবারে দক্ষিণ ভাগে। এনড্রোমিডা মন্ডলের এই তিনটি তারার সাহায্যেই এনড্রোমিডা মন্ডলের বিশিষ্টতা এবং এদের সাহায্যেই মন্ডলটিকে চেনা যায় সহজে।

এই সিরা তারাটি থেকেই আর-একটা মন্ডলের শুরু। এই তারাটি যেন দুটো রাস্তার মোড় কিংবা বলা যায় দুটো ভিন্ন পরিচয়ের ছেলে যেন এখানে এসে একে অন্যের হাত ধরেছে। মন্ডলটির নাম পেগাসাস (Pegasus)। সিরাকে নিয়ে পেগাসাসের চারটি তারায় একটি ঘুড়ির আকৃতি। কিন্তু সিরা পেগাসাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। সিরা সমেত এনড্রোমিডা যেন পেগাসাস ঘুড়ির একটা লেজ। পেগাসাসের ঘুড়ির সব কটি তারাই অন্যান্য তারকার তুলনায় মোটামুটিভাবে বেশি উজ্জ্বল। তাই সহজেই নজরে আসে।

পেগাসাস কথার অর্থ পক্ষিরাজ। পৌরাণিক উপাখ্যানে আছে, এই পক্ষিরাজে চড়ে গ্রিকবীর পারসিউস রাজকন্যা এনড্রোমিডাকে উদ্ধার করেন।

পেগাসাস এবং এনড্রোমিডা দুটি মন্ডলেই দুটি নীহারিকা দেখা যায়। তবে এনড্রোমিডা মন্ডলের পটভূমির উপরে যে নীহারিকাটি আছে, সেটিকে খালি চোখেই দেখা যায় এক টুকরো পেঁজা তুলোর মতো। সম্প্রতি হিসেব কষে জানা গেছে, পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব হবে ২২ লক্ষ আলোকবর্ষের মতো। খুব দূরের বস্তুকে এইভাবে মেঘহীন, অনুকূল আকাশে দেখতে পাওয়া কম আনন্দের কথা নয়।

চাঁদের স্ত্রী হিসেবে চাঁদের চলার পথের উপরে যে ২৭ নক্ষত্র আছে, এনড্রোমিডা আর পেগাসাসের তারাদের নিয়ে প্রাচীনকালে আমাদের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দুটি নক্ষত্রের কল্পনা করেন। এর একটি পূর্ব ভাদ্রপদ, অন্যটি উত্তর ভাদ্রপদ। পূর্ব ভাদ্রপদ ২৫তম আর উত্তর ভাদ্রপদ ২৬তম।

ছায়াপথের পূর্ব দিক দিয়ে উত্তর থেকে ক্রমাগত নেমে আসতে আসতে এনড্রোমিডা, পেগাসাস পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ডেলফিন (Delphin), ইকুলিয়াসের (Equuleus) মতো ছোট-ছোট দু'-একটি তারকামন্ডল পার হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছে যাব একটি রাশিতে। এটি মকর রাশি, বিদেশী নাম ক্যাপরিকর্ন (Capricorn)। ধনু রাশিকে চিনেছি আমরা, ধনু রাশি নবম রাশি, মকর দশম রাশি। মকর রাশি ছায়াপথ থেকে আবার অনেকটা পূর্ব দিকে সরে গেছে।

মকর রাশিতে কিন্তু তেমন উজ্জ্বল তারকা একটিও নেই। ধনু রাশির পূর্ব দিকে দক্ষিণের আকাশে কিছু অনুজ্জ্বল তারা আছে। ওইসব তারায় সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মকর রাশিটির কল্পনা করেছিলেন। মকর একটা বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তু। বৃহৎ জন্তু বটে, কিন্তু ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে খুবই ম্রিয়মাণ। তারায়-তারায় ফুটে ওঠা জন্তুটি তেমনভাবে কোনও রূপ ধরে না। কিন্তু জন্তুটির সামনের দিক আছে পশ্চিম আকাশে আর পুচ্ছভাগ পূর্বে। মকর রাশির বিভিন্ন অনুজ্জ্বল তারাদের মধ্যে একেবারে পশ্চিম প্রান্তের উত্তর দিকের তারা দুটি খুব কাছাকাছি আছে। এই তারা দুটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মতো—মহাকাশে এরা পরস্পরকে ঘিরে ঘুরে চলেছে।

মনে রাখতে হবে, আকাশপটের দিকের সঙ্গে পার্থিব উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মিলবে না। সেইজন্য তারকাপটটিকে মাথার উপরে নিচু করে ধরে উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে নিতে হবে। পূর্ব-পশ্চিম মিলে যাবে সঙ্গে-সঙ্গে।

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাশাপাশি দুটি ঘোড়ায় বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চললেন মহারাজ মহাচূড়ামণি এবং রাজপুরোহিত ছন্তী।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে, রাজধানীর সমস্ত মানুষই এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কেউ জানেই না রাজ্যের এখন কতখানি বিপদ। বিদ্রোহ করেছে সেনাপতি চম্পক, এই রাজ্যের মহারানি সেই চম্পকের কাছে বন্দিনী। মহারাজ গোপনে চলেছেন রাজধানী ছেড়ে, সঙ্গে একজনও সৈন্য নেননি, শুধু রাজপুরোহিত তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কোনও বাড়িতেই এখন বাতি জ্বলছে না। কিন্তু পথের মোড়ে-মোড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে মশাল।

এই রাজ্যে চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই। রাত্রে পথে-পথে পাহারাদারও থাকে না। তবে নগরীর দু' দিকে দুটি প্রবেশ-দ্বারে প্রহরী থাকে সর্বক্ষণ। মহারাজ ও রাজপুরোহিত সেই দ্বার এড়িয়ে একটা জলাভূমি দিয়ে চলে গেলেন রাজধানী ছাড়িয়ে।

মহাচূড়ামণি যখন অন্য সময়ে যুদ্ধযাত্রায় বেরোন কিংবা শিকার করতে যান, তখন সঙ্গে শুধু সৈন্যবাহিনী ছাড়াও বহু জিনিসপত্র, দাস-দাসী, রান্নার লোক, ধোপা-নাপিত সবই থাকে। আজ সঙ্গে কিছুই নেই।

আজ মহারাজের মনখারাপ তো বটেই, একটু পরে খিদেও পেয়ে গেল। তাঁর কখন যে ঘুম পাবে আর কখন খিদে পাবে, তার কোনও ঠিক নেই। এখন তাঁর মনে রাগ আর দুঃখ একসঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে রেখেছে, তাই ঘুম পাবে না। কিন্তু এই অবস্থাতেও খিদে পেতে বাধা নেই।

মহারাজ একটু পরে বললেন, "গুরুদেব, আপনি খেয়ে এসেছেন? আপনার খিদে পায়নি তো?"

রাজপুরোহিত বললেন, "না, মহারাজ, আমার খিদে পায়নি। আমি একদিন-দু'দিন না খেয়েও থাকতে পারি। কিন্তু আপনার খিদে পেয়েছে বুঝি?"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, হঠাৎ বেশ খিদে পেয়ে গেল! এখান থেকে চম্পকের শিবির কত দূর?"

ছন্তী বললেন, "খুব বেশি দূর নয়। রাত্রি ভোর হবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব।"

মহারাজ বললেন, "এখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর। ভোরবেলা চম্পকের শিবিরে পৌঁছে তাকে হত্যা করব। তারপর তার সৈন্যদের দমন করব। তারপর কিছু খেতে পাব? এতক্ষণ কি আমার সহ্য হবে?"

ছন্তী বললেন, "খুব বেশি সময় তো নয়, মহারাজ। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন না?"

মহারাজ বললেন, "মনে হয় না। পেটে খিদে থাকলে আমি অন্য কোনও কাজে মন দিতে পারি না।"

ছন্তী বললেন, "তবে তো মুশকিল হল, মহারাজ। এখন খাবার কোথায় পাওয়া যাবে? তা হলে এদিকের কোনও গৃহস্থের বাড়ি খুঁজব? সে-বাড়ির লোকদের ডেকে বলব, আপনাকে খাবার দিতে! কিন্তু এদিককার যে-কোনও প্রজাই যে আপনাকে দেখে চিনে ফেলবে! তা হলেই আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে। আমি চাই, আমাদের অভিযানের কথা কেউ জানতে না পারে!"

মহারাজ বললেন, "তা হলে কোনও প্রজার বাড়িতে যেতে হবে না! গুরুদেব, এদিকে কোনও ফলের গাছ নেই?"

ছন্তী বললেন, "এদিকে সবই তো দেখছি খেজুর গাছ। আপনি কি শুধু খেজুর খেয়ে খিদে মেটাতে পারবেন?"

মহারাজ বললেন, "পাকা খেজুর অতি উত্তম জিনিস। দেখুন দেখি, কোন গাছটিতে বেশ ভাল খেজুর ফলেছে?"

আকাশে অল্প-অল্প জ্যোৎস্না। গাছের মাথাগুলো ভাল দেখা যায় না। ছন্তী সঙ্গে কোনও মশালও আনেননি।

তবু একটা গাছের কাছে থেমে তিনি বললেন, "মহারাজ, এই খেজুর গাছটিতে যথেষ্ট খেজুর আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু লম্বা গাছ। খেজুর পাড়া যাবে কী করে? আমি তো গাছে উঠতে শিখিনি।"

মহারাজ বললেন, "আপনি গাছে উঠতে পারেন না? আমিও কখনও গাছে উঠিনি। তা হলেও একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে!"

মহারাজ ঘোড়া থেকে নেমে খাপ থেকে তলোয়ার বার করলেন।

ছন্তী বললেন, "এ কী করছেন মহারাজ? তলোয়ার দিয়ে খেজুর গাছ কাটবেন নাকি? আপনার অমন মহার্ঘ তলোয়ারটি নষ্ট হয়ে যাবে!"

মহারাজ বললেন "এবার দেখুন আমার শক্তি। মনে করুন, এই গাছটাই চম্পকের গলা। আমি কী করে এক কোপে তার গলা কাটব, সেটা দেখুন!"

মহারাজ তলোয়ার তুলে প্রচণ্ড জোরে এক কোপ বসালেন। অত বড় খেজুর গাছটা দু' খণ্ড হয়ে গেল। ধপাস করে সেটা পড়ল একদিকে।

ছন্তী বললেন, "আশ্চর্য! আশ্চর্য! মানুষের গায়ে যে এত শক্তি থাকতে পারে, তা চোখে দেখলেও যেন বিশ্বাস করা যায় না!"

মহারাজ এক ছড়া পাকা খেজুর ছিঁড়ে নিয়ে টপাটপ মুখে দিতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তা শেষ হয়ে গেল। তিনি আর-এক ছড়া নিলেন। তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "বাঃ, বেশ মিষ্টি!"

ছন্তী অস্থির ভাবে তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভোর হয়ে গেলে চম্পকের শিবিরে গোপনে প্রবেশ করার অসুবিধে হবে।

মহারাজ আরও দু' ছড়া খেজুর শেষ করলেন। তারপর আবার যাত্রা শুরু হল।

সমতল ছেড়ে এবার পাহাড়ে উঠতে হবে। অন্ধকারে পথ ভাল বোঝা যায় না। জঙ্গলের মধ্যে একটা সরু পায়ে-চলা পথ আছে বটে। ছন্তী এ-পথে আগে কয়েকবার এসেছেন, তিনি অতিকষ্টে পথ খুঁজে-খুঁজে চলেছেন আগে-আগে। ঘোড়ার পায়ের কপাকপ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বাতাস থেমে আছে। অরণ্যের একটি পাতাও নড়ছে না।

হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেলেন ছন্তী। উৎকর্ণ হয়ে কী যেন

শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "মহারাজ, কিছু শুনতে পাচ্ছেন?"

মহারাজ বললেন, "মনে হচ্ছে পায়ের আওয়াজ। কেউ আমাদের পিছু-পিছু আসছে গোপনে?"

ছন্তী বললেন, "মানুষ নাও হতে পারে। মহারাজ, এই জঙ্গলে ভাল্লুকের উপদ্রব আছে। মনে হচ্ছে, দু-একটা ভাল্লুকই চলাফেরা করছে। হঠাৎ সামনে কোনও ভাল্লুক এসে পড়লে বিপদে পড়ে যাব।"

মহারাজ অবাক হয়ে বললেন, "ভাল্লুক এলে আবার বিপদ কিসের? ভাল্লুক আমাদের কী করবে? এবার আমি সামনে যাচ্ছি, আপনি আসুন আমার পেছনে।"

তলোয়ার উঁচিয়ে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন মহারাজ। সোজা উঠে এলেন পাহাড়ের একেবারে চূড়ার কাছে। তার সামনে একেবারে খাড়া পাথর। আর কোনও পথ নেই।

ছন্তী এসে পৌঁছলেন একটু পরে।

ঘোড়া থেকে নেমে তিনি বললেন, "মহারাজ, আমরা সুড়ঙ্গটার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। এবার খানিকটা পায়ে হেঁটে যেতে হবে।"

মহারাজও ঘোড়া থেকে নামলেন। ঘোড়া দুটিকে বেঁধে রাখা হল সেখানে একটি গাছের সঙ্গে।

আস্তে-আস্তে পাহাড়ের পূর্ব দিগন্ত লাল হয়ে আসছে। পাহাড়ের এক কোণ থেকে মাথা তুলছেন সূর্য। একটু আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে ডাকাডাকি করতে শুরু করেছে নানারকমের পাখি।

পাহাড়ের ফাটল ধরে খানিকটা এগোতে-এগোতেও আবার থামতে হল। এবারে একেবারে নিরেট দেওয়ালের মতন পাথর, কোনও ফাঁকফোকর নেই।

ছন্তী সেই পাথরের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "মহারাজ, আমরা এসে গেছি। এই পাথরটার ওপারেই সেই সুড়ঙ্গ শুরু হয়েছে। চম্পকের শিবিরে পৌঁছতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না। আকাশে আলো ফুটে গেল অবশ্য। তা হোক, চম্পক এত ভোরে জেগে উঠবে না নিশ্চয়ই।"

মহারাজ বললেন, "এই পাথরের দেওয়ালটা যে অনেকখানি উঁচু। এর ওপাশে যাব কী করে?"

ছন্তী বললেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে একটু উঁচু করে তুলে ধরুন। আমি আগে এর ওপরে উঠে দেখি, রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না। দৈবাৎ এদিকেও যদি কোনও প্রহরী থাকে, তাকে আগে শেষ করতে হবে।"

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুদেব, আপনি আগে ওপরে উঠবেন? যদি কোনও প্রহরী থাকে, আপনাকে দেখে ফেলে? আমিই আগে উঠি বরং!"

ছন্তী বললেন, "না, মহারাজ। যদি প্রহরীর সংখ্যা বেশি হয়? আমার প্রাণ গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনি রাজা, আপনাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তবে, এত কম আলোয় আমাকে দেখতে পাবে না মনে হয়। যদি বেশি প্রহরী থাকে, তা হলে আমাদের অন্য পথের কথা চিন্তা করতে হবে। এই সুড়ঙ্গের আর-একটা মুখও আছে। নিন, আমাকে একটু তুলে ধরুন, মহারাজ।"

ছন্তীর পাতলা ছিপছিপে চেহারা, মহারাজ তাঁকে অনায়াসেই দু' হাতে উঁচু করলেন, ছন্তী উঠে গেলেন সেই পাথরের দেওয়ালের ওপর। সেখানে বসে পড়েই খুব উৎফুল্ল ভাবে বললেন, "দারুণ সুযোগ, মহারাজ! একজনও প্রহরী নেই। পথ একেবারে পরিষ্কার।"

তলা থেকে মহারাজ বললেন, "বাঃ! তবে তো কোনও কথাই নেই!"

ছন্তী বললেন, "সুড়ঙ্গের ওপাশে চম্পকের শিবিরের খানিকটা অংশও দেখা যাচ্ছে। কেউ জেগে ওঠেনি। কাউকে নড়াচড়া করতেও দেখা যাচ্ছে না।"

মহারাজ বললেন, "আপনি এবার নেমে আসুন, গুরুদেব। এবার আমি যাব। আর আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না।"

ছন্তী একলাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। তারপর বললেন, "মহারাজ, কোনও শব্দ করবেন না। খুব সাবধানে যেতে হবে।"

কিন্তু মহারাজ মহাচূড়ামণিকে ওপরে তুলে দেওয়া অত সহজ হল না। তাঁর বিশাল চেহারা। ছন্তী অত ভারী একজন মানুষকে তুলতে

পারবেন কী করে ?
অনেক ঠেলাঠেলি করেও বিশেষ কোনও ফল হল না।
মহারাজের মাথা থেকে মুকুটটা খসে পড়ে ঝনঝন শব্দ হল ! মহারাজ বললেন, "যাক, মুকুটটা যাক। আমি ওপরে ওঠার পর ছুঁড়ে দেবেন !"
মহারাজের কোমরের তলোয়ারটা নিয়েও অসুবিধে হল বেশ। অত বড় খাপসুদ্ধু তলোয়ার, বারবার ঠেকে যাচ্ছে পাথরে। মহারাজ কোমর থেকে সেটাও খুলে ফেলে বললেন, "এটাও আপনার কাছে রাখুন। পরে আমার হাতে দিয়ে দেবেন !"
ছন্তী এবার মহারাজের কোমরে দু' হাত দিয়ে খুব জোরে চাপ দিলেন ওপরের দিকে। মহারাজও সেইসঙ্গে লাফ দিয়ে ধরে ফেললেন পাথরের ওপরের দিকটা।
তারপর তিনি হাতের জোর দিয়ে ওপরে উঠে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "এ কী ?"
ছন্তী জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, মহারাজ ?"
মহাচূড়ামণি বললেন, "কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। সুড়ঙ্গ কোথায় ? এ যে দেখছি একটা অন্ধকার খাদ ? আপনি কোথায় দেখতে পেলেন চম্পকের শিবির ? সেরকম কিছুই তো নেই !"
ছন্তী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, "দেখতে পাচ্ছেন না ? সে কী ? ভাল করে নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখুন !"
মহারাজ বললেন, "কই, কোথায় সুড়ঙ্গ ?"
ছন্তী বললেন, "উঠে দাঁড়ান, ভাল করে দেখুন। একটু নীচেই তো সুড়ঙ্গটা রয়েছে, আমি স্পষ্ট দেখলাম !"
মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "গুরুদেব, আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি না !"
ছন্তী আবার হেসে বললেন, "এইবার ঠিক দেখতে পাবেন !"
সঙ্গে-সঙ্গে তিনি এক ধাক্কা দিলেন মহারাজের পিঠে। মহারাজ নিজের শরীরের ভার সামলাতে পারলেন না। আঁ-আঁ-আঁ শব্দ করে তিনি পড়ে যেতে লাগলেন খাদের মধ্যে।
সেই খাদটা অনেক গভীর। তলা পর্যন্ত দেখাই যায় না।
মহারাজ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়বার আগেই আটকে গেলেন এক জায়গায়। চিৎকার করতে লাগলেন, "বাঁচাও, বাঁচাও !"
ছন্তী এবার মহারাজের তলোয়ারটা নিয়ে একাই নিপুণভাবে লাফ মেরে উঠে পড়লেন পাথরের দেওয়ালের ওপর। ঝুঁকে দেখলেন, একটু নীচে মহারাজ একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলছেন।
কোনওক্রমে মুখ তুলে ছন্তীকে দেখতে পেয়ে মহারাজ ব্যাকুলভাবে বললেন, "গুরুদেব, গুরুদেব, কী করলেন আপনি ? আপনার হাতের ধাক্কা লেগে আমি পড়ে গেলাম। শিগগির আমাকে টেনে তুলুন !"
ছন্তী গাছটাকে কেটে ফেলবার জন্য একটা কোপ মারলেন।
মহারাজ বললেন, "এ কী করছেন, গুরুদেব ? গাছটা কাটছেন কেন ?"
ছন্তী বললেন, "বুঝতে পারছেন না ? আপনার কষ্ট ঘুচিয়ে দিচ্ছি। কতক্ষণ আর ঝুলে থাকতে পারবেন ওভাবে ? অতবড় ভারী শরীর নিয়ে আপনি ওপরে উঠতে পারবেন না কখনও !"
মহারাজ বললেন, "গুরুদেব, আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চান ? আমি চলে গেলে এই রাজ্য কে চালাবে !"
ছন্তী বললেন, "তোমার মতন একটা মাথা-মোটা, গোঁয়ার গর্দভ এ দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে ! তোমার থেকে চম্পক অনেক ভাল রাজা হবে।"
মহারাজ বললেন, "গুরুদেব, আমি প্রাণভিক্ষা চাইছি। আমি কোনওদিন আপনার কোনও ক্ষতি করিনি। আমাকে একবার বাঁচার সুযোগ দিন। আমাকে ওপরে টেনে তুলুন ! আমি না বাঁচলে মহারানিকে কে উদ্ধার করবে ?"
ছন্তী বললেন, "তোমাকে আর কোনও সুযোগ দেব না, শয়তান !"
তারপর তিনি গাছটা কাটার জন্য আবার তলোয়ারটা তুলতেই শুনতে পেলেন একটা ভেড়ার ডাক। ছন্তী চমকে উঠলেন দারুণভাবে।
মুখ তুলে তিনি দেখলেন, একটু দূরে একটা ভেড়ার পালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একজন মাঝবয়েসী লোক, তার সঙ্গে সাত-আট বছর বয়েসী একটি বাচ্চা ছেলে। তারা হাঁ করে এই ব্যাপার দেখছে।
মহারাজ আর্ত চিৎকার করলেন, "বাঁচাও ! বাঁচাও ! যে-বাঁচাবে, তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেব ! যা চাইবে তাই দেব ! গুরুদেব, আপনাকে আমি সোনার সিংহাসন গড়িয়ে দেব !"
ছন্তী দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "তুমি যমালয়ে যাও, মহাচূড়ামণি !"
খুব জোরে একটা কোপ দিয়ে তিনি কেটে ফেললেন গাছটা। মহারাজ মহাচূড়ামণি ঘুরতে-ঘুরতে পড়তে লাগলেন নীচের দিকে। একটু পরেই তাঁকে আর দেখাই গেল না। একেবারে নীচে পড়ে তাঁর হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে।
ছন্তী এবার ক্রুদ্ধ চোখ তুলে বয়স্ক রাখালটিকে বললেন, "এদিকে আয় !"
রাখালটি কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "এ কী করলেন প্রভু ? আমাদের রাজাকে আপনি মেরে ফেললেন ?"
ছন্তী বললেন, "রাজাকে তার যোগ্য শাস্তি দিয়েছি। অনেক আগেই ওকে সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল। তুই এদিকে আয় ! কাছে আয় !"
লোকটি বলল, "আমি একজন সামান্য মেষপালক। আমাকে কেন ডাকছেন প্রভু ?"
ছন্তী ডান হাত তুলে বললেন, "যা দেখেছিস, তা যদি কারও কাছে কখনও বলিস, তা হলে আমার অভিশাপে তুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবি। আর যদি না বলিস, তা হলে পুরস্কার পাবি। এদিকে আয়, তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, রাজাকে কেন এই শাস্তি দিতে হল। তোর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আয়।"
এখানে চম্পকের শিবির-টিবির কিচ্ছু নেই। সুড়ঙ্গও নেই। রয়েছে শুধু এই ভয়ঙ্কর খাদ। তার ওপাশে সাধারণ একটি গ্রাম। সেই গ্রামের মেষপালকটি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ফেলে ভয়ে কাঁপছে এখনও। রাজপুরোহিতের আদেশ সে অমান্য করতে পারল না।
সে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল ছন্তীর কাছে। ছেলেটির হাত ধরে রইল।
সে কাছে আসবার পর ছন্তী বাচ্চাটাকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। বয়স্ক লোকটিকে ধমক দিয়ে বললেন, "প্রণাম কর আগে। তারপর পুরস্কার পাবি।"
লোকটি প্রণাম করার জন্য মাথা নিচু করল।
ছন্তী তক্ষুনি তলোয়ারের এক কোপে তার মুণ্ডুটা কেটে ফেললেন।
তারপর তিনি বাচ্চাটিকেও হত্যা করার জন্য পাশ ফিরলেন বটে, কিন্তু সে সুযোগ পেলেন না। বাচ্চাটি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক লাফ মারল উঁচু পাথর থেকে। নীচে পড়েই সে দৌড় লাগাল।
ছন্তী সেই বাচ্চাটিকে খানিকটা তাড়া করেও আর ধরতে পারলেন না। সে তীরের মতন ছুটে মিলিয়ে গেল অরণ্যের মধ্যে। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে নেবেন, লর্ড গ্রেস্টোন ? তখন বোঝা যাবে এখানে ঝুঁকি নেবার অধিকারটা কার ।
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
এসো, টম ।
আফ্রিকার উপকূল ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগরের বুকে জলমগ্ন রত্নের সন্ধানে চলেছে টরটুগা । স্কুবা ডাইভিং করে রত্নের খোঁজে ক্যাপ্টেন টম কিনসায়েডের সঙ্গী হবার অধিকার অর্জনের জন্য সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে টারজান···
এই সমুদ্রযাত্রায় আপনি জখম হলে তার দায়িত্ব আমার, বুঝলেন ?
ইয়োর লর্ডশিপ, আপনার পাঞ্জায় দারুণ জোর । আপনি বাইরের কাজ করেন, না অন্য কিছু ?
তোমরা দু'জনে সমান-সমান বলে মেনে নিচ্ছ না কেন ?
অন্য কিছু ।
এবার ক্যাপ্টেনের হাড়ে কাঁপুনি ধরার সময় এসেছে ।
ইয়োর লর্ডশিপ, জীবনে এই প্রথম আমি কারও কাছে হারলাম···
একটু দাঁড়ান···লর্ড গ্রেস্টোক···হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে ! জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক—আপনি টারজান !
যাক, তুমি তা হলে ধরা পড়ে গেলে ।
আরে, স্কুবা ডাইভিং-এ আপনার সঙ্গ পাওয়া তো দারুণ ব্যাপার ! কথাটা আমার মাথায় এসেছিল বলে খুশি । হা,হা, হা !
টম, কবুল করছি তোমাকে আমার ভাল লাগতে শুরু করেছে । আমার স্বামীকে তুমি হাসাতে পারো । ও কাজটা ও বেশি করে না ।
কিন্তু টম কিনসায়েড আর টারজান জানে না তাঁদের জাহাজে এক গুপ্তচর রয়েছে, যে কিনসায়েডের প্রতিদ্বন্দ্বীকে টরটুগার গতিবিধি জানিয়ে দিচ্ছে···

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গণপতি হিরের চোখ

আষাঢ় শ্রাবণ গেল, বৃষ্টি হল না। অথচ ভাদ্রের শুরুতেই দুর্যোগের কী ঘনঘটা। সব সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে, আর সেইসঙ্গে মাঝে-মধ্যে চলেছে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ প্রবল বর্ষণ। একটানা এবং একঘেয়ে এই বিরক্তিকর আবহাওয়ায় জনজীবনও বিপর্যস্ত। চুপচাপ ঘরে বসে থেকে হাঁফ ধরে যাচ্ছে যেন। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে লোডশেডিং। দুপুরে

খাওয়া-দাওয়ার পর শুভঙ্কর ঘরে শুয়ে পাতলা বেডকভার পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে রুদ্ধশ্বাস একটা গল্পের বই পড়ছিল। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

শুভঙ্কর উঠে এসে দরজা খুলেই অবাক, "একী বিল্টু !"

"তোর কাছেই এলাম। বিশেষ দরকারে। তোর মা কোথায় ?"

"মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু এই ভরদুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে ব্যাপারটা কী ?"

"আছে ভায়া, আছে। সব বলছি। আগে একটা গামছা দে। গায়ের জলটা মুছি। তারপর বলব।"

ওদের কথাবার্তায় মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম জড়ানো চোখে উঠে এসে মা বললেন, "কী ব্যাপার বিল্টু ! তুমি এমন অসময়ে যে ?"

"এমনি এলাম মাসিমা। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। তাই কী আর করি, চলে এলাম শুভর কাছে।"

"বেশ করেছ। ও বেচারাও নির্বান্ধব একলা বসে আছে। কী যে আরম্ভ হয়েছে ক'দিন, বিরক্তি ধরে গেল।"

শুভঙ্কর বিল্টুকে নিয়ে ওর ঘরে ঢুকল।

বেশ সাজানো-গোছানো পরিপাটি ঘর শুভঙ্করের। যদিও গলির ভেতরে বাড়ি তবুও বাড়িটা নতুন। নীচে-ওপরে করে আটখানা ঘর। অথচ বাড়িতে বাসিন্দা মাত্র ক'জন। মা, ঠাকুরমা, বাবা ও শুভঙ্কর। বাবা শিবশঙ্কর দত্ত পুলিশে কাজ করেন। ডি এস পি। কলকাতার বাইরে থাকেন। অত্যন্ত ভালমানুষ। ছুটিছাটা খুব কম। তবুও একটু-আধটু সময় পেলেই কলকাতায় আসেন। ওদের বাড়িটা অবশ্য কলকাতায় নয়। বাজে শিবপুরের একটি কানা গলিতে এবং ভদ্র পরিবেশে। ছেলের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করেই শিবশঙ্করবাবু তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে যাননি ফ্যামিলিকে। তা ছাড়া তাঁর বৃদ্ধা মা, অর্থাৎ শুভঙ্করের ঠাকুরমাও যেতে চান না এই পরিবেশ ছেড়ে। তাই উনিও খুব একটা জোর করেননি। কেননা, যতই পরিবেশ ভাল হোক তবুও এই বাজারে তালাবন্দী খালি বাড়ি ফেলে রেখে অন্যত্র থাকাটাও তো ঠিক নয়।

যাই হোক, ওরা দু' বন্ধুতে শুভঙ্করের নিজস্ব ঘরে একটা সোফায় গিয়ে বসল। এই ঘরে চার-পাঁচটি আলমারি ভর্তি যত রাজ্যের বই। ভূত, গোয়েন্দা আর অ্যাডভেঞ্চারের বই যে কত আছে তার কোনও হিসেব নেই। গলির মুখে কেষ্টদার যে ছোট্ট বইয়ের দোকানটা আছে, বাপির সেখানে বলাই আছে নতুন ভাল বই যা কিছুই বেরোক না কেন শুভঙ্করের জন্য এককপি যেন বরাদ্দ থাকে।

বিল্টু সোফায় বসে হাত দুটো ওপর দিকে টান করে একটা হাই তুলে দেহটা বেশ ভালভাবে এলিয়ে দিয়ে বলল, "আমি আজ বিকেলের ট্রেনেই বিশেষ একটু জরুরি কাজে ধলভূমগড় যাচ্ছি। তুই আমার সঙ্গে যাবি শুভ?"

"ধলভূমগড়! হঠাৎ?"

"ব্যাপার আছে। যাবি কি না বল?"

"অসম্ভব।"

"প্লিজ। তুই না করিস না রে। তুই না গেলে হয়তো আমারও যাওয়া হবে না। তুই যদি যাস তা হলে মা আমাকে আটকাবেন না।"

"তোর কি মাথা খারাপ? এই দুর্যোগে কেউ ঘর থেকে বেরোয়?"

"দুর্যোগ কেটে যাবে।"

"এ দুর্যোগ কাটার লক্ষণ কই?"

"আরে, দিঘার কাছে নিম্নচাপ। কাল সকালে অথবা দুপুরের দিকে মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠবেই।"

"কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নয়। চল না তুই। চমৎকার বেড়ানো হবে। তা ছাড়া তুই জানিস না ধলভূমগড়ের রাঙা মাটি যখন বৃষ্টিতে ভেজে তখন মাটির রূপ কেমন সিঁদুর বরন হয়ে যায়। আর দূরের ছোট-ছোট টিলা পাহাড়গুলো কী অপূর্ব দেখায়। শাল-মহুয়ার গাছগুলো সতেজ হয়ে এমন এক সবুজ গন্ধ ছড়ায় যে, তা কল্পনাও করতে পারবি না।"

"সবই তো বুঝলুম। কিন্তু এমন কী ব্যাপার ঘটল যে, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে আজই যেতে হবে?"

"ব্যাপার যা ঘটেছে তা একমাত্র তোকে ছাড়া আর কাউকেই বলা যাবে না। এমন কী মাকে বাবাকেও নয়। ভাইরা ছোট। তাদেরও নয়। তুই তো জানিস, আমাদের ওই ধলভূমগড়ের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শেঠ সুরজমল আগরওয়াল নামে এক ভদ্রলোক বাড়িটা কিনে নিচ্ছেন। মোটা টাকা দাম দিচ্ছেন তিনি। জেঠু অসম থেকে এলেই যে-কোনও দিন বিক্রি হয়ে যাবে বাড়িটা।"

"বাড়ি যখন বিক্রিই হবে তখন তার ওপর টান রেখে লাভ?"

"আছে রে আছে। ওই বাড়ি বিক্রি হবার আগেই আমার কাজ আমি সেরে ফেলতে চাই।"

শুভঙ্কর একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "তোর বাড়ির কেউ না গেলে হঠাৎ যদি আমরা দু'জনে যাই, অসুবিধে হবে না?"

"কিসের অসুবিধে? পুণ্ডরীককাকা আছেন না?"

"পুণ্ডরীককাকা কে?"

"উনি আমাদের পরিবারের একজন বলতে পারিস। খুব ভালমানুষ। আমাদের বাড়িটা তো উনিই দেখাশোনা করেন। আমার দাদুর আমলের লোক। বিশ্বাসী। বাগানের দিকে চার-পাঁচটি টালির ঘর আছে আমাদের। পুণ্ডরীককাকা বউ আর মেয়েকে নিয়ে সেখানেই থাকেন। আমাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে পাছে ওঁরা আশ্রয়হীন হন, তাই আমরা ঠিক করেছি বাগানের দিকটা বিক্রি না করে পুণ্ডরীককাকার নামে লিখে দেব।"

"খুব ভাল কথা। এটা কিন্তু তোরা একটা ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিস।"

"তুই চল না। গেলে দেখবিখন কী দারুণ ভালমানুষ ওরা। আমরা গেলে যত রাতই হোক কাকিমা ঠিক উনুন ধরিয়ে রান্না করে দেবেন। আর তিন্নি তো আছেই। খুব ভাল মেয়ে। বারো-তেরো বছরের মেয়ে, কিন্তু এমন সুন্দর চা করে যে খেলে অবাক হয়ে যাবি।"

"তোর সঙ্গে তোদের ওই ধলভূমগড়ের বাড়িতে যাবার শখ আমার বহুদিনের। কিন্তু এমন দিনে তুই এলি যে আজ এই দুর্যোগে মা-ঠাকুরমা কিছুতেই ছাড়বেন না আমাকে।"

"বলেই দ্যাখ না একবার।"

"যদি কাল সকালে যাই তা হলেই বা ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি আছে। এখন আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তা ছাড়া সকালের গাড়ি ধরার অনেক অসুবিধে। ছ'টা কুড়িতে ট্রেন। আকাশের অবস্থা কেমন থাকবে তার কোনও ঠিক নেই। সকালবেলা হয় আমি তোর বাড়িতে আসব, নয় তুই আমার বাড়িতে যাবি। তারপর বাসে চাপব। হাওড়ায় যাব। গিয়ে দেখব ট্রেন ছেড়ে গেছে। কিন্তু আজই যদি যাই আরামে যাব। এখনও হাতে অনেক সময় আছে। ধীরেসুস্থে মেজাজে যাওয়া যাবে। আজ রাত্রিটুকু বিশ্রাম নেব। তারপর কাল সকাল থেকেই শুরু করে দেব কাজ। তুই যদি যাস তা হলে ভাল। না হলে হয়তো একাই যেতে হবে আমাকে। তবে বাড়িতে তো ছাড়বে না। তাই লুকিয়ে পালাতে হবে। অবশ্য তুই গেলে বুকে একটু বল পেতাম আমি। না হলে বাধ্য হয়েই তিন্নির সাহায্য নিতে হবে।"

"কী তোর কাজ আমাকে একবার অন্তত বল।"

"তুই যদি যাস তা হলে বলতে পারি। না হলে গোপন ব্যাপার গোপনই থাক।"

"আমার যাওয়া হবে না রে।"

বিল্টু আর বসল না। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে। আমি তা হলে একাই যাই। যেতে যখন হবেই তখন অযথা দেরি করেই বা লাভ কী? মাকে একটু ম্যানেজ করবার চেষ্টা করি। রাজি হলে ভাল। না হলে পালাব।"

শুভঙ্কর ওর হাত ধরে টেনে বসাল। বলল, "দ্যাখ বিল্টু, কী তোর কাজ তা জানি না। তবে তুই যে একটা দারুণ টেনশনের মধ্যে

আছিস তা বেশ বুঝতে পারছি"। বাড়িতে না ছাড়লে একাই যখন পালাবি তখন বিষয়টা নেহাত হেলাফেলার নয়। ঠিক আছে। আমিও যাব। মাকে ঠাকুরমাকে যেভাবেই হোক রাজি করাব আমি।"

বিল্টু বলল, "আমার ঠাকুরদাদা বরদাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন। তিনি যখন ধলভূমগড়ে আমাদের বিশাল বসতবাড়ি তৈরি করেন, তখন ধলভূম বাংলার মধ্যেই ছিল। তা আমার ঠাকুরদা ছিলেন একজন ভ্রমণবিলাসী মানুষ। একদিকে তিনি ছিলেন যেমনই ভ্রমণ-বিলাসী, অপরদিকে ছিলেন তেমনই শিকারপ্রিয়। তাঁর বন্দুকের গুলিতে কত হিংস্র বা নিরীহ পশুপক্ষী যে প্রাণ হারিয়েছে তার বুঝি লেখাজোখা নেই। আমার সেই ঠাকুরদার লেখা একটি ডায়েরি আজই সকালে আমার হস্তগত হয়েছে। তাতে এমন কিছু লেখা আছে যার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই আজ এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েও আমার এই ধলভূমগড় যাত্রা।"

"ডায়েরিটা এনেছিস?"

"এনেছি।"

পলিথিনে মোড়া একটা পুরনো খাতা জামার ভেতরে প্যান্টের সঙ্গে গোঁজা ছিল। সেখান থেকে খাতাটা বার করে শুভঙ্করের হাতে দিয়ে বিল্টু বলল, "খুব মন দিয়ে পড়ে দ্যাখ এটা। একটুও অন্যমনস্ক হবি না। এটা পড়লেই বুঝতে পারবি কেন আমি এত উতলা হয়েছি।"

শুভঙ্কর বিল্টুর কথামতো একমনে পড়ে যেতে লাগল ডায়েরিটা। তাতে যা লেখা ছিল তা হল এই—

"কুমায়ুন রোহিলখণ্ড রেলের ব্রাঞ্চ লাইনে পিলিভিতে গাড়ি বদল করিয়া টনকপুর মাণ্ডি নামক স্থানে যাইতে হয়। সারদা নদীর তীরে টনকপুর একটি সাজানো শহর। নদীর ওপারে নেপাল রাজ্যের পর্বতমালা। এপারে ধুলিপাড়ের মহারণ্য। এইখান হইতেই দুইটি পার্বত্য পথ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কুমায়ুনের দুই প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে। একটি পথ গিয়াছে কাঠগোদাম হইয়া আয়ারপাটার দিকে। আর-একটি পথ তিব্বতে। তিব্বতের দিকে যে পথটি গিয়াছে সেই পথে পিথরাগোড়, ধরচুলা গারবিয়াং ও কালাপানি পর্যন্ত কোনওরকমে যাওয়া গেলেও বাকি পথ বড়ই দুর্গম। ওই দুর্গম পথের পথিক হইবার আমাদের কিন্তু খুব একটা বাসনা ছিল না। আমাদের আসল লক্ষ্য ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭,৪৬১ ফুট উচ্চে অবস্থিত ভয়ঙ্কর অরণ্যানী বেষ্টিত আয়ারপাটা অভিযান। ইহার স্থানে-স্থানে মনুষ্যবাস থাকিলেও অধিকাংশ ভাগ নিবিড় অরণ্যময় ও শ্বাপদসঙ্কুল। ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রভাবে এখন এই স্থানে সুন্দর-সুন্দর ঘর-বাড়ি তৈরি হইলেও ইহার বন্যভাব ঘুচিতেছে না। যাহাই হউক, এই আয়ারপাটার আকৃতি অতি ভীষণদর্শন। রজনীতে সরোবরের জলে যখন ইহার ছায়া পতিত হয় তখন ইহাকে কোনও ভীমকায় দৈত্য বলিয়াই ভ্রম হয়। আমরা আয়ারপাটা অভিযান করিয়াছিলাম এই কারণে যে, দক্ষিণাপথ যেমন ডেক্কানে পরিণত হইয়াছে, অসুরপথ বা অসুরপত্তন তেমনি আয়ারপাটা হয় নাই তো? এইখানে আসিয়া আরও শুনিলাম আয়ারপাটার পার্শ্ববর্তী এবং সরোবরের পশ্চিমস্থ আর-একটি পর্বতের নাম দেওপাটা। সন্দেহ তখন আশায় পরিণত হইল এবং আমরা দেওপাটা দেখিতে চলিলাম। এই পর্বত সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৭,৯৮৭ ফুট উচ্চ। অত্যন্ত রমণীয় স্থান। এই দেওপাটা দেবপথ বা দেবপত্তনের অপভ্রংশ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, ইতিহাসে দেখা যায় পশ্চিমের খাস উত্তরখণ্ডী গাড়োয়ালিদের সহিত দক্ষিণের ও পূর্বের কুমায়ুনিদের ঘোর শত্রুতা ছিল। ইহাই প্রকৃতপক্ষে আয়ারপাটাকে অসুরপত্তন বলিয়া নির্দেশ করে। বর্তমান রেলপথ হইবার পূর্বে এতদঞ্চলে আসিবার জন্য আয়ারপাটার ভিতর দিয়াই প্রবেশপথ ছিল। ভারতীয় আর্যগণ পশ্চিমের দেবপথ দিয়া প্রবেশ করিতেন বলিয়া হয়তো এই স্থান দেবপত্তনে পরিণত হইয়াছিল এবং পরে দক্ষিণে যখন উপনিবেশ স্থাপন করেন বা দক্ষিণের পথ দিয়া আর্যাবর্তে গমন করেন তখন নিদর্শক হিসাবে দক্ষিণের এই পর্বতকে আর্যপত্তন বা আর্যপথ নামে অভিহিত করেন নাই তো? ইহা গবেষকদের ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়। আমরা বেশ কয়েকদিন ধরিয়া এই আর্যপথ আয়ারপাটা ও দেবপত্তনের গুহাগুলি এবং নির্জন অরণ্য ঘুরিয়া সেকালের বহু দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন সংগ্রহ করিলাম। এই সময় চেমং দাওয়া লামা এক মৃত্যুপথযাত্রী তিব্বতি একটি দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য জিনিস আমাদের দেন। সেটি হল হাজার হাজার বছরের প্রাচীন নৃত্যরত এক সোনার গণপতি। এক ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই সোনার গণপতির হিরার চোখ। মূল্যবান দুইটি হিরা গণপতির দুই চোখে এমনভাবে বসানো যে, তাহা দেখিলেই চোখ যেন দ্যুতিতে ঝলসাইয়া যায়। তিব্বতি লামা আমাদিগকে অনুরোধ করেন এই গণপতির মূর্তিটি আমরা যেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে গারবিয়াং-এ তাঁর স্ত্রীর নিকট পৌঁছাইয়া দিই। এই প্রাচীন মূর্তিটি কোনও এক হিন্দু রাজা এক সন্ন্যাসী মারফত রাবণ হ্রদে বিসর্জনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পথে খাম্পা দস্যুদল কর্তৃক মূর্তিটি অপহৃত হয়। কিন্তু এই অভিশপ্ত মূর্তি অপহরণকারী দস্যুদল হঠাৎ তুষারঝড়ে নিহত হয়। সন্ন্যাসী সেই মূর্তি অপহরণের ঘটনাটি সকলকে বলিয়াছিলেন। তাই আমি দীর্ঘদিন ওই মূর্তির খোঁজে জীবনের দীর্ঘ সময় নষ্ট করি। পরে যখন মূর্তিটি আমার হস্তগত হয় তখন আমার স্ত্রী বারংবার আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন এটিকে রাবণ হ্রদে ফেলিয়া দিয়া আসিবার জন্য। কিন্তু আমি লোভের বশবর্তী হইয়া এই মূর্তিটি লইয়া আয়ারপাটা অতিক্রম করিয়া সমতলে বিক্রয়ের জন্য যাইতে থাকি। ইতিমধ্যে হঠাৎ এমন গুরুতর রকমের অসুস্থ হইয়া পড়ি যে, এখন আর আমার সুদুর গারবিয়াং পর্যন্ত যাইবার সাধ্যমাত্র নাই। তাই অনুরোধ, এই মূর্তিটি আমার স্ত্রী শিরিং দাওয়া লামার হাতে তুলিয়া দিলে সে উহা অবশ্যই রাবণ হ্রদে নিক্ষেপ করিবে এবং আপনারাও ওই সঙ্গে মানস সরোবর দর্শন করিয়া আসিতে পারিবেন। দাওয়া লামার ওই হিরার চোখ বিশিষ্ট সোনার গণপতি লইয়া আমরা গারবিয়াঙের পথে রওনা হই। এই সময় পথিমধ্যে বাবর সিং তামাং নামে একজনের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু লোকটি যে একটি পাক্কা শয়তান প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। যখন পারিলাম তখন সোনার গণপতি আমরা খোয়াইয়া বসিয়াছি। যাহাই হউক, দেবী ধুরা নামক একটি স্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাবরের সহিত আমাদের আবার দেখা হইলে আমার দুই সঙ্গী অর্জুন সিং ও মহীপালের সহিত বাবরের তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বাবর সহ আমার দুই সঙ্গীই নিহত হন। আমি তখনও এই গণেশ প্রতিমার অশুভ প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হই নাই। তাই বারংবার এটি চুরি করিবার চিন্তা মাথায় আনিতেছিলাম। এক্ষণে সুবিধাই হইল। আমি মূর্তিটির একক অধীশ্বর হইয়া ইহার কুফল সম্পর্কে কোনওরকম বিচার-বিবেচনা না করিয়া গারবিয়াঙের পথ না ধরিয়া সোজা চম্পায়ত ও টনকপুর হইয়া বাড়ির পথ ধরিলাম। আমার শোবার ঘরের মাথার দিকে একটি দেওয়ালের চোর কুঠরিতে ওই মূর্তিটি গাঁথনির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। আমার পরিবারের কাহাকেও ওই মূর্তি প্রসঙ্গে কিছু বলি নাই। কেননা, বলিলেই নির্বোধরা আমাকে ওই কুসংস্কারবশত মূর্তিটি যথাস্থানে ফিরাইয়া দিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিবে অথবা লোকের কাছে রাষ্ট্র করিয়া সম্পত্তি ধারণের গর্ব জাহির করিবে। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি—আমি কিন্তু সোনা অথবা হিরার লোভে ওই মূর্তিটি চুরি করি নাই। কারণ মূর্তিটির গঠনশৈলী আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ওজন করিয়া দেখিয়াছি মোট আধসের মাত্র সোনা রহিয়াছে ওই মূর্তির ভিতর। কুড়ি টাকা ভরি হইলে আধসের সোনার কতই বা দাম? অবশ্য হিরার চক্ষু দুইটির মূল্যায়ন করা হয় নাই। যাহাই হউক। মূর্তি তো স্থাপিত হইল। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই আমি অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতেছি। আমি প্রায় রাত্রেই স্বপ্ন দেখিতেছি ওই সোনার গণপতি তাঁর হিরার চোখ দিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে

শাসাইতেছেন এবং ভয়ঙ্কর নৃত্যের মাধ্যমে বলিতেছেন, তাঁহাকে রাবণ হ্রদের জলে ফেলিয়া দিয়া আসিবার জন্য। আমি কি করিব যখন ভাবিতেছি তেমন সময় হঠাৎ একদিন রাতে…"

ব্যস। এর পর আর কিছুই লেখা নেই। হয়তো কিছু লিখবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, কিন্তু লিখে যেতে পারেননি। শুভঙ্করের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল। এই পর্যন্ত পড়ে সে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বিল্টুর মুখের দিকে।

বিল্টু বলল, "শেষ পর্যন্ত পড়লি ?"

"হ্যাঁ পড়লাম।"

"এর পরে আর কি দুর্যোগ কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় ? না, কাল সকাল পর্যন্ত তর সয় ?"

"তার আগে একটা কথা বল। তোর দাদু কীভাবে মারা যান তুই জানিস ?"

"জানি বইকী। অপঘাতে। আমাদের ধলভূমগড়ের ওই বাড়িতে একবার ভয়াবহ ডাকাতি হয়। দাদু তাতেই মারা যান। পরে আরও দু-একবার ওই ধরনের ডাকাতি হতেই আমরা দেশছাড়া হই। আমার জেঠু চা-বাগানের চাকরি পেয়ে চলে যান অসমে। এখন দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে ভুগছেন। তাঁর বড় ছেলে ব্লাড ক্যান্সারে মারা যায়। আমার বাবা খিদিরপুরে ডকে কাজ করেন। দু-দু'বার দুটি দুর্ঘটনায় একবার পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙেছেন আর-একবার বাঁ হাতের একটি আঙুল। আজ সকালে এই ডায়েরিটা আমার হাতে আসার পর থেকেই আমার চোখের সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ওই সিদ্ধিদাতা গণেশের অশুভ প্রভাব আমাদের কারও পক্ষেই শুভপ্রদ নয়। যেভাবেই হোক রাবণ হ্রদে ওকে ফেলতেই হবে। না হলে হয়তো আমাদের বংশই থাকবে না।"

শুভঙ্কর বিল্টুর কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "শোন বিল্টু, যদিও আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা রূপকথার গল্পের মতো বা কুসংস্কারে ভরা, তবুও এ-জগতের সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। তাই এ-ব্যাপারে আমিও তোর সঙ্গে একমত। এই মূর্তি যদি উদ্ধার করা যায় তা হলে একে রাবণ হ্রদে না ফেলা ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। সেখানে কীভাবে যাবি বা যেতে পারবি কি না সে-কথা আলাদা। তবে যেতেই হবে। তোর দাদুর ডায়েরির প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে, ওই মূর্তি যেখানে, অশুভ প্রভাবও সেখানে। সেই সন্ন্যাসী, খাম্পা দস্যুদল, তিব্বতি লামা বাবর সিং, অর্জুন সিং, মহীপাল, এমনকী তোর দাদুর ওই শোচনীয় মৃত্যুও একই সূত্রে গাঁথা। শুধু তাই নয়, ওই অশুভ মূর্তির প্রভাবে ওই বাড়িতে একাধিকবার ডাকাতির কথাটাও চিন্তা কর। যার ফলে আজ তোরা সর্বস্বান্ত ও ভিটে-ছাড়া। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, ওই মূর্তির ব্যাপারে তোর জেঠু কিংবা বাবা কেউ কি কিছুই জানতেন না ?"

"তা যদি জানতেন তা হলে তো সে-ব্যাপারে একটা আলোচনা হত এবং আমিও তা শুনতে পেতাম। তা ছাড়া দাদু তো কাউকেই কিছু বলে যাননি। যা লিখবার লিখেছিলেন ওই ডায়েরিতে।"

"তা হলে তোদের হাওড়ার ভাড়া-বাড়িতে ধলভূমগড়ে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে লেখা ওই ডায়েরিটা এল কী করে ? ভূতে আনেনি নিশ্চয়ই।"

"শুনেছি ধলভূমগড়ের বাড়ি থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস এখানে আনা হয়েছিল। তার সঙ্গেই হয়তো চলে আসবে এটা। তবে বাবা-মা বা ঠাকুরমার মুখে আমি এটুকু শুনেছি যে, আমাদের ওই ধলভূমগড়ের বাড়িতে নাকি সাত রাজার ধন লুকনো আছে। ওই বাড়ির জঠরে-জঠরে ইটের গাঁথনির গুপ্ত কোটরে আছে অনেক

অমূল্য রত্ন।"

"তোর দাদুর লেখা আর কোনও ডায়েরি বা অন্য কিছু ওখানে নেই ?"

"থাকতে পারে। কখনও তো ও-ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে কিছু অনুসন্ধান করিনি। তবে ডাকাতির সময় দাদুর অনেক মূল্যবান কাগজপত্র ডাকাতরা পুড়িয়ে দিয়ে যায়।"

"এই বাড়ি তোরা কী বলে বিক্রি করে দিচ্ছিস ?"

"আমি তো দিচ্ছি না ভাই, দিচ্ছেন আমার জেঠু আর বাবা। এখন আমরা গরিব হয়ে এসেছি। আগের মতো সেই প্রতিপত্তি আর নেই।"

"আমার মনে হয় ওই বাড়ির মধ্যে লুকনো কোনও মূল্যবান কিছুর কথা শুনেই ওই ব্যবসাদার বাড়িটি কিনে নিতে চান। এই ব্যবসায়ীদের কাজই হল লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে পুরনো বাড়ি কেনা এবং তার ভিত পর্যন্ত খুঁড়ে দেখা। বাড়িটা কত দামে বিক্রি হচ্ছে ?"

"শুনেছি দেড় লাখ টাকায়।"

"তা হলে ? অথচ তোরা নিজেরাই যদি ওই বাড়িটাকে ভেঙে বিক্রি করতিস, তা হলে হয়তো দেখতিস ওই বাড়ির ইট বিক্রি করেই কয়েক লাখ টাকা পেয়ে গেছিস। সাবেককালের বাড়ি যখন, বিশ ইঞ্চির দেওয়াল তো নিশ্চয়ই।"

"বিশ ইঞ্চি কী রে ! চল্লিশ ইঞ্চি।"

"তা হলে কেন এত অল্প দামে এই বাড়ি বেচে দিচ্ছিস তোরা ? এর ওপর ঘরের কড়ি-বরগা বার্মাটিকের জানলা-দরজা তো আছেই। তার ওপর সত্যিই যদি গুপ্তধন কিছু থাকে তা হলে তো কথাই নেই। বিক্রির আগে তোর বাবাকে আর-একবার ভেবে দেখতে বল।"

"মা অনেক বুঝিয়েছেন। কিন্তু বাবার ওই এক গোঁ। ওসব লুকনো ধনরত্ন মাথায় থাক। যে প্যায় সে নিক। এখন একসঙ্গে অত ক্যাশ টাকা তো হাতে পেয়ে যাই। আমি অবশ্য এই ডায়েরির কথা বা সোনার গণেশের কথা কিছু বলব না কাউকে। শুধু একবার যদি ওই জিনিস হাতে পাই তা হলে যেভাবেই হোক জিনিসটাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসে শাপমুক্ত হব।"

"তুই তা হলে সত্যিই যাবি বিল্টু ? তোর ভয় করবে না ? সে পথ কিন্তু যেমন দূর, তেমনই দুর্গম।"

"জানি। তবুও যেতে আমাকে হবেই। এখন তুই-আমি গিয়ে কোনওরকমে মূর্তিটাকে আগে উদ্ধার করি চল। এবার বুঝতে পারছিস তো কেন আমি অত করে তোকে পেতে চাইছি ? আমার আর একদম তর সইছে না। মনের ভেতরে যে কী হচ্ছে তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না। ওই বাড়ি বিক্রি হলে,ওই বাড়ি ভেঙে যখন তার প্রতিটি ইট লরিতে করে চালান হয়ে যাবে, তখন ওই ব্যবসায়ী সোনার গণেশ পেয়ে উল্লাসে নাচবে, এ-আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।"

শুভঙ্কর বলল, "সে-কথা ঠিক। তবে ধর, যদি আমরা ওই মূর্তি উদ্ধার করতে না পারি ?"

"না পারবার কোনও কারণ আছে কি ? নিশ্চয়ই পারব। গণেশের ইচ্ছাও হয়তো তাই। না হলে এতদিন বাদে ওই জিনিসটা হঠাৎ করে এই দুর্যোগের দিনে আমার হাতেই বা এল কেন ? আর কেনই বা ওই মূর্তিটাকে পাওয়ার জন্য আমার মনের মধ্যে অমন তোলপাড় করছে ?"

কথা বলতে বলতেই দুপুর গড়িয়ে গেল।

শুভঙ্কর বলল, "ট্রেন ক'টায় ?"

"সাড়ে পাঁচটায়।"

"তা হলে তো আর দেরি নেই।"

"এবার তা হলে ওঠা যাক।"

শুভঙ্কর বিল্টুকে নিয়ে ওর মায়ের কাছে এল। মা তখন চোখে-মুখে জল দিয়ে সবে চায়ের সরঞ্জামটি নিয়ে বসেছেন। শুভঙ্কর বলল, "মা ! আমাকে কয়েকটা টাকা দেবে ? খুব দরকার।"

"টাকা ! কত টাকা।"

"তা ধরো না কেন একশোর মতন।"

"একশো ! অত টাকা কী করবি তুই ?"

"আমি বিল্টুর সঙ্গে আজ সন্ধের গাড়িতে ওদের ধলভূমগড়ের বাড়িতে যাব।"

মা যেন শিউরে উঠলেন কথাটা শুনে, "তোর কি মাথাখারাপ ? এই দুর্যোগে কোথায় যাবি ? এই অবস্থায় কেউ ঘর থেকে বেরোয় ?"

"যাই না মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার অনেকদিনের সাধ ওদের বাড়িতে যাওয়ার।"

মা বললেন, "বেশ তো, যেতে চাস যা। আমি বাধা দেব না। তবে এই দুর্যোগে আমি ছাড়ব না। কোথায় কখন কী অঘটন ঘটে তা কে বলতে পারে ?" তারপর বিল্টুকে বললেন, "তোমাকেও বলি বাছা, তুমি কি আর দেশে যাবার দিন পেলে না ? একেবারে আজই যেতে হবে ?"

বিল্টু বলল, "একটা জরুরি চিঠি পেয়ে যাচ্ছি মাসিমা। না গেলে নয়। আমি একাই যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম শুভটা যদি যায়।"

"কাল সকালে যাও না।"

এবারে বিল্টুর হয়ে শুভঙ্করই বলল, "কাল গেলে হবে না মা। বলেই একটা মিথ্যে কথা বলল, "আসলে যিনি ওদের দেশের বাড়ি দেখাশোনা করেন, সেই পুণ্ডরীককাকার খুব অসুখ। টেলিগ্রাম এসেছে। তাই কিছু টাকা নিয়ে ও দিতে যাবে। দু-একদিনের তো ব্যাপার। যাব ?"

এর পরে আর কথা চলে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা বললেন, "আমি কিছু বলতে পারব না। তোমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। উনি যদি বলেন তা হলে যাবে।"

ঠাকুমা পাশের ঘরেই ছিলেন। ওদের কথা শুনে বেরিয়ে এসে বিল্টুকে বললেন, "তা বাপু এইরকম যখন অবস্থা তখন তোমার বাবা তো একবার যেতে পারতেন।"

"বাবার এখন কোনওমতেই অফিস কামাই করা চলবে না। তা ছাড়া আমি তো একা-একা দেশের বাড়িতে যাই।"

শুভঙ্কর ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি না কোরো না ঠাকুরমা। আমাকে যেতে দাও। অন্তত এই বৃষ্টি-বাদলের হাত থেকে দু' দিন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

ঠাকুরমা বললেন, "না। এই দুর্যোগে যাওয়া তোমার হবে না।"

বিল্টু বলল, "তবে থাক। আমি আসি রে শুভ। তোর মা-ঠাকুরমা কেউই যখন রাজি হচ্ছেন না তখন আমিও আর যেতে বলব না। বলা যায় না অঘটন যদি কিছু ঘটে তখন আমাকেই তো দায়ী করবেন সবাই।"

মা বললেন, "একটু বসে যাও বাবা। অনেকক্ষণ এসেছ। চা করি, একটু চা অন্তত খেয়ে যাও।"

শুভঙ্কর বলল, "থাক। ওর হয়তো দেরি হয়ে যাবে। ওকে যেতে দাও।" বলে বিল্টুকে বলল, "তোকে আর চা খেতে হবে না রে। তুই চলে যা। আর কখনও ভুলেও যেন আমাদের বাড়িতে আসিস না। আমি তোর সুসময়ের বন্ধু। অসময়ের নয়। মনে করবি তোর বন্ধু শুভঙ্কর মরে গেছে।"

মা-ঠাকুরমা দু'জনেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন এবার, "ও মা ! একী অলুক্ষুণে কথা ?"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিকই বলছি, ছেলে শুধু তোমাদেরই ঘরে আছে আর কারও ঘরে নেই, না ? ওর মা যদি এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে ওকে বুক ধরে ছেড়ে দিতে পারেন তা হলে আমাকে একটু ওর সঙ্গে ছাড়তে তোমাদের আপত্তি কী ? অতদূর পথ একটি ছেলে একা যাবে তাই। তা ছাড়া আমিও তো কচি খোকাটি নই। বাবা বাইরে থাকেন, হঠাৎ যদি কোনও কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সেদিন যদি এইরকম কোনও বৃষ্টি-বাদলা হয় তা হলে সেই অজুহাত দেখিয়েও কি তোমরা আমাকে এইভাবে ঘরে আটকে রাখবে ? আমার বাবার কাছে যেতে দেবে না ?"

এবার কাজ হল। ঠাকুরমা লাফিয়ে উঠলেন, "সেই থেকে কী সব যা-তা বলছিস বল দেখি ? বিদেশ বিভূঁইয়ে আছে ছেলেটা। দুর্গা দুর্গা।"

মা বললেন, "একশোটা টাকা হলেই তোমার হবে তো ? আমি দিচ্ছি। খুব সাবধানে যাবে। গিয়েই চিঠি দেবে কিন্তু।"

বিল্টু বলল, "এই তিন ঘণ্টার রাস্তার জন্য চিঠি কী হবে মাসিমা ? তা ছাড়া আমরা খুবজোর দু' রাত থাকব। তা আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।"

এইবার সাহস পেয়ে নরম হল মায়ের মন। বললেন, "আমি গেলে কী করে হবে বাবা ? মাকে কে দেখবে ? তা ছাড়া ওর বাবা

কখন কোন মুহূর্তে এসে পড়েন তার ঠিক কী ? তোমরা যাও । একটু বোসো । আমি গাড়ির খাবারটা করে দিই ।"

শুভঙ্কর আর বিল্টু দু'জনেই হেসে গড়িয়ে পড়ল, "গাড়ির খাবার কী হবে ? ট্রেনে চাপব কি নামব । তিন ঘণ্টার জার্নি ।"

"সত্যি !" মায়ের মুখ ঝলমলিয়ে উঠল এবার । বললেন, "আমি ভাবছি না জানি কত দূর । কী সব পাহাড়-টাহাড় আছে শুনেছিলাম ।"

"আছে তো । কিন্তু তাই বলে দূর নয় । খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম, চাকুলিয়া, ঘাটশিলা । ট্রেন থামলে তার আগেই নেমে পড়ব ।"

ব্যস । অনুমতি পাওয়া গেল । সেই সঙ্গে টাকাও । মা পেট ভরে জলখাবার খাইয়ে দিলেন দু'জনকে । শুভঙ্কর একটা কাঁধে-ঝোলা ব্যাগে ওর জামা-প্যান্ট, গামছা, দাঁত মাজার সরঞ্জাম ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে মা-ঠাকুরমাকে প্রণাম করে রাস্তায় নামল । বিল্টুর ছাতা ছিল । শুভঙ্কর তবুও নিজের জন্য একটা ফোল্ডিং ছাতা নিয়ে নিল । আকাশে মেঘ তখন আরও ঘনিয়ে আসছে । আর-একবার তেড়ে ঢালবে বুঝি ।

ওরা দু'জনে রাস্তায় নেমে এ-পথ সে-পথ করে বিল্টুদের বাড়ি এল । আসতে আসতে শুভঙ্কর বলল, "আমি গুরুজনদের কখনও মিথ্যে কথা বলি না । তবে তোদের ওই পুণ্ডরীককাকার অসুখের কথাটা বানিয়ে না বললে মায়ের মন কিন্তু গলত না ।"

বিল্টু বলল, "আমিও বলি না । অবশ্য এক-আধবারে দোষ নেই । কিন্তু এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলেই খারাপ ।"

বিল্টুদের বাড়ি এসে বিল্টুও বায়না ধরল ওর মায়ের কাছে, "মা ! এই দ্যাখো কে এসেছে ।"

"ওমা ! শুভঙ্কর ।"

"আমাকে কয়েকটা টাকা দাও না মা । আমি ওকে নিয়ে ধলভূমগড় যাব ।"

"এই বৃষ্টিতে !"

"বৃষ্টি তো কী হয়েছে ? এই দ্যাখো, শুভঙ্করও যাবার জন্যে তৈরি ।"

আসলে শুভঙ্করের বাবা ডি এস পি বলে সবাই ওদের একটু মর্যাদার চোখে দ্যাখে । তাই মা আর না করলেন না । বরং নিজেদের দেশের বাড়ির গুণগান গাইতে গাইতে বিল্টুর জামা-প্যান্ট গুছিয়ে-গাছিয়ে দিলেন ।

ওরা জি টি রোডে এসে হাওড়ার বাস ধরল । বাস একেবারে ফাঁকা । সব সিট খালি । যদিও সেগুলো বৃষ্টির জলে ভিজে শপশপ করছে । তবু লোক কোথায় ? শুধু ড্রাইভারের পিছনের লেডিজ সিটটা শুকনো ছিল । দু'জন ভদ্রলোক বসে ছিলেন সেখানে । ওরা বসবার একটুও চেষ্টা না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হিহি করে কাঁপতে লাগল । প্রবল বর্ষণে তাপমাত্রাটা হঠাৎ কোথায় নেমে গেছে । তাই বৃষ্টিভেজা শরীরে শীত লাগছে খুব ।

বাস দ্রুত এগিয়ে চলল রাস্তায় জমে থাকা জল কাটিয়ে, নৌকোর মতো ভেসে-ভেসে । অন্য দিনের মতো থমকে-থমকে ব্রেক কষে ঝাঁকানি মেরে দশ মিনিটের পথ পঞ্চাশ মিনিটে না গিয়ে দশ মিনিটেই গেল । সাবওয়ের মুখে নেমে ঢুকে পড়ল ওরা স্টেশনে ।

হাওড়া স্টেশনের ভেতরও এখন জলে জলময় । সেই প্রাণচঞ্চল হাওড়া স্টেশন এখন কেমন যেন খাঁ-খাঁ করছে । লোকজনের সংখ্যা এত কম যে, তা বুঝি আঙুল দিয়ে গোনা যায় । ওরা ঘাটশিলার দুটো টিকিট কেটে প্লাটফরমে যখন ঢুকল, স্টিল এক্সপ্রেস তখন ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে । (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

১৯০৩ : উইলবার ও অরভিল রাইট

১৮৭৮ সালে প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক মিলটন রাইট তাঁর দুই ছেলে, উইলবার (১১) ও অরভিল (৭)-কে একটি কাল্পনিক হেলিকপ্টারের মডেল উপহার দেন, তখন তিনি ভাবতেই পারেননি যে, এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটালেন । সেদিন থেকেই এই দুই ভাইয়ের আজীবন ধ্যানজ্ঞান হল আকাশে ওড়ার চেষ্টা আর বিমান তৈরি । স্কুলে পড়ার সময়ে বা ওহায়ো-র ডেটন নামে তাঁদের ছোট্ট শহরে সাইকেল তৈরির কারখানাতে তাঁরা বিমান তৈরির স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁরা জার্মানির অটো লিলিয়েন্থালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেছেন, লিলিয়েন্থালের মৃত্যুর পর তাঁরা গেলেন বর্ষীয়ান বিমানতাত্ত্বিক অক্টেভ ক্যানিয়ুটের কাছে । ক্যানিয়ুট এই তরুণ বিমানবিদ্দের নানা পরামর্শ ও উৎসাহ দেন । ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে তাঁরা দু' ভাই ছুটি কাটাতে গেলেন উত্তর ক্যারোলিনার কিটি হক নামে জায়গায় । সেখানে তাঁদের সঙ্গে গেল তাঁদেরই তৈরি ১৭ ফুট ব্যাসের ডানাবিশিষ্ট গ্লাইডার । কিন্তু পরীক্ষা আশানুরূপ হল না । তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে গেলেন, তৈরি ও পরীক্ষা হল নানাবিধ গ্লাইডার, পরীক্ষা হল উইন্ড টানেল তৈরি করে নানাবিধ আকারের ডানার বিমানকে আকাশে উড়তে সাহায্য করার ক্ষমতা আর চলল বিমানের উপযোগী হালকা ছোট গ্যাস এঞ্জিন তৈরির প্রচেষ্টা । ১৯০৩-এর সেপ্টেম্বরে তাঁরা আবার এলেন কিটি হক-এ, সঙ্গে তাঁদের নতুন বিমান ফ্লায়ার । ফ্লায়ার তৈরি হয়েছিল হালকা কাঠ, মসলিনের মতো পাতলা কাপড় আর ঘনসন্নিবিষ্ট তার দিয়ে । আর প্রপেলারের সঙ্গে ১২ অশ্বশক্তির এঞ্জিন লাগানো ছিল সাইকেলের চেন দিয়ে । বিমানে ছিল একজন বৈমানিকের স্থান, তিনি আবার বিমান পরিচালনা করবেন উপুড় হয়ে শুয়ে ।

১৯০৩ সালের রাইট ফ্লায়ারের মডেল

অবশেষে ১৭ ডিসেম্বর ফ্লায়ার ওড়ার জন্য প্রস্তুত । সকাল ১০টা ৩৫ মিনিট ।

অরভিল বিমানে উঠে বিমানের কন্ট্রোল ধরে বসলেন । এঞ্জিন চালু হল, ফ্লায়ার পেতে-রাখা কাঠের ট্র্যাকের ওপর দিয়ে মাটি থেকে সামান্য উচ্চতায় উড়ে গেল ১২০ ফুট । সময় লাগল ১২ সেকেন্ড । এর পর আরও কয়েকবার চেষ্টা হল সেইদিনই । চতুর্থ প্রচেষ্টায় ফ্লায়ার আধ মাইল উড়ে গেল ৫৯ সেকেন্ডে

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

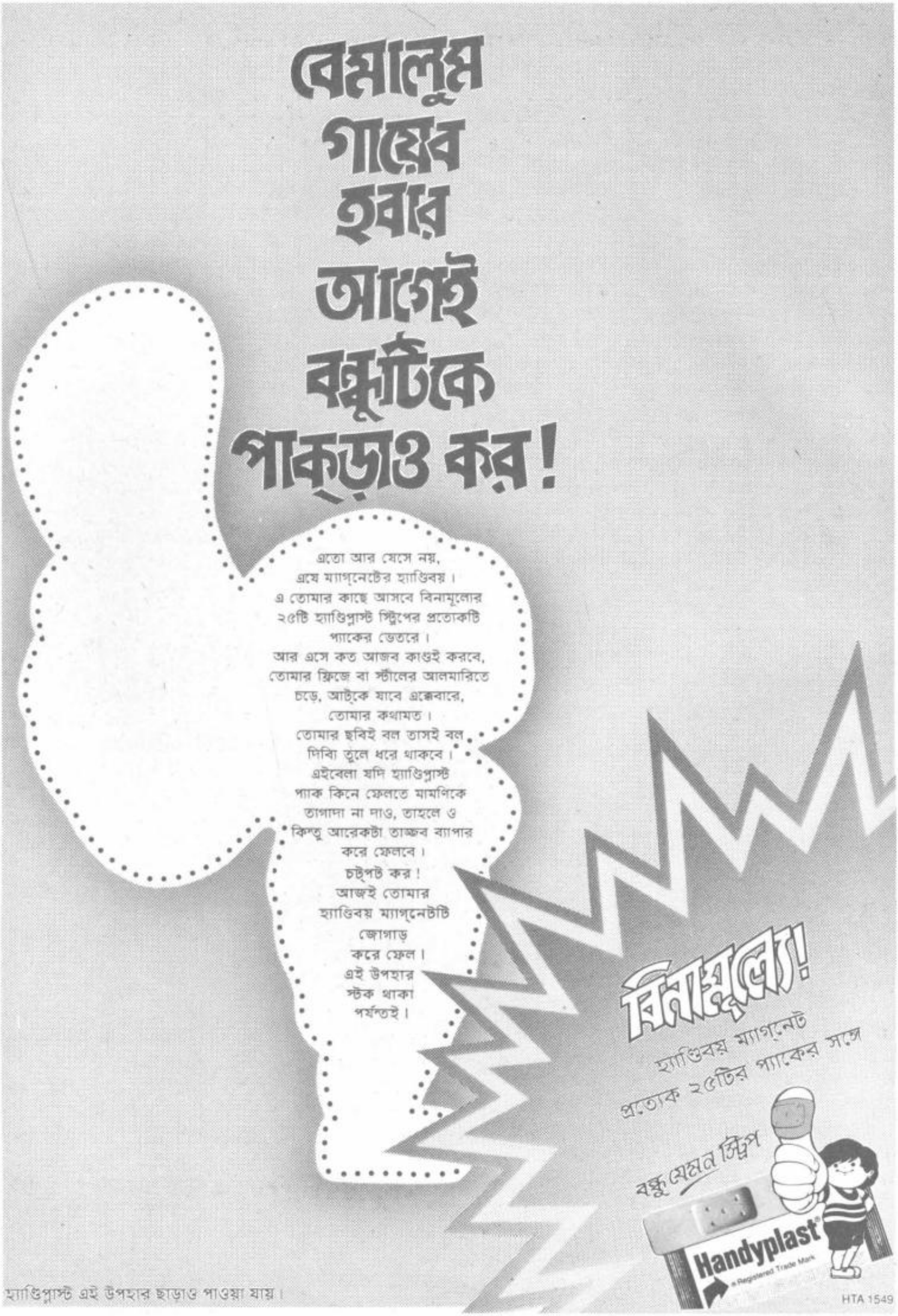
বেমালুম গায়েব হবার আগেই বন্ধুটিকে পাক্‌ড়াও কর!
এতো আর যেসে নয়,
এযে ম্যাগ্‌নেটের হ্যাণ্ডিবয়।
এ তোমার কাছে আসবে বিনামূল্যের
২৫টি হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট স্ট্রিপের প্রত্যেকটি
প্যাকের ভেতরে।
আর এসে কত আজব কাণ্ডই করবে,
তোমার ফ্রিজে বা স্টীলের আলমারিতে
চড়ে, আট্‌কে যাবে একেবারে,
তোমার কথামত।
তোমার ছবিই বল তাসই বল
দিব্যি তুলে ধরে থাকবে।
এইবেলা যদি হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট
প্যাক কিনে ফেলতে মামণিকে
তাগাদা না দাও, তাহলে ও
কিন্তু আরেকটা তাজ্জব ব্যাপার
করে ফেলবে।
চট্‌পট কর!
আজই তোমার
হ্যাণ্ডিবয় ম্যাগ্‌নেটটি
জোগাড়
করে ফেল।
এই উপহার
স্টক থাকা
পর্যন্তই।
বিনামূল্যে!
হ্যাণ্ডিবয় ম্যাগ্‌নেট
প্রত্যেক ২৫টির প্যাকের সঙ্গে
বন্ধু যেমন স্ট্রিপ
Handyplast®
® Registered Trade Mark
হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট এই উপহার ছাড়াও পাওয়া যায়।
HTA 1549

ওয়ের্ন্‌হের ভন ব্রাউন

চঞ্চল পাল

মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশযাত্রী পাঠানোর কৃতিত্ব রাশিয়ার। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে চাঁদের মাটিতে মানুষকে নামিয়ে মহাকাশ প্রতিযোগিতার দৌড়ে রাশিয়াকে অনেকটা পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় আমেরিকা। এটি সম্ভব হয়েছিল 'থ্রি-স্টেজ' রকেটের দৌলতে, যার আবিষ্কর্তা ওয়ের্ন্‌হের ভন ব্রাউন।

জুলে ভার্ন-এর 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' উপন্যাসটি পড়ে ১২ বছর বয়সের ব্রাউন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে থাকেন। ১৯৮৪ সালে ৭২ বছরের এই বিজ্ঞানীকে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনার পড়া স্মরণীয় লেখা কোনটি?" ব্রাউন সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলেন এই বইটির নাম।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর নেশা হাউই তৈরি করা। জার্মানির বার্লিন শহরের সম্পন্ন পরিবারে তাঁর জন্ম। তাই তাঁকে শখ মেটানোর জন্য আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয়নি কখনও। প্রতিবারই তিনি চেষ্টা করেন যাতে আগেরবারের চেয়ে হাউইকে আরও উঁচুতে তোলা যায়। রকেট নিয়ে গবেষণা তখন জোর কদমে চলছে। ১৯৩০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হারম্যান ওবার্থ-এর একটি গবেষণা ছাপা হয়েছিল একটি পত্রিকায়। তাতে আভাস দেওয়া ছিল যে, রকেটের উন্নতি হলেও অন্য গ্রহে যাওয়া অসম্ভব নয়। ব্রাউনের বয়স তখন ১৮। লেখাটি পড়ে মহাকাশ-বিজয়ের স্বপ্ন তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করল যে, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়াল সেই স্বপ্নকে সত্যি করে তোলা।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভর্তি হলেন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। জোগাড় করলেন তাঁরই মতো কয়েকজন স্বপ্নাচ্ছন্ন বন্ধুকে। বার্লিনের কাছে একটি পরিত্যক্ত জমি ভাড়া করলেন রকেট ছোঁড়ার জন্য। অবসর পেলেই তাঁরা চলে আসতেন এখানে, তৈরি করতেন নানা ধরনের রকেট। কোনওটা সোজা উঠে সোজা নামে, কোনওটা বেঁকে উঠে আবার সোজা হয়ে যায়, কোনওটা আদৌ ওঠেই না।

জার্মান সেনাবাহিনীর দাপট তখন ক্রমশ বাড়ছে। তাদের গুপ্তচরবাহিনীও পৃথিবীতে

ওয়ের্ন্‌হের ভন ব্রাউন

সবচেয়ে সক্রিয়। ১৯৩২ সালের জুন মাসে একদিন কয়েকজন গুপ্তচর কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশে সেখানে এসে দেখতে লাগলেন ব্রাউন আর তাঁর বন্ধুদের কাজকর্ম। গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর অফিসাররা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কারণ তাঁদের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার স্বপ্ন অনেকদিনের। কিন্তু এ-ব্যাপারে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং উৎসাহ আছে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ব্রাউনকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেনাধ্যক্ষদের মনে হল যেন তাঁরা হাতে চাঁদ পেতে চলেছেন। তাঁরা ব্রাউনকে বললেন, "পকেটের পয়সা খরচ করে কতদূর আর এগোতে পারবে! একটা রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র তৈরি করতে আর রকেট নিয়ে গবেষণা করতে তোমার যা-যা দরকার, আমরা সব দেব। প্রচুর মাইনেও পাবে। তবে আমাদের এমন রকেট তৈরি করে দিতে হবে, যা বহু দূরে, শত্রুপক্ষের দেশে সরাসরি গিয়ে পড়তে পারে।"

ব্রাউন জানতেন, এটা অনুরোধ নয়, আদেশ। তাই রাজি না হয়েও নিস্তার নেই। তা ছাড়া, ওঁদের উদ্দেশ্য যাই হোক, রকেট নিয়ে গবেষণা তো অনেকদূর এগোবে। তাই ক্ষেপণাস্ত্র-রকেট তৈরিতেই মন দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ১৯৩৯ সালে। ব্রাউনকে নিয়ে যাওয়া হল বাল্টিক সমুদ্রের ওপর পিনেমুন্ডে দ্বীপে। সেখানে জার্মানির গোপন সমরাস্ত্র কারখানায় তৈরি হতে লাগল নানারকম ক্ষেপণাস্ত্র-রকেট।

এখানে এসে নিবিষ্ট মনে রকেটের গবেষণায় ডুবে রইলেন ব্রাউন। ১৯৪৩ সালে তিনি এমন একটি রকেটের ছক তৈরি করলেন, যেটি ঘণ্টায় ৬০০০ কিলোমিটার বেগে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় উঠতে পারবে। শুধু তাই নয়, এটি ৩২০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়তে পারে। এর নাম দেওয়া হল 'ভি-২'—যাকে আধুনিক রকেট তৈরির ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়।

প্রথম দিকে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁকে কার্যত বন্দী করে রাখা হয়েছে। ভি-২ রকেট তৈরি হয়ে যাবার পর জার্মান সেনাবাহিনী তাঁর গবেষণার ব্যাপারে আর বিশেষ আমল দিচ্ছিল না।

এমনকী, প্রথম ভি-২ রকেট ছোঁড়ার সময়ে তাঁকে রকেটের কাছাকাছি যেতেও দেওয়া হয়নি। কেননা, ব্রাউনকে জানানো হয়নি যে, রকেটের মাথায় এক টন বিস্ফোরক পুরে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া রকেটটা কোথায় গিয়ে পড়বে তাও জার্মান সেনাবাহিনী ঠিক করে রেখেছিল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রকেটটা গিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডে। মুহূর্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। খবরটা শোনার পর ব্রাউন বুঝতে পারলেন, তাঁর এত পরিশ্রমের আবিষ্কারের পরিণতি কী হয়েছে! ক্ষোভে-দুঃখে তিনি এতই ভেঙে পড়লেন যে, গবেষণা তো দূরের কথা, খাওয়া ও ঘুমনো প্রায় ছেড়ে দিলেন। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কী করে সেখান থেকে পালানো যায়।

১৯৪৫ সালে জার্মান সেনাবাহিনী যখন পিছু হটতে লাগল, তখন পিনেমুন্ডে দ্বীপেও কড়াকড়ি শিথিল হয়ে পড়ল। এই সময় একদিন মাঝরাতে ব্রাউন রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে শুরু করলেন। আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে জার্মান সৈনিকরাই তখন এক-এক করে পালাচ্ছিল। সমুদ্রতীরে নেমেই তিনি ইচ্ছে করে ছুটতে লাগলেন সেইদিকে, যেদিক

থেকে আমেরিকান সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছিল। কারণ তিনি জানতেন মিত্রবাহিনী তাঁর পরিচয় পেলে তাঁকে বন্দী করলেও নির্যাতন করবে না। সত্যিই তাই হল। আমেরিকানরা যখন তাঁর পরিচয় পেল তখনই তাঁকে নিয়ে গেল তাদের রকেট-গবেষণা কেন্দ্রে। ব্রাউন তাদের বললেন, "আমি পালিয়ে এসেছি, জার্মানরা আমার সঙ্গে ছলনা করেছে বলে। আমি স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে চাই, যাতে রকেট চেপে মানুষ মহাকাশ-জয় করতে পারে। অবশ্য, এই স্বাধীনতার বদলে আমি আপনাদের কিছু দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে দিতে পারি।"

জার্মানির সমরাস্ত্র-কারখানায় তৈরি হচ্ছে 'ভি-২' রকেট

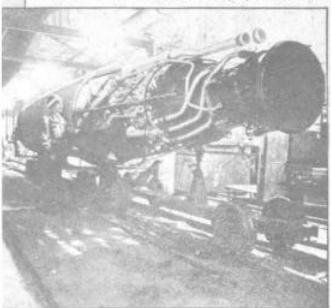

'থ্রি স্টেজ' রকেট

আমেরিকান সেনাবাহিনীর সঙ্গে আহত ব্রাউন

এ-কথা শুনে আমেরিকান সেনাবাহিনী উৎসাহিত হয়ে উঠল। বিশ্বযুদ্ধও শেষ হল। কিছুদিন পরে। কিন্তু মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা, প্রধানত রাশিয়ার সঙ্গে। কারণ, ইতিমধ্যে রাশিয়া বেশ কয়েকটি উন্নত রকেট তৈরি করে ফেলেছে। ব্রাউনের তত্ত্বাবধানে আমেরিকাও এগিয়ে চলল জোর কদমে।

কিন্তু ১৯৫৭ সালে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুটনিক-১' উৎক্ষেপণ করে ফেলল রাশিয়াই। ব্রাউনের মনে হল তিনি নিজে যেন হেরে যাচ্ছেন। তবু আমেরিকানরা বুঝেছিল ব্রাউনের দ্বারাই অনেক কিছু করা সম্ভব। তাই আমেরিকান সরকার তাঁকে টেকসাসের হাউসটন উৎক্ষেপণ - কেন্দ্রের ডিরেক্টর নির্বাচিত করল। তবু, ১৯৬১ সালে রাশিয়া এগিয়ে গেল আরও এক ধাপ। প্রথম মহাকাযাত্রী য়ুরি গ্যাগারিনকে মহাকাশে ঘুরিয়ে আনল রাশিয়া। কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রেই মহাকাশযান পৃথিবীর চারপাশেই ঘুরেছিল। পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল উপেক্ষা করার ক্ষমতা তখনও কোনও রকেটেরই ছিল না। তাই ব্রাউন চেষ্টা করতে লাগলেন রকেটের এই অক্ষমতা কী করে দূর করা যায়!

ব্রাউন লক্ষ করলেন যে, একটি বিশাল আকৃতির রকেটের পক্ষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটানো খুব মুশকিল। রকেটটিকে তিনভাগে ভাগ করলে সমাধান হতে পারে। লেজের দিকে প্রথম অংশটি রকেটকে আকাশের অনেক উঁচুতে তুলে দিয়ে আপনাআপনি খসে পড়বে। বাকি দুটো অংশও রকেটকে আরও এগিয়ে দিয়ে খসে পড়বে। ফলে রকেট যত ওপরে উঠবে, তত তার শরীরটা হালকা হয়ে যাবে। তাই পৃথিবীর অভিকর্ষ-বল কাটিয়ে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে। তিন ভাগে ভাগ করা আছে বলে এই রকেটের নাম 'থ্রি-স্টেজ রকেট'। ব্রাউন এর নাম দিলেন 'স্যাটারন-৫'।

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে চমকে উঠল সারা বিশ্বের মানুষ। চাঁদের বুকে পা ফেললেন নীল আর্মস্ট্রং। কিন্তু সেদিন তো বটেই, আজও ক'জনই বা জানেন যে, নিল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন আর মাইকেল কলিন্‌সকে নিরাপদে মহাকাশের নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে দিয়েছিল যে রকেটটি, সেটি সেই তিনধাপ-বিশিষ্ট 'স্যাটার্ন-৫', যার আপাদমস্তক তৈরি হয়েছিল ওয়ের্নহের ভন ব্রাউনের নির্দেশে। এর আট বছর পরে (১৯৭৭) তিনিও চলে গেলেন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে।

হাবিবই সেরা

সুধীর কর্মকার

বছরের হিসেবে দেড় দশকের ওপর কলকাতা ময়দানে খেলেছি। বহু ফরোয়ার্ডকে সামনাসামনি ট্যাক্‌ল করেছি। কখনও আমি জিতেছি, কখনও সেই ফরোয়ার্ড। কিন্তু ট্যাকলে কখনও ভয় পাইনি। 'আনন্দমেলা'য় আমাকে লেখার যে বিষয় দেওয়া হয়েছে সেই ট্যাক্‌লে বেশ ভয় পাচ্ছি। কারণ, আমি যে সময়ে খেলেছি সেটা কলকাতা ময়দানে সেরা ফরোয়ার্ডদের যুগ। আমার আগে বা পরে ভাল ফরোয়ার্ড আসেনি তা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় চুনী, পি-কে, বলরামের পর সত্তর দশকেই সেরা ফরোয়ার্ডদের দেখা গেছে। হাবিব, আকবর, শ্যাম, সুভাষ, সাবির আলি, সুরজিৎ, বিদেশ ও মানস তো আছেই, আর আছে ইন্দর সিং এবং আশির দশকে মজিদ বাসকার। অনেকের সঙ্গেই খেলেছি। এদের মধ্যে সেরা একজনকে বেছে নেওয়া? এর চেয়ে গোললাইনে ট্যাক্‌ল করা সোজা!

যে ক'জনের সঙ্গে বা বিপক্ষে খেলেছি, বলতে দ্বিধা নেই, তাদের মধ্যে আমাকে মুগ্ধ করেছে ইরানি মজিদ বাসকারের খেলা। এত উঁচু মানের কমপ্লিট ফুটবলার আমি আর দেখিনি। দারুণ বল কন্ট্রোল, পাসিং, রিসিভিং—সব দিক দিয়েই ও সেরা। মজিদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, হঠাৎ গতি বাড়ানো। ডিফেন্ডাররা কিছু বোঝার আগেই ও তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত। মজিদের ফুটবলবোধ এত প্রখর যে, সে যখন বুঝত এগিয়ে গেলে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা, তখনই সে হাফ-লাইনের পিছন থেকে খেলা পরিচালনা করত। জামশিদকে যে কী চমৎকার-চমৎকার সব পাস বাড়িয়েছে! মজিদকে ক্লোজ মার্কে না রাখলে যে কী বিপদ ঘটতে পারে তা দেখেছে মহমেডান, বোধ হয় ১৯৮১ সালে, রোভার্স ফাইনালে। আমি, মজিদ ইস্টবেঙ্গলে। মাঝমাঠ থেকে বল ধরে মজিদ এত দ্রুত ডজ করতে-করতে এগিয়েছে যে, কেউ কিছু বোঝবার আগেই দুরন্ত গোল করেছে সে। একেবারে চোখ জুড়নো গোল। আমার সৌভাগ্য, ফুলফর্মে মজিদের খেলা আমি দেখেছি মাঠে ওর পাশাপাশি খেলার সুবাদে। তাই আমি বলতে বাধ্য, এত ভাল ফরোয়ার্ড আমি অন্তত দেখিনি।

মজিদকে অবশ্য এই আলোচনার বাইরে রাখতে হবে। কারণ, ভারতীয়দের মধ্য থেকেই সেরা খেলোয়াড়টিকে বেছে নিতে হবে। সুভাষ ভৌমিকের খেলা আমার বরাবর ভাল লাগে। ওর বল-কন্ট্রোল খুব একটা উঁচুমানের ছিল না।

১৯৭৫ সালের সন্তোষ ট্রোফির ফাইনালে কর্ণাটকের সঙ্গে কী দারুণ খেলাটাই না খেলেছিল ও। আমি ছিলাম অধিনায়ক, হাবিব খেলেনি, তাই ভৌমিককে একটু তাতিয়ে দিয়েছিলাম। বোধ হয় দুটো গোল করেছিল। তার চেয়েও বড় কথা, বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের বল ছুঁতেই দেয়নি ভৌমিক!

সুযোগসন্ধানী ফরোয়ার্ডদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সেরা শ্যাম থাপা। শ্যামের উচ্চতা তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু গোলটা এত ভাল চিনত শ্যাম যে, পেনাল্টি বক্সে ও বল পেলেই বিপক্ষের ডিফেন্ডাররা আতঙ্কিত হত। শ্যামের আর একটা বৈশিষ্ট্য কুইক টার্নিং এবং ভলি মারার দক্ষতা। ওর বাইসাইকেল কিক তো বিখ্যাত। তবে ফরোয়ার্ড হিসেবে শ্যামের একটা ব্যাপার আমি দেখিনি। ও সাধারণত বল কেড়ে নিতে যেত না, পায়ে এলে তবেই আক্রমণে উঠত।

একই কথা সুরজিৎ সেনগুপ্ত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। স্কিলের দিক দিয়ে সুরজিতকে আমার সেরা মনে হয়েছে, কিন্তু ভীষণ ভিতু খেলোয়াড়। বিপক্ষ ডিফেন্ডাররা একটু জোরে ট্যাক্‌ল করলেই ও পিছিয়ে যেত। অবশ্য যে বলটা ও ঠিকমতো কন্ট্রোলে পেত, তখন তিন-চারজনকে টলিয়ে দেওয়া ওর কাছে কোনও ব্যাপারই হত না। সুরজিতের খেলা দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু কার্যকর খুব একটা ছিল না—এটা বলতেই হবে। তাই ফরোয়ার্ড হিসেবে ওকে আমি সেরা বলতে পারছি না।

সাবির আলির হেডিংটা খুব ভাল ছিল, কিন্তু খেলা তৈরির ব্যাপার একদমই ছিল না। আকবরের শুটিং ভাল, গোলটা আরও ভাল চিনত। বিদেশ দৌড়ে অনেককে পিছনে ফেলেছে, কিন্তু বুদ্ধিটা খুব একটা প্রয়োগ করত না। মানসের বুদ্ধি ছিল, কিন্তু ও ছিল ভিতু।

আর একজনের কথা বলব, সে ইন্দর সিং। ওর বিপক্ষে অনেক ম্যাচ খেলেছি। দারুণ বুদ্ধিমান খেলোয়াড়, টার্নিংটা সুন্দর। শটে প্রচণ্ড পাঞ্চ ছিল। আর খুব সুযোগসন্ধানী। ওর সঙ্গে একজনকে লাগিয়ে না রাখলে যে-কোনও মুহূর্তে গোল করে দিয়ে যেত।

আমার তালিকায় বাকি রইল একটি নাম—হাবিব। হাবিবের ছিল না সুভাষের মতো বডিওয়েট, সুরজিতের মতো স্কিল কিংবা শ্যামের মতো ভলি। কিন্তু যা ছিল, আমার মতে, একজন ফরোয়ার্ডের সেটাই সেরা গুণ। তীব্র লড়াই করার ইচ্ছা, নাছোড় মনোভাব, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস। হাবিবই একমাত্র ফরোয়ার্ড যে আক্ষরিক অর্থেই সত্তর মিনিটের খেলায় সত্তর মিনিটই খেলে যেত। হাবিব যে ম্যাচে খেলেছে, বিপক্ষের ডিফেন্ডাররা সে খেলায় এক মিনিটও স্বস্তি নিয়ে খেলতে পেরেছে বলে আমি মনে করি না। যে বল পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঁচিশভাগ, সেখানেও হাবিব ঝাঁপাত। এবং এইসব সম্ভাবনা থেকে কতবার যে মিঞাসাহেব গোল করে গেছে তার লেখাজোখা নেই। একবার ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গলের খেলা সিমলা ইয়ংস-এর সঙ্গে। খেলার মিনিট-পাঁচেক বাকি। আমরা হারছি এক গোলে। হারলে আমরা টুর্নামেন্টের বাইরে চলে যাব। স্বপন সেনগুপ্ত কর্নার-এর কাছ থেকে একটা বল সেন্টার করল, মাটি থেকে একটু উঁচুতে। গোলকিপার গ্রিপ করার পর কোল থেকে বলটা একটু বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ দেখলাম, অন্তত চার গজ দূর থেকে হাবিব একটা ফ্লাইং হেড দিল, প্রায় মাটির উচ্চতায় এবং গোলকিপার বল নিয়ে ঢুকে গেল গোলের মধ্যে। আমরা ভাবলাম হয়তো গোল হবে না, ফাউল হবে। কিন্তু রেফারি গোল দিলেন। হাবিব বলেই হেড করতে পেরেছে। ওই গোলে আমাদের মান বাঁচল। এই ধরনের কত গোল যে হাবিব করেছে, বলতে গেলে পুরো লেখাটাই হাবিব-কাহিনী হয়ে যাবে। সেটা না বলে, শুধু বলি, হাবিবই আমার মতে সেরা ফরোয়ার্ড, যেহেতু ওকে সেরা না বলে আমার উপায় নেই।

গৌতম সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কোনও কিছুই একটানা চলে না। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তা'ই হল। জয়ের পরের বছরই হার। ১৯৬৮ সালের জুনিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বাংলা দল কটকে পরের বছর হেরে গেল। এটা প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৮ সালেরই চ্যাম্পিয়ানশিপ। সেবারেও আমাদের দল খারাপ ছিল না। আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, আর ছিল কয়েকজন বেশ ভাল খেলোয়াড়, নামগুলো জানালেই বোঝা যাবে—দিলীপ পালিত, সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং তরুণ বসু।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জিতবই। কিন্তু আমার জীবনে এই প্রথম আমি দেখলাম—খেলার মাঠে চক্রান্ত এবং নোংরামি। এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকায় আমার নিজের ওপর আস্থা ছিল এবং বেশ কয়েকটা গোল করে 'হায়েস্ট স্কোয়ার'-ও হচ্ছিলাম। কিন্তু সেমিফাইনালে আমাদের জোর করে হারিয়ে দেওয়া হল ওড়িশার বিপক্ষে। আগের দিন রাত্রে আমাদের কী খাওয়ানো হল কে জানে, হয়ে গেল ফুড পয়জনিং, শুরু হল প্রত্যেকের অঝোর ধারায় বমি। খেলব কী, মাঠে দাঁড়াতেই পারি না! এর মধ্যেও আমরা লড়াই করছিলাম। কিন্তু অহেতুক ওড়িশার ছেলেরা আমাদের মারতে শুরু করল, দর্শকরা জঘন্য আচরণ করলেন। আমরা এক গোলে হেরে ফিরে এলাম।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আগের বছরে জয়ী হয়েও আমাদের এভাবে বিদায় নিতে হল? আরও বাজে লাগছিল বাংলার সম্মানের কথা ভেবে—বাংলার ফুটবলই যে ভারতবর্ষে সেরা, এটা জুনিয়ার হিসেবে প্রমাণের দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপরেও। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পারলাম না সেটা প্রমাণ করতে।

সে-বছরই ভূতনাথ বিশ্বাস আমাকে খিদিরপুর ক্লাবে নিয়ে গেলেন। খিদিরপুর ক্লাবের যাবতীয় দায়িত্ব ভূতনাথদাই পালন করতেন। ভূতনাথদা আমাকে আগেই খিদিরপুরে নিতে চেয়েছিলেন। আমি যাইনি, কেন যাইনি, তা আগেই জানিয়েছি। কিন্তু রেল ছাড়লামই যদি, তবে বড় ক্লাবে গেলাম না কেন, এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু আমার কাছে খুব সহজই ছিল। রেল ছাড়িনি, কারণ আমি শিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শুধু প্র্যাকটিস করে গেলে বা শিখে গেলেই তো হল না। তার যথার্থ প্রয়োগও দরকার। অর্থাৎ মাঠে নেমে নিজেকে যাচাই করতে হবে, খেলতে হবে বড় দলের বিরুদ্ধে। আমি সত্যিই বড় দলের উপযুক্ত কি না তা না দেখে আমি কখনওই বড় দলে যাব না—এটাই আমার স্পষ্ট নীতি ছিল। বড় দলে গিয়ে খালি প্র্যাকটিস করে আর প্রত্যেকদিন জার্সি পরে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকায় আমার প্রবল আপত্তি ছিল। বড় দলে এমনভাবে তৈরি হয়ে যাব, যাতে আমাকে বসতে না হয়। তাই আমি খিদিরপুরেই এলাম—আমি নিশ্চিত ছিলাম এখানে নিজের দক্ষতা দেখিয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচেই খেলতে পারব, পারব বড় দলের বিপক্ষে নিজের খেলা দেখাতে। রেলে সেই সুযোগ ছিল না।

এসবের ওপরও আর-একজনের আকর্ষণ ছিল। তিনি কোকোদা—অচ্যুত ব্যানার্জি নামে যিনি ময়দানে বেশি পরিচিত। শুনেছি, আমাকে খিদিরপুরে নেওয়ার ব্যাপারে কোকোদারও নাকি একটা বড় ভূমিকা ছিল। আমিও চেয়েছিলাম তাঁর কাছে ট্রেনিং নিতে। কোকোদা কত বড় কোচ, তার মূল্যায়ন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এটা দেখেছি, জুনিয়ারদের শেখানোর ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না। অতি সাধারণ ব্যাপার, যেমন, কী ভাবে দাঁড়াব, কীভাবে বল মারব, পায়ের কোন অংশটা দিয়ে সুইং ঠিকভাবে করা যায়—এত সহজভাবে বোঝাতেন যে, তখন খুব ভাল লাগত। মনে হত, মাঠে অতি সহজেই এইসব টেকনিক প্রয়োগ করতে পারব।

কোকোদার আর-একটা বড় গুণ ছিল—খেলোয়াড়দের প্রতি মমতা। কোনও খেলায় হয়তো আমরা খারাপ খেলেছি, সারা মাঠ ধিক্কার দিচ্ছে, খেলার শেষে কর্মকর্তারা গালাগালি দিলেন কিন্তু কোকোদা আমাদের একবারও কোনও বাজে কথা বলতেন না, উলটে তিনিই রুখে দাঁড়াতেন। বলতেন, "দোষ শুধু ওদের কেন, আমারও। আমিই ঠিকমতো শেখাতে পারিনি ওদের।"

পরে কোকোদা আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে দেখিয়ে দিতেন কোথায় ভুল হয়েছে, বোঝাতেন, কেন আমরা বাজে খেললাম। গালাগালি নয়, এই ধরনের 'বোঝানো' যে খেলোয়াড়দের কতটা প্রয়োজনে লাগে আমরাই বুঝতাম।

১৯৭১ সাল পর্যন্ত কোকোদাকে পেয়েছি খিদিরপুরে, এ ছাড়াও সন্তোষ ট্রোফির কোচ হিসেবেও তাঁকে দেখেছি—বলতে দ্বিধা নেই, ফুটবলারদের এত ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসতে অন্য কোনও কোচকে দেখিনি। আমার সৌভাগ্য, আমি তাঁর সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম।

তিন বছর—১৯৬৯, '৭০, '৭১ সালে চুটিয়ে খেললাম খিদিরপুরে। খেললাম বড় তিন দলের বিরুদ্ধেও। সত্তর সালে লিগে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ম্যাচটা আমার মনে আছে। ইস্টবেঙ্গল তখন দারুণ টিম। আমরা প্রায় রুখে দিয়েছিলাম এই দারুণ দলকেই। দুর্ভাগ্য আমাদের, শেষ পর্যন্ত এক গোলে হেরে গেলাম।

বাহাত্তর সালে অবশেষে আমার স্বপ্ন সফল হল। জানুয়ারি মাসের এক সকালে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন ইস্টবেঙ্গলের দুই কর্তা—জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত ও অজয় শ্রীমানী। আমার প্রিয় দল মোহনবাগান ডাকল না, কিন্তু অন্য বড় দল থেকে যখন ডাক পেলাম, আমি আর দ্বিধা করলাম না। বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে 'হ্যাঁ' বলে দিলাম।

প্রকৃতপক্ষে হ্যাঁ বললাম জোরের সঙ্গেই। কারণ, এখন আমি তৈরি। দু' বছর রেল দলে শুধুই শিক্ষা এবং তিন বছর খিদিরপুরে শিক্ষা এবং সঙ্গে-সঙ্গে খেলার মধ্য দিয়ে আমি মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম। শ্রীমানীদাকে শুধু বলেছিলাম, "আমি যেন খেলার সুযোগ পাই। সেই সুযোগ পাওয়ার

পর আমি যদি খেলতে না পারি, একটি কথাও বলব না।"

সেই সময়ের ইস্টবেঙ্গল একেবারে দুর্ধর্ষ দল। মাথার ওপরে কোচ পি· কে· ব্যানার্জি, আর মাথার নীচে ? অধিনায়ক সুধীর, শান্ত মিত্র, অশোক ব্যানার্জি, মোহন সিং, পিন্টু চৌধুরী, হাবিব, আকবর, স্বপন সেনগুপ্ত। মোহন-পিন্টু দারুণ জুড়ি, দু'জনেই প্রতিষ্ঠিত। আর খেলছেও খুব ভাল। আমি কিন্তু ভয় পেলাম না। কারণ, পিন্টুর সঙ্গে, আগেই বলেছি, জুনিয়ার ন্যাশনালে একসঙ্গে খেলেছি, ওর খেলা দেখেছি, আর মোহন

কোকোদা : অচ্যুত ব্যানার্জি

যখন এরিয়ানে, তখন ওর বিপক্ষেও আমি খেলেছি। আমি ভাবলাম, ওরা যদি আজ বড় দলে খেলতে পারে, আমি কেন পারব না ? আমি তো ওদের সঙ্গে বা বিপক্ষে খারাপ খেলিনি। অবশ্য একটা কথা, সুযোগ চাই···।

এই সুযোগে অন্য একটা কথা বলে নিই। ইস্টবেঙ্গলে সই করে আমি বোধ হয় চার হাজার টাকা পেয়েছিলাম। টাকাটা মায়ের হাতে দিতে পেরে খুব আনন্দ হয়েছিল। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে এই টাকাটা যদি বাবা-মায়ের কোনও সাহায্যে আসে, এই ভেবেই আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। বাবা-মা তো চিরকাল আমার জন্য করেই গেলেন, এক-ভগ্নাংশও যদি আমি করতে পারি, তাতে আনন্দিত হওয়া কি অন্যায় ?

যাই হোক, যা বলছিলাম, ইস্টবেঙ্গলে সুযোগের কথা। সুযোগ পেলাম। লিগের প্রথম ম্যাচে নয়, দ্বিতীয়টিতে কুমারটুলির বিপক্ষে। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, কিছুটা আকস্মিকভাবেই চলে এল সুযোগটা। যথারীতি মোহন সিং-এর খেলার কথা, কিন্তু সেদিন কোনও কারণে মাঠে আসতে ওর দেরি হয়ে যায়। এদিকে খেলার সময় এগিয়ে আসছে। প্রদীপদা আমাকে এসে বললেন, "হারি আপ গৌতম, ড্রেস করো। তুমিই আজ খেলবে।"

আমি ? কিছু ভাবার আগেই মাঠে নামলাম। আমার প্রথম ম্যাচ, বড় ক্লাবে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের গর্জন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার সারা শরীর। আমার প্রস্তুতির দিন শেষ, আজ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ফেল মানে আর দ্বিতীয়বার এই মাঠে নামার সুযোগ না পাওয়া।

এরই মাঝে সুধীর আমাকে এসে অভয় দিয়ে গেল। বলল, "ঘাবড়াস না, নিজের খেলা খেল। আমরা পিছনে আছি।"

এই কারণেই সুধীরকে আমি আমার বন্ধু বলে মনে করি। সুধীর কর্মকার শুধু তখন ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়কই নয়, ইতিমধ্যেই ও প্রতিষ্ঠিত। স্টারই বলা যায়। কী খেলা খেলেছে ইরানের প্যাস ক্লাবের বিরুদ্ধে ! কিন্তু আমার সঙ্গে রয়েছে সেই সুধীরই—জুনিয়ার ন্যাশনাল খেলতে গিয়ে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সুধীরের এই অভয়, বন্ধুত্ববোধ পরে অনেক ঘটনায় দেখেছি। কম দিন তো আমরা একসঙ্গে খেলিনি !

ম্যাচটা খেললাম। কেমন খেললাম আমার বলা উচিত নয়, তবে হাফ টাইমে আমাকে বসানোয় দর্শকরা প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি করেছিলেন, এটা মনে আছে। প্রদীপদার অবশ্য করার কিছু ছিল না, কারণ মোহন ইতিমধ্যে মাঠে চলে আসে। প্রি-ওলিম্পিকে খেলেছে যে-মোহন, তাকে বসিয়ে আনকোরা আমাকে পুরো খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি।

এর পরে কয়েকটা ম্যাচে বসে এবং খেলে কাটালাম। এল মরসুমের প্রথম বড় ম্যাচ—মহমেডানের সঙ্গে। ১৭ জুন খেলা। মনে মনে জানি, পিন্টু-মোহন জুড়িই মাঝমাঠে খেলবে। তবু মনে ক্ষীণ আশা, যদি সুযোগ পেয়ে যাই ! ক্লাবে এসে টেন্টে প্লেয়ার লিস্ট দেখলাম না, জানি, নাম নেই। বসে আছি, হঠাৎই শ্রীমানীদা এসে খবর দিলেন, "গৌতম, আজ তুমি খেলছ।" সুধীরও বলল, "তৈরি হ, তুই আজ খেলবি।" আমি অবাক, কোথায় খেলব ? টিম মিটিং-এ নাকি ঠিক হয়েছে হাফে আমি আর মোহন খেলব। পিন্টু খেলবে লেফ্ট আউটে। পিন্টুর একটু আপত্তি ছিল, শেষ পর্যন্ত ও রাজি হয়েছে। পরে এসব জেনেছি; আর জানলাম, আমাকে নিতে সুধীরই নাকি অধিনায়ক হিসেবে পরামর্শ দিয়েছে। প্রদীপদা তা মেনে নিয়েছেন।

প্রথম বছর বড় ক্লাবে এসেই প্রথম বড় ম্যাচ খেলতে নামলাম। প্রথম ট্যাক্লেই ছিটকে দিলাম তখনকার সেরা ফরোয়ার্ডদের একজন, সর্দার খাঁকে। কাজলদার কথা মনে এল, "প্রথম ট্যাক্লে জিতবি, তা হলেই ভাল খেলবি।" তাই হল, মনে আলাদা বল এল—ভুলে গেলাম এটা আমার প্রথম বড় ম্যাচ। তেত্রিশ মিনিটের মাথায় মাঝমাঠে পিন্টু একটা চমৎকার বল বাড়াল আমাকে।

সুধীর কর্মকারের সঙ্গে আমি

সামনে মহমেডানের ব্যাক বিজয় দিকপতি। ওকে কাটিয়ে ত্রিশ গজ দূর থেকে একটা শট নিলাম গোল লক্ষ্য করে—শটে খুব জোর ছিল না, কিন্তু ওদের গোলকিপার ননী পাল বলটা ধরতে পারল না এবং মাঠ কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল, গো-ও-ল। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পিন্টু, মোহন, হাবিব এবং আদরে আদরে অস্থির করে দিল সুধীর। দ্বিতীয়ার্ধে আর-একটা গোল করল আকবর।

কেমন খেললাম আমি ? পরের দিনের আনন্দবাজারের কাটিংটা এখনও আমার কাছে আছে। তার হেডিংটা শুধু তুলে দিচ্ছি : মোহন ও গৌতম মধ্যমাঠে মহমেডানকে চূর্ণ করেছে।

খেলার শেষে সুধীর এত খুশি হল যে, আমাকে ধরে নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রিটের ওয়ালড্রফ রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে। গাড়ি করে পৌঁছে দিল আমার বাড়িতে। গাড়ি করে না পৌঁছে দিলেও অবশ্য আমি ঠিকই বাড়ি পৌঁছতাম—আনন্দে, ভাসতে ভাসতে।

(ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

মজার খেলা সেপক টাক্‌রো

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক বছর আগের ফুটবলার অপু ঠাকুর এখন সেপক টাক্‌রো খেলেন। কলকাতার ক্ষুদিরাম প্র্যাকটিস হলে চার নম্বর ন্যাশনাল চলার সময় মজা করে বলছিলেন, "প্রথম ন্যাশনালে চ্যাম্পিয়ান হয়েছি, পরেরবার রানার্স, গতবার থার্ড, এবার বোধ হয় ফোর্থ হব।" অপুর কথা মেলেনি। বাংলা এবার থার্ড হয়েছে।

সেপক টাক্‌রো ন্যাশনাল এবার কলকাতায় হয়েছে বলে পত্র-পত্রিকায় খেলাটি নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। প্রতিযোগিতার আগেও সাংবাদিকরা ক্যাম্পে গেছেন। কিন্তু খেলাটি যে বাংলায় এই প্রথম নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ অপুর কথাই। সেপক টাক্‌রো ন্যাশনালের বয়স চার।

বাংলায় আগের তিন বছর সেপক টাক্‌রো বলতে বোঝাত, জাতীয় প্রতিযোগিতার আগে কোনওরকমে একটা দল গড়া। কিন্তু এ-বছর প্রতিযোগিতা কলকাতায় হওয়ায় রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপও হয়েছে একই জায়গায়। সেই সুবাদে বাংলায় বেশ কিছু ক্লাব ও জেলাদলও তৈরি হয়ে গেল। প্রসঙ্গত বলি, মেয়েদের ন্যাশনাল এই প্রথম হতে যাচ্ছিল। কিন্তু দল তেমন না আসায় তা আর শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। তার বদলে অনুষ্ঠিত হল কিছু প্রদর্শনী খেলা। বাংলা উদ্যোক্তা রাজ্য বলে তিনটি দল নামাতে পেরেছিল। তারই একটি আর একটিকে হারিয়ে সেরা দলের সম্মান পেল।

বাংলার মেয়ে সেপক টাক্‌রো খেলোয়াড়রা অনেকেই ফুটবলার। যেমন, অনিতা সরকার, শুক্লা নাগ, চৈতালী কর, ঝুমা বসু, শুক্লা দত্ত, সুষমা দাস, দীপালি দাস, চম্পা চ্যাটার্জি, শান্তি মল্লিক, সোনালি বৈদ্য, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, ও পুষ্পা দাস। অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু এটা হয় না।

এবারের সেপক টাক্‌রো জাতীয় প্রতিযোগিতার আসরে — *ফোটো : সন্তোষ ঘোষ*

মেয়েদের মতো পুরুষদের বিভাগেও এই খেলায় এসেছেন ফুটবলাররা। অপু তো আছেনই। আর আছেন বিমান লাহিড়ী, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি, আবীর বসু, সঞ্জয় বসু, সন্দীপ বসু, ভবানী রায়, প্রশান্ত সরখেল, সন্তোষ বসু এবং আরও কেউ কেউ। এঁদের মধ্যে একমাত্র অপু, যিনি চারটি ন্যাশনাল ও দু'টি এশিয়ান প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, ১৯৮৬-র এশিয়ানে তিনি তো ছিলেন দেশের নেতা।

কিন্তু যে খেলাটি নিয়ে এত কথা, সেই খেলাটির বিষয়ে আগে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

খেলাটির জন্মস্থান মালয়েশিয়া। ওখানে 'সেপক' কথাটার মানে 'আঘাত', আর 'টাক্‌রো' কথাটার অর্থ 'বল'। জন লিয়েডেন-এর একটি লেখা থেকে এর ইতিহাস জানা যায়।

প্রায় ৪০০ বছর আগের কথা। মালাক্কার রাজা বেতের বল পায়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নাচাতে পারতেন। তা দেখতে ও শিখতে বেশ ভিড় হত। বিরাট হলঘরের মাথায় বলটি পাঠিয়ে চুম্বকের মতো তা পায়ে টেনে এনে আবার নাচাতে শুরু করতেন তিনি। রাজার পা থেকে তা পাওয়ার জন্য উলটো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে হতাশ হয়ে অপেক্ষাই করতে হত না, দুপুরের খাওয়া শেষ করে এসেও তিনি দেখতেন রাজা তখনও বলটি অবলীলাক্রমে নাচাচ্ছেন।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। শখের খেলাই হয়ে উঠেছে নিয়মকানুনের খেলা। তিনজনে মিলে একটা দল হয়। পা অথবা মাথায় ঠেকিয়ে বল নেটের ওপারে প্রতিপক্ষের কোর্টে পাঠানোই খেলোয়াড়দের কাজ। ১৫ পয়েন্টের খেলা। ব্যাডমিন্টন যেমন তিন গেমের খেলা, সেপক টাক্‌রোও তাই। ব্যাডমিন্টনের কোর্ট এবং নেটের সঙ্গে এর মিল শুধু অনেক নয়, বরং বলা যায়, পুরোপুরি এক। ৪৪ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া কোর্ট। পাঁচ ফুট লম্বা নেট, নেট বাঁধার খুঁটি পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। শুধু ব্যাডমিন্টন নয়, ফুটবল ও ভলিবলের সঙ্গেও মিল আছে এই খেলার।

এ-দেশে খেলাটি আসে ১৯৮২-র এশিয়াডের পর। সেবার এশিয়াডে খেলাটিকে প্রদর্শনী হিসাবে রাখা হয়। তারপর মহারাষ্ট্র সংস্থা নাগপুরে খেলিয়ে দিল মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ডকে। ভারতও গেল মালয়েশিয়া। '৮৬তে সোল এশিয়াডের প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে এই খেলা অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। কিন্তু তা হল না। ১৯৯০-এর এশিয়াডে সেপক টাক্‌রো 'ডিসিপ্লিন' হয়েই আসছে।

ওলিম্পিকে এখনও না এলেও এসে যাবে। গত বছর থেকে শুরু হয়ে গেছে বিশ্ব প্রতিযোগিতা।

'হিরো' একজনই মার্ক টেলর

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

"নিঃসন্দেহে, এটাই আমার জীবনের সেরা সময়।" কথাটা টেলরের। মার্ক অ্যান্টনি টেলর। নিউ সাউথ ওয়েলসের ২৪ বছর বয়সী ওপেনিং ব্যাটসম্যান। ৫৪ বছর পর ইংল্যান্ডের মাটিতে 'অ্যাশেজ' জয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের আবিষ্কার নিশ্চয় তিনিই। ছয় টেস্টের সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৪-০ ম্যাচে হারিয়ে সারা অস্ট্রেলিয়া আনন্দে ফেটে পড়েছে। দেশের প্রতিটি প্রভাতী সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন এখন মুখর শুধু একটি কথাতেই, 'অসম্ভব লক্ষ্য সম্ভব হয়েছে। জয় আমাদের, জয় টেলরের।'

অবশ্যই! বর্ডারের দলে এই সফরে ভাল খেলেছেন অনেকেই। জোড়া সেঞ্চুরি করে ব্যাটিংয়ে বিরাট সাফল্য পেয়েছেন স্টিভ ও (গড় ১২৬·৫০)। ডিন জোন্স, ডেভিড বুন ও জিওফ মার্শ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। বর্ডার খেলেছেন ছ'টি অর্ধশতরানের ইনিংস। এঁদের সবার ব্যাটিং গড় পঞ্চাশের উপর। বল হাতে টেরি অল্ডারম্যান ও জিওফ লসন দু'জনে মিলেই নিয়েছেন ৭০টি উইকেট। তা হলেও 'হিরো' কিন্তু একজনই—মার্ক টেলর।

ব্যাট হাতে টেলর সব অর্থেই ভরাডুবি ঘটিয়েছেন ইংল্যান্ডের। ঝড়ের দাপটে যা হয়। যখন যেরকমভাবে ইচ্ছে হয়েছে ইংরেজ বোলারদের নাকানিচোবানি খাইয়েছেন তিনি। ১১টি টেস্ট ইনিংসে টেলরের রান যথাক্রমে ১৩৬, ৬০, ৬২, ২৭, ৪৩, ৫১, ৮৫, ৩৭ নট আউট, ২১৯, ৭১ ও ৪৮। মোট ৮৩৯ রান। অ্যাশেজ সিরিজে এর চেয়ে বেশি রান করেছেন শুধু ডন ব্র্যাডমান ও ওয়ালি হ্যামন্ড। টেলরের রানগুলি শুধুই ঝড়ে আসেনি, এসেছে দক্ষতার সঙ্গে ব্যাটিংয়ের যাবতীয় 'স্কিল' ও 'টেকনিক'-এর চমৎকার প্রয়োগ ঘটিয়ে। নিশ্চিত নির্ভরতার সঙ্গে ব্যাট হাতে টেলর এমন কর্তৃত্ব করেছেন (গড় ৮৩·৯০) যে, তাঁকে দেখে প্রবীণ দর্শকদের তিরিশ ও চল্লিশ দশকের 'গ্রেট' ব্যাটসম্যানদের কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

বাঁ হাতি টেলরের ব্যাটিং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তিনি দীর্ঘ সময় ক্রিজ আঁকড়ে থাকতে ভালবাসেন। স্ট্রোকে খুব একটা সৌন্দর্য না থাকলেও সবসময় বলের লাইনে এসে খেলেন। এক কথায় টেলর একজন নিশ্ছিদ্র ব্যাটসম্যান। তাঁর টেস্ট-অভিষেক এ-বছরের গোড়ায়, দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। সিডনিতে চতুর্থ টেস্টের দু' ইনিংসে তিনি করেছিলেন ২৫ ও ৩ রান। অ্যাডিলেডে পঞ্চম ও শেষ টেস্টে টেলরের সংগ্রহ ৩ ও ৩৬। দু' ইনিংসেই তাঁকে রান আউট করেন ভিভ রিচার্ডস। এর পর লিড্‌স-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই দুর্দান্ত সেঞ্চুরি (১৩৬) হাঁকিয়ে টেলর অস্ট্রেলিয়া টিমে নিজের জায়গা পাকা করে নেন।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ডান ও বাঁ-হাতি কম্বিনেশনের ওপেনিং ব্যাটসম্যান জুড়ির সার্থক উত্তরাধিকারী হলেন জিওফ মার্শ ও মার্ক টেলর। ববি সিম্পসন-বিল লরির পর সত্তর দশকে কিথ স্ট্যাকপোলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের সূচনা করতেন বাঁ হাতি ইয়ান রেডপাথ অথবা রস এড্‌ওয়ার্ডস। মাঝে কিছুদিন গ্রেম উড ও গ্রাহাম ইয়ালপ জুটির পর এখন অস্ট্রেলিয়া দলে জাঁকিয়ে বসেছেন মার্শ-টেলরের মনোরম ওপেনিং জুড়ি। ট্রেন্ট ব্রিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে টেলর ও মার্শ প্রথম উইকেটে ৩২৯ রান যোগ করার পথে একাধিক রেকর্ড ভাঙেন। অ্যাশেজ সিরিজের ২৬৮টি টেস্টের মধ্যে এটাই প্রথম উইকেটের সর্বোচ্চ রান। শুধু তাই নয়, টেস্ট ক্রিকেটের ১১২ বছরের ইতিহাসে টেলর-মার্শ জুটির এই বিশাল রান পঞ্চম সর্বোচ্চ ওপেনিং পার্টনারশিপ। মজার ব্যাপার হল, ইংল্যান্ডের মাটিতে এ-পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৩৩০টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে এই প্রথম কোনও জুড়ি পুরো একটি দিন আউট না হয়ে ব্যাট করলেন। পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিনের পুরো ছ' ঘন্টা অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাট করে টেলর ও মার্শ প্রথম উইকেটে ৩০১ রান করেছিলেন।

সোতো চলেছেন আকাশ ছুঁতে

শ্যামল দত্ত

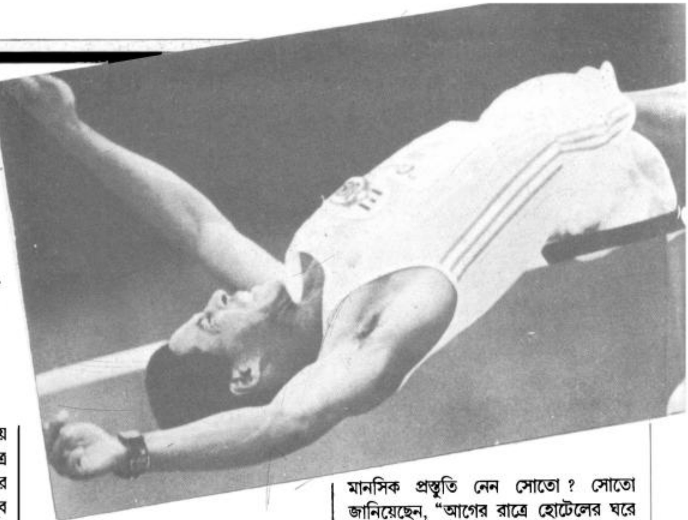

হাই-জাম্পের কথা শুনলে সেই সময় চটে উঠত ছেলেটি। বয়স তখন মাত্র দশ। খেলাধুলো, বিশেষ করে অ্যাথলেটিক্সের দিকে তার ঝোঁক থাকলেও হাই-জাম্প খুব একটা পছন্দ করত না। কিন্তু তার কোচ বুঝেছিলেন, হাই-জাম্পেই জগৎজোড়া নাম পাবে ছেলেটি। শুধু নামও নয়, এমন উঁচুতে সে উঠবে, যেখানে তার নাগাল পাওয়াই হবে শক্ত।

জেভিয়ার সোতোমেয়োর সম্প্রতি এমন উচ্চতায় উঠেছেন, লাফ দিয়ে যেখানে পৌঁছনো এতদিন সত্যিই ছিল কল্পনা। দশ বছরের বালক আজ একুশ বছরের যুবক এবং এই কিউবান কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছেন হাই-জাম্পে আট ফুটের বাধা অতিক্রম করে। ফুটবলের গোলপোস্টের উচ্চতারও বেশি এটা। নিজেরই গড়া ৭ ফুট ১১ ইঞ্চি বা ২·৪২ মিটারের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন তিনি ক্যারিবিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে, পুয়েরতো রিকোর সান জুয়ানে। লাফালেন ২·৪৪ মিটার। বলাবাহুল্য, হাই-জাম্পে শুধু আউটডোর রেকর্ডই নয়, ইন্ডোর বিশ্বরেকর্ডটিও সোতোমেয়োরের দখলে। সেটি ২·৪২ মিটারের।

৬ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা, ১৬৮ পাউন্ড ওজনের সোতোমেয়োর বিশ্বরেকর্ড করার পর শিশুর মতো উচ্ছ্বাসে বলেছেন, "এরকম একটা কাণ্ড ঘটাবার পর আমি আমার মনের আবেগ কীভাবে প্রকাশ করব, তাই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি, এটা বলতে পারি।"

যদিও অবিশ্বাস্য লাফ এবারের ক্যারিবিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে দিলেন সোতোমেয়োর, কিন্তু রেকর্ড ভাঙা-গড়াটা তাঁর কাছে নতুন কিছু ঘটনা নয়। তিন বছর আগে, যখন তাঁর বয়স আঠারো, তিনি বিশ্ব জুনিয়ার রেকর্ড গড়েন ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি লাফ দিয়ে। এর আগে বারো বছর বয়সেই অতিক্রম করেন ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং পনেরো বছরে ৭ ফুট ১ ইঞ্চির বাধা।

সোতোমেয়োর যদিও সোল ওলিম্পিকে নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাননি, তবু তার জন্য তিনি দুঃখিত নন। তিনি বলেন, "আমরা সবাই মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সোলে যাওয়া ঠিক নয়। দুই কোরিয়ারই ওখানে অংশগ্রহণের অধিকার থাকা উচিত ছিল। আমি ওখানে যেতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু লজ্জার ব্যাপার এটাই যে, হাজার হাজার উত্তর কোরীয় সেখানে যাওয়ার সুযোগ পাননি।" বোঝাই যাচ্ছে, নীতির ব্যাপারে সোতোমেয়োর দল এবং দেশকে নিজের স্বার্থের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দেন।

তিন বছর আগে জুনিয়ার বিশ্বরেকর্ড করার পর, গত বছর স্পেনের সালামানকায় যখন সোতো সুইডেনের প্যাট্রিক সোবার্গের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ৭ ফুট ১১ ইঞ্চি লাফালেন, তখনই তিনি 'জাতীয় নায়ক' হয়ে যান। কিউবার রাজধানী হাভানা থেকে ৯০ মিনিট দূরের তাঁর নিজের শহর লিমোনোরে তাঁকে দেওয়া হয় একটি সুন্দর বাড়ি। সেখানকার লোকেরা তাঁকে নিয়ে এত গর্বিত যে, যেদিন বড় ধরনের কোনও সাফল্য পান সোতো, সেদিন শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, স্কুলের ছাত্ররা রাস্তায় এসে আনন্দ করতে থাকে। সোতো পড়াশোনা করেন হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফিজিকাল এডুকেশনে ডিগ্রি নিচ্ছেন তিনি।

বড় প্রতিযোগিতার আগে কীভাবে মানসিক প্রস্তুতি নেন সোতো? সোতো জানিয়েছেন, "আগের রাত্রে হোটেলের ঘরে শুয়ে হাই-জাম্প ছাড়া আর সবকিছু নিয়েই চিন্তা করি আমি।"

যে-গতিতে সোতো দৌড় শুরু করেন, সেটাই তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। তিনটি আউটডোর এবং সাতটি আউটডোর হাই-জাম্পের বিশ্বরেকর্ডকারী প্রাক্তন আমেরিকান হাই-জাম্পার উইট স্টোন্‌স-এর মতে, "বারের দিকে এত দ্রুত ছুটে আসতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

অনেকে মনে করেন, সোতোর একটা দুর্বলতা আছে। বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেরকম সাফল্য তিনি পাননি। এখন পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটি আউটডোর রেকর্ডই ছোট ছোট প্রতিযোগিতায় অখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে করা। একমাত্র ১৯৮৭-তে রোমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি নবম হন। স্টোন্‌সের অভিমত, "যতদিন না নামী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে সে বিশ্বরেকর্ড করছে, ততদিন তাকে কেউ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বলে মানবে না।"

সোতোমেয়োর এই যুক্তি মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, "আমি বুদাপেস্টে বিশ্ব ইন্ডোর চ্যাম্পিয়ানশিপে জিতেছি অনেক নামী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেই। তার চেয়েও বড় কথা, আমি নিজেকে আরও উন্নত করতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি, বিশ্ব-সেরা হতেই হবে এ-কথা কে বলেছে?"

সেই লক্ষ্যই এখন সোতোমেয়োরের সামনে, নিজের রেকর্ডকে আরও উড়ন্ত করা। সোতো জানিয়েছেন, তাঁর আগামী স্বপ্ন ২·৫০ মিটার বা ৮ ফুট ২ ইঞ্চি লাফানো। অর্থাৎ, আকাশ প্রায় ছুঁতে চলেছেন জেভিয়ার সোতোমেয়োর। আকাশই তাঁর সীমা।

লেন্ডলের কথা

চেকস্লোভাকিয়ার একটি শহর অস্ত্রাভা। আঠারো বছর আগের ঘটনা। এক শীর্ণকায় বালক রোজ টেনিস-কোর্টের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। সে ছিল বল-বয়। সে তার আদর্শ খেলোয়াড় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার বল কুড়িয়ে এনে দিত। সেই বল-বয় বর্তমানে পৃথিবীর এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ইভান লেন্ডল। এখন আয় কোটি-কোটি টাকা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে লেন্ডল

এরকম আরও অনেক কথা জানিয়েছেন। শরীর সম্বন্ধে দারুণ সচেতন তিনি। জানিয়েছেন, "সময়টা যদি পিছিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে এখন আর মা-বাবার কথায় হাসতাম না। তাঁরা আমাকে দিনে কুড়ি গ্লাস করে কোকা-কোলা খেতে বারণ করেছিলেন। বাবার কথায় আমি হাসতাম। আসলে তরুণ বয়সটাই এমন যে, তখন মনে হয় আমি যা বুঝি সেটাই ঠিক।"

বদলে গেল...

গোলকিপার প্রয়োজনে ফরোয়ার্ডে এসে খেলেছেন, ফিল্ডার হয়েছেন উইকেটকিপার— এসব ঘটনার কথা আমরা জানি। কিন্তু রেফারি খেলার মাঝখানে হয়ে গেলেন লাইন্সম্যান— না, সত্যিই জানতাম না এ-ঘটনা। তাই হল, মোহনবাগান ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষে এক প্রীতি-ফুটবল-ম্যাচে। প্রখ্যাত রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি প্রথমার্ধে ছিলেন খেলার পরিচালক, দ্বিতীয়ার্ধে হলেন লাইন্সম্যান। আর লাইন্সম্যান তারক সেন হলেন রেফারি। প্রীতি-ম্যাচ বলেই বোধহয় এইভাবে বদলে গেল পদটা!

ক্রিকেটেও

ওয়েস্ট ইন্ডিজের আম্পায়ার অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন সেখানকার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ক্লাইভ ওয়ালকট। কথায় কথায় ওয়ালকট জানালেন, "ভাবতে খুব খারাপ লাগছে, এমন দিন আসছে যখন ক্রিকেটের আম্পায়ারদেরও উচ্ছৃঙ্খল ক্রিকেটারদের জন্য প্রথমে হলুদ এবং পরে লাল কার্ড হাতে নিতে হবে।" সত্যিই যদি তা হয়, 'ভদ্রলোকের খেলা'-র পক্ষে তা হলে সেটা হবে খুবই দুঃখজনক ঘটনা নিঃসন্দেহে।

ক্লান্ত বিলোজারচেভ

মাত্র বাইশ বছর বয়সেই প্রতিযোগিতামূলক জিমনাস্টিক্স থেকে সরে দাঁড়ালেন দু'বারের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ডিমিত্রি বিলোজারচেভ। কারণ হিসেবে

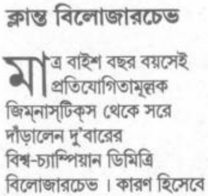

এই রুশ যুবক জানিয়েছেন, "যদিও আমার বয়স কম, কিন্তু আমি জিমনাস্টিক্স করছি গত পনেরো বছর। এতে আমি ক্লান্ত বোধ করছি। আর আমি যে বারবার আহত হচ্ছি তার একটা কারণ এটাও।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আহত হওয়ার জন্যই সোলে ওলিম্পিকে তেমন কিছু করতে পারেননি বিলোজারচেভ। অবশ্য জিমনাস্টিক্স থেকে একেবারে সরে যাচ্ছেন না তিনি, কোচ হিসেবে জুনিয়ারদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজ শুরু করছেন শীঘ্রই।

অন্য লড়াই

তিন দশকেরও বেশি জাপানের অন্যতম সেরা কুস্তিগির হিসেবে পরিচিত আন্তোনিয়ো ইনোকি সম্প্রতি অন্য এক লড়াইতেও জয়ী হলেন। ইনোকিকে অনেকের

মনে থাকতে পারে। কারণ, একদা তিনিই বক্সার মহম্মদ আলির সঙ্গে এক অভূতপূর্ব লড়াইয়ে নেমেছিলেন। এবারের লড়াই অবশ্য অন্য ধরনের—জাপানের পার্লামেন্ট ডায়েট-এর তিনি সদস্য নির্বাচিত হলেন। কোনও খেলোয়াড়ের জাপানি পার্লামেন্টে যাওয়া এই প্রথম। ছেচল্লিশ বছরের ইনোকি জানিয়েছেন, "এতদিন আমার কুস্তি দেখে জনগণ মুগ্ধ হয়েছেন, এবার পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে আমি আমার কাজ দিয়ে তাঁদের মুগ্ধ করব।"

কৃতজ্ঞ আসিফ

কিছুদিন আগে কলকাতা ঘুরে গেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক আসিফ ইকবাল। বিশ্বে যে ক'জন ক্রিকেটার তাঁদের সৌজন্যবোধ ও ভদ্রতার জন্য খ্যাত, আসিফ তাঁদের অন্যতম। কলকাতার দর্শকরা সহজে আসিফ ইকবালকে ভুলবেন না, কারণ এই ইডেন উদ্যানেই তিনি তাঁর শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। সারা ইডেনের দর্শক সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ আসিফ সে-কথা এখনও ভোলেননি। কথায় কথায় মজা করে জানিয়ে গেলেন, "সেদিন যেভাবে অভিনন্দন পেলাম, তারপর কি আর টেস্টে ফেরার চিন্তা স্বপ্নেও করা সম্ভব?" তবে লাহোরের দর্শকরা খুব ক্ষুব্ধ। তাঁদের কথা, বিদায়-অভিনন্দন দেওয়ার অধিকার কি একমাত্র কলকাতার?"

স্বপ্ন সত্যি হল

সোল ওলিম্পিকে ব্যর্থতার পর তিনি ফুরিয়ে গেছেন এরকম ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সব আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করলেন সৈদ আউইতা, মাঝারি পাল্লার দৌড়ে যিনি এখন বিশ্বের সেরা দৌড়বীর কোলন-এ তিনি ভেঙে দিলেন ১১ বছর আগে করা হেনরি রোনোর তিন হাজার মিটার দৌড়ের বিশ্বরেকর্ড। এই একটি মাত্র ট্র্যাক-রেকর্ডই এতদিন অটুট ছিল। আউইতা সময় নিলেন ৭ মিনিট ২৯·৪৫ সেকেন্ড। আউইতা বলেছেন, "বহুদিন ধরে এই রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করছি। কাছাকাছি এসেও পারছিলাম না। ২৯ বছর বয়সে আর পারব না ভেবেছিলাম। কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হল।"

দর্শক

শরীরের মধ্যভাগে ও নিম্নভাগে ঘুসি মারার কৌশল

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুসি মারার কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি গত সংখ্যায় । অনেকরকমভাবে ঘুসি মারা যায় । এক-একটির নাম ও প্রতিপক্ষের শরীরের বিভিন্ন অংশে ঘুসি মারার কৌশল আলাদা । গত সংখ্যায় প্রতিপক্ষের মুখে (থুতনিতে) সোজাসুজি কীভাবে ঘুসি মারতে হয় আলোচনা করেছি । একে-একে ঘুসি মারার কৌশলগুলো আলোচনা করব । যাঁরা অনুশীলন করবেন তাঁদের খুব ভালভাবে আস্তে-আস্তে অনুশীলন করা উচিত এবং কোনও সময় মজা করে বা খেলার ছলে ক্যারাটের কৌশল অন্য কারও সঙ্গে অনুশীলন করা উচিত নয় । তাতে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে ।

শরীরের মধ্যভাগে ঘুসি মারার কৌশল : শরীরের মধ্যভাগ বলতে আমরা ধরি গলার নীচে থেকে পেটের মাঝামাঝি অংশ পর্যন্ত । এই অংশের যে কোনও জায়গায় ঘুষি মারা যায়, কিন্তু সবসময় সোলার প্ল্যাক্সস্ লক্ষ্য করে অনুশীলন করা উচিত । ক্যারাটেতে সব সময় লক্ষ্য থাকা উচিত যে শরীরের দুর্বল স্থানে আঘাত করতে পারলেই প্রতিপক্ষকে অতি সহজে কাবু করে ফেলা যায় । সোলার প্ল্যাক্সস্ একটা দুর্বল স্থান, তাই ঘুসি সব সময় ওই জায়গা লক্ষ্য করে মারা উচিত ।
গত সংখ্যায় যেভাবে দাঁড়ানোর কথা বলেছি, সেইভাবে দাঁড়াতে হবে, তারপর দুটো মুঠো শক্ত করে সামনের দিকে শরীরের মধ্যভাগ উচ্চতায় রেখে তারপর বাঁ হাত সামনে রেখে ডান হাত পেছনে নিজের কাছে এনে ডান পাঁজর স্পর্শ করে রাখতে হবে । এইবার গত সংখ্যায় যেভাবে জোদান জুকি অনুশীলনের কথা আলোচনা করেছি, সেইভাবে নিজের সোলার প্ল্যাক্সস লক্ষ্য করে সামনে প্রতিপক্ষকে কল্পনা করে ঘুসি মারা অনুশীলন করতে হবে । একবার ডান হাত এবং তারপর বাঁ হাত, এইভাবে প্রতি হাতে কুড়ি বার করে অনুশীলন করতে হবে । প্রতিটি ঘুসি সোজাভাবে সামনে আঘাত করবে ।

শরীরের নিম্নভাগে ঘুসি মারার কৌশল : নিম্নভাগ বলতে আমরা ধরি পেটের নীচের অংশ থেকে পা পর্যন্ত । আমরা অনুশীলন করি পেটের নীচের অংশ ও গ্রইনস্ । এই দুটো খুবই দুর্বল স্থান, তাই এই জায়গা দুটো লক্ষ্য করে ঘুসি মারার অনুশীলন করতে হয় । এই ঘুসি মারার কৌশল আগের দুটো ঘুসি মারার কৌশলের মতো, শুধু উচ্চতার হেরফের । আগের পাঞ্চ করার সময় যা-যা আলোচনা করা হয়েছে, এবারেও ঠিক সেইভাবে দাঁড়াতে হবে এবং তারপর এক-এক করে বাঁ ও ডান হাত ছুঁড়ে অনুশীলন করতে হবে । প্রতি হাতে কুড়ি বার ।
সবরকমের ঘুসির অনুশীলনের ব্যাপার একই, শুধু বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা । তবে একটি বিশেষ জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে, ঘুসি মারার সময় কবজি থেকে হাতের মুঠো একটুখানি নীচের দিকে থাকবে, তা হলে প্রতিপক্ষের মুখে মুঠোর ঠিক অংশ ঠিকভাবে আঘাত করবে । শরীরের মধ্যঅংশে আঘাত করার সময় কবজি থেকে হাতের মুঠো একেবারে সোজা থাকবে, তা হলে মুঠোর ঠিক অংশ ঠিকভাবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করবে এবং নিম্ন ভাগে কবজি থেকে মুঠো একটুখানি ওপর দিক করে থাকবে । তা হলে মুঠোর ঠিক অংশ ঠিকভাবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারবে । কবজি ওপর-নীচ যে অবস্থায় থাকবে, খুবই শক্ত করে রাখা উচিত । নয়তো যখন পাঞ্চ প্রতিপক্ষকে আঘাত করবে তখন একটা উলটো প্রতিক্রিয়া নিজের শরীরের উপর হয় । তার ফলে কবজি মচকে গিয়ে যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা থাকে ।

ফোটো : উৎপল সরকার

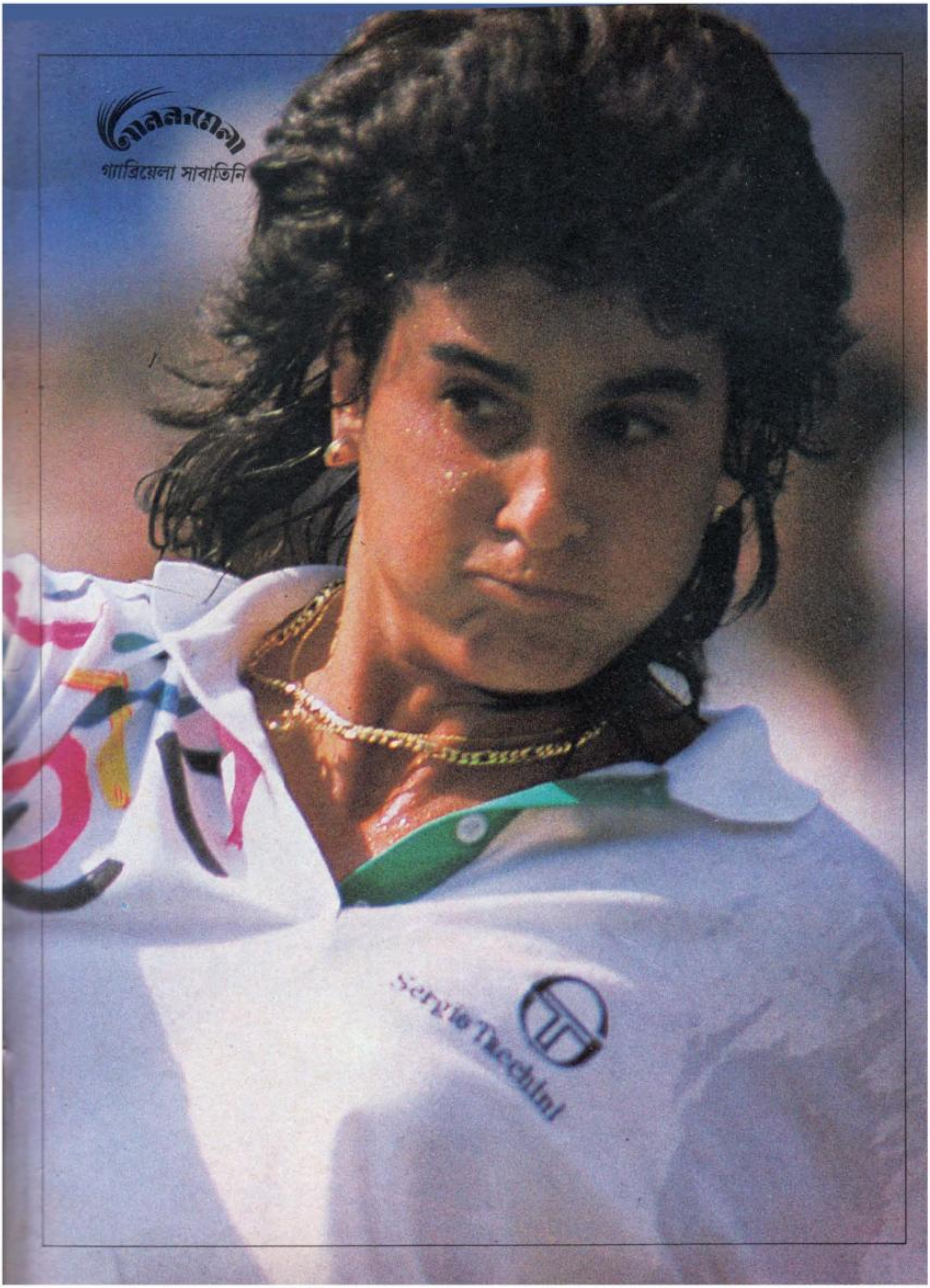
আনন্দমেলা
গ্যাব্রিয়েলা সাবাতিনি
Sergio Tacchini

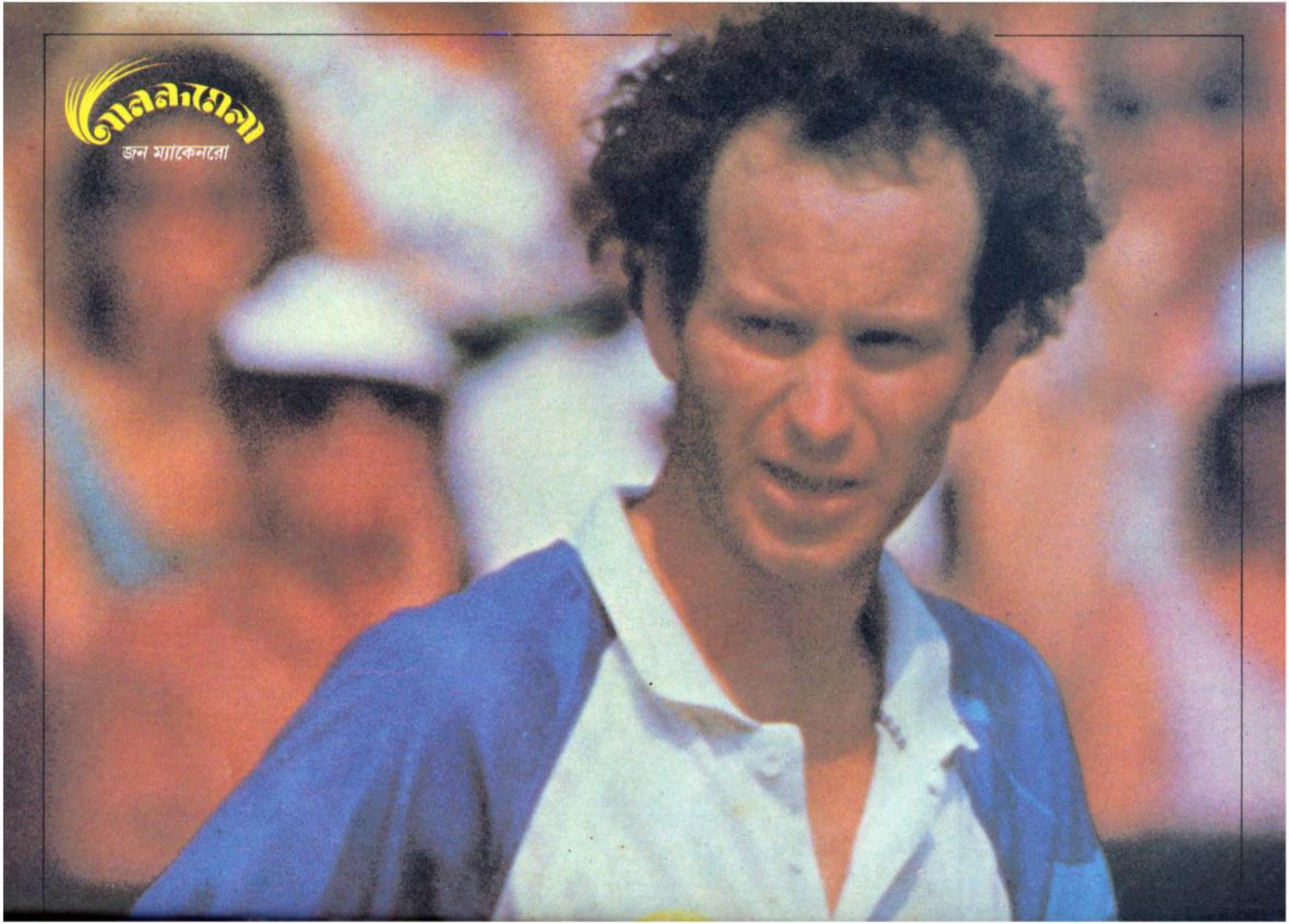
জন ম্যাকেনরো

১৪ কোটি বছর আগের সিলাকান্থ-ফসিল

জীবন্ত ফসিল সিলাকান্থ

জয় সেনগুপ্ত

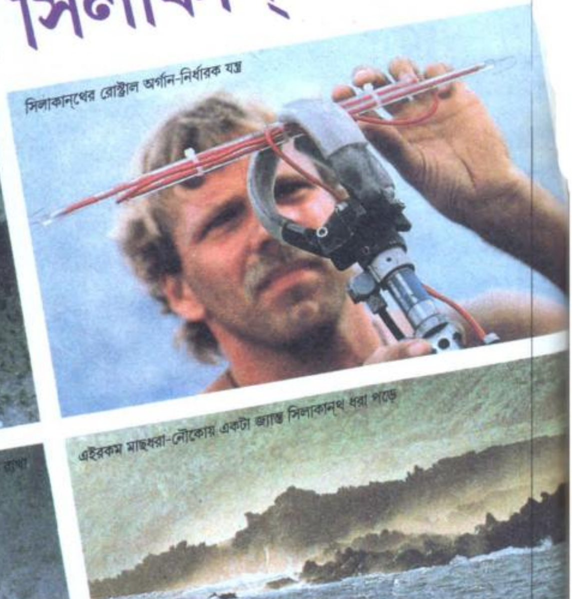

সিলাকান্থের রোস্ট্রাল অর্গান-নির্ধারক যন্ত্র

সিলাকান্থ-এর স্বভাব হল মাথাটাকে নীচের দিকে রাখা

এইরকম মাছধরা-নৌকোয় একটা জ্যান্ত সিলাকান্থ ধরা পড়ে

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে অবাধে ঘুরে বেড়াত মাংসাশী প্রাণী ডাইনোসর সির‍্যাটোসরস্, নিরামিশাষী ডিপ্লোডকাস, মেছো কুমিরের মতো জলের প্রাণী ইকথিয়সরস্, উভচর প্রাণী মোসাসরস্, উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোডাকটাইল। এ ছাড়া ছোট-বড় আরও কত যে প্রাণী ছিল তার হিসেব নেই।

কিন্তু এই সমস্ত প্রাণী এখন অবলুপ্ত। এদের সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তা প্রধানত ফসিল অর্থাৎ জীবাশ্ম থেকে। এইরকম প্রাগৈতিহাসিক এক প্রাণী সিলাকান্থ মাছ। এই মাছ কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায়নি পৃথিবীর বুক থেকে। লক্ষ-লক্ষ বছরেও অদ্ভুতভাবে টিকে গেছে এরা। এত বছরেও এই মাছের পরিবর্তন হয়েছে খুবই সামান্য। ছ'ফুট লম্বা এই মাছকে এই জন্য 'লিভিং ফসিল' বলা হয়।

ভারত মহাসাগরের যেদিকে কোমোরো দ্বীপপুঞ্জ সেদিকে ১৬৮ মিটার (৫৫০ ফুট) গভীর জলে সিলাকান্থ মাছের বিচরণক্ষেত্র।

সিলাকান্থের যে ফসিল পাওয়া গেছে, তা ৪০ কোটি বছর আগের। এমন একটা ফসিলও পাওয়া যায়নি যেটার বয়স ৬ কোটি মিলিয়ন বছরের কম। এর ফলে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল যে, মোটামুটি ওইরকম সময়ই সিলাকান্থ মাছ অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই ধারণা পালটে যায় ১৯৩৮ সালে মাছধরা-নৌকোয় একটা জ্যান্ত সিলাকান্থ ধরা পড়ার পর।

ইদানীংকালের ধরা সিলাকান্থের ছবি দেখলে বোঝা যাবে যে, এর সঙ্গে ১৪ কোটি বছর আগের ফসিল সিলাকান্থের সাদৃশ্যগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। এই বিশাল সময় অতিক্রম করার পরও সিলাকান্থের চেহারার পরিবর্তন এতই কম হয়েছে যে, ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক জে এল বি স্মিথ প্রাগৈতিহাসিক সিলাকান্থের রাফ স্কেচ দেখে জেলেদের ধরা একটা জীবন্ত সিলাকান্থকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

পৃথিবীতে সিলাকান্থ মাছের প্রথম আবির্ভাব ৪০ কোটি বছর আগে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কী করে যে এরা অপরিবর্তিত অবস্থায় রইল, তা আজও একটা রহস্য।

এখন পর্যন্ত সিলাকান্থের শুধুমাত্র ল্যাটিমারিয়া ক্যালামনি প্রজাতির অস্তিত্বের কথাই বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। শুধুমাত্র ভারত মহাসাগরেই এদের বসবাস। পৃথিবীর অন্য কোনও জায়গায় সিলাকান্থের অন্য কোনও প্রজাতি আছে কি না তা এখনও জানা যায়নি।

মারজোরি কোর্টনি ল্যাটিমার

মহিলা প্রকৃতিবিদ মারজোরি কোর্টনি ল্যাটিমারই প্রথম যিনি জীবন্ত সিলাকান্থের খবর দেন বিজ্ঞানীদের কাছে। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে মাছটা ধরা পড়েছিল সাউথ আফ্রিকার ইস্ট লন্ডন পোর্টে জেলেদের হাতে। ধরা পড়বার পর মাছটাকে দেখেই ল্যাটিমার বুঝতে পারলেন যে, এটা কোনও সাধারণ মাছ নয়। সঙ্গে-সঙ্গে সাউথ আফ্রিকায় গ্রাহামস্টাউনের রোডস্ ইউনিভার্সিটির মৎস্যবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে এল বি স্মিথের কাছে মাছটার একটা স্কেচ করে পাঠানো হল। স্মিথ এটাকে সিলাকান্থ বলে শনাক্ত করলেন। তিনি বললেন যে, এই সিলাকান্থটার প্রজাতি এবং বর্গ সম্পূর্ণ নতুন। আবিষ্কারক ল্যাটিমার এবং ক্যালামনি নামে যে নদীর মোহানা থেকে এটাকে পাওয়া গিয়েছিল সেই নদীটার নামে তিনি এই নতুন প্রজাতির নামকরণ করেন ল্যাটিমারিয়া ক্যালামনি।

এই সিলাকান্থ মাছের সন্ধানে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিম জার্মানির মাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর অ্যানিমল বিহেভিয়ারের মেরিন বায়োলজিস্ট এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রস্তুতকারক হান্স ফ্রিক কোমোরো আইল্যান্ডের আশেপাশে কয়েকবার অভিযান চালান এবং এই মাছগুলোর কিছু ফোটো তোলেন। অভিযান চালিয়ে সিলাকান্থ মাছের সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মেটোকা জাহাজে করে দু'জন লোক ধরে এমন একটা সাব্‌মারসিবল্ (ইচ্ছেমতো জলের নীচে ডুবিয়ে চালান যায় এমন যান) নিয়ে হান্স ফ্রিক, জুর্গেন শওয়ার, ওলাফ রিনিক এবং র‍্যাফেল প্লান্ট সিলাকান্থের সন্ধানে কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আজ পর্যন্ত যতগুলো মাছ ধরা পড়েছে তার অধিকাংশই গ্রান্ড কোমোরোর পশ্চিম উপকূল থেকে। সেইজন্য ওই জায়গাতেই হান্স ফ্রিকের দল সিলাকান্থ খুঁজতে আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন গভীরতায় ওই জায়গার জলের তাপমাত্রা মাপলেন তাঁরা। দেখলেন সিলাকান্থের বসবাস করার পক্ষে আদর্শ তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি থেকে ১৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (৫৯ ডিগ্রি থেকে ৬৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট)।

সাব্‌মারসিবলে ২২ বার ডুব দেবার পর গ্রান্ড কোমোরোর পশ্চিম উপকূল থেকে ১৮০ মিটার দূরে ১৯৮ মিটার গভীরতায় হান্স ফ্রিক তাঁর প্রথম সিলাকান্থের দেখা

সিলাকান্থ নিয়ে সচিত্র প্রচারপত্র, যা বিলি করা হয়েছিল

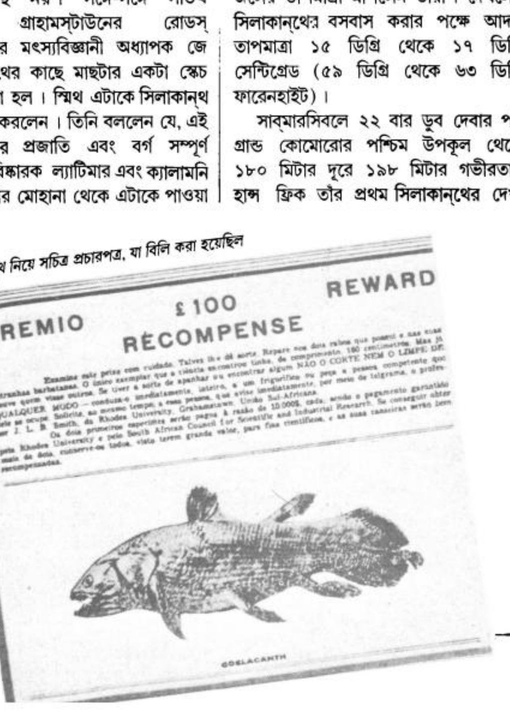

সিলাকান্থ-চর্চায় ব্যস্ত বিজ্ঞানীরা

পেলেন। সেই একই প্রজাতির মাছ ল্যাটিমারিয়া ক্যালামনি যেটা ৪৮ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

সমুদ্রের যে জায়গাটায় তাঁরা সিলাকান্থদের দেখা পেতেন সেখানে অন্য এমন কোনও প্রাণী ছিল না যা খেয়ে সিলাকান্থরা জীবন ধারণ করতে পারে। সেই জন্য সিলাকান্থদের কোনও কিছু খেতে তাঁরা দেখেননি। অবশ্য মরা সিলাকান্থকে কেটে তার পেটের ভেতর স্কুইড এবং অন্যান্য মাছ পাওয়া গেছে।

সিলাকান্থদের একটা অদ্ভুত স্বভাব হল, সমুদ্রের তলায় মাটিতে নীচের দিকে মাথা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। যে ছ'খানা সিলাকান্থকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন হান্স ফ্রিক তাদের সবগুলোকেই কোনও না কোনও সময় সমুদ্রের তলায় নীচের দিকে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন।

বেশ কিছুদিন ধরে সিলাকান্থদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর হান্স ফ্রিক এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সিলাকান্থরা তাদের চারপাশের তড়িৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তন থেকে শিকার খুঁজে বার করতে পারে এবং নীচের দিকে মাথা দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকাটাও এর সঙ্গে যে-কোনওভাবেই হোক সম্পর্কযুক্ত। এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি জলের তলায় একটা পরীক্ষা চালান।

সিলাকান্থদের সাঁতার কাটাটাও অদ্ভুত রকমের। কখনও-কখনও এরা পেছন দিকে সাঁতার কাটে আবার কখনও-কখনও কাটে পেটটা ওপর দিকে তুলে, অদ্ভুতভাবে। এরা এদের নমনীয় পাখনা প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘোরাতে পারে এবং এটা নৌকোর বৈঠা বা দাঁড়ের মতো কাজ করে যার ফলে মাছটা তার মন্থর শরীরটাকে সমুদ্রের নীচের স্রোতের বিরুদ্ধে ভেসে চলতে সাহায্য করে।

মৃত সিলাকান্থদের কেটে দেখা গেছে যে, তাদের মাথার খুলির মধ্যে পাখির ঠোঁটের মতো একরকম অঙ্গ থাকে যেটার নাম রোস্ট্রাল অর্গান। এই রোস্ট্রাল অর্গান হাঙরদেরও থাকে এবং এই অর্গানের সাহায্যে হাঙররা অন্যান্য প্রাণীদের (যেসব প্রাণী হাঙররা শিকার করে খায়) ত্যাগ করা তড়িৎ-ক্ষেত্র থেকে তাদের খুঁজে বার করতে পারে।

হান্স ফ্রিকের আগে যেসব বিজ্ঞানী সিলাকান্থদের নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন তাঁদের সবচেয়ে যে অসুবিধে ছিল তা হল তাঁদের কোনও সাবমারসিবল ছিল না। তাঁরা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন কোমোরোর জেলেদের ডাঙায় নিয়ে আসা মৃত বা মৃতপ্রায় সিলাকান্থদের নিয়ে।

একটানা বহুদিন ধরে অভিযান চালাবার ফলে হান্স ফ্রিক এবং তাঁর দলের কয়েকজন সদস্য প্রতিটি সিলাকানথকে আলাদা-আলাদাভাবে চিনতে পারতেন তাদের গায়ের চামড়ার ওপর বৈশিষ্ট্যসূচক সাদা চিহ্ন দেখে। খুব সম্ভবত এই সাদা চিহ্নগুলো সিলাকান্থদের কোনও-কোনও সময় ছদ্মবেশ ধারণ করতে সাহায্য করে। কারণ চামড়ার ওপরের এই সাদা ফুটকিগুলোর জন্য এরা সমুদ্রের নীচে মাটির ওপর ঠিক একই রঙের স্পঞ্জের সঙ্গে মিশে থাকে।

এখনকার সিলাকান্থ। এর দেহের বিভিন্ন অংশ

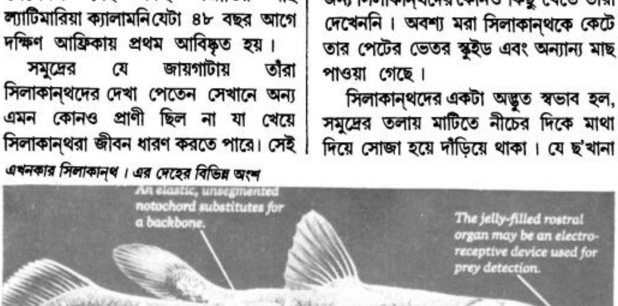

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

XXX. INTERNATIONALE
MATHEMATIK OLYMPIADE
1989 NIEDERSACHSEN

Hannoversche Allgemeine

এই ওলিম্পিকের খবরাখবর জানার জন্য সারা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে থাকে না। এমনকী, অঙ্ক নিয়ে যে এরকম একটি ওলিম্পিক বেশ কয়েক বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সে-খবরও অনেকে রাখেন না। তবু, সারা বিশ্বের অঙ্ককুশলী কিশোর-কিশোরীদের কাছে এই ওলিম্পিকের আকর্ষণ দুর্নিবার।

অঙ্ক-ওলিম্পিয়াড

গৌতম চক্রবর্তী

১৭ জুলাই, ১৯৮৯। পশ্চিম জার্মানির ঘড়িতে এখন সকাল এগারোটা।

ব্রাউনশাইগ শহরের স্টেট হলের মাথায় পতপত করে উড়ছে বাহান্নটা দেশের পতাকা। হলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে টিলমান সুসাটোর 'লা মরিস্ক্' অর্কেস্ট্রার মনমাতানো সুরের ঝঙ্কার।

শুরু হয়ে গেছে ওলিম্পিকের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান!

বাহান্নটি দেশ থেকে সবসুদ্ধ ৩১২ জন প্রতিযোগী যোগ দিয়েছে এই ওলিম্পিকে। সাতদিনের এই ওলিম্পিকের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে কোনও বর্ণাঢ্য মার্চ-পাস্ট নেই, কোনও জ্বলন্ত মশাল নেই। এমনকী, ফলাফল ঘোষণার দিনেও এখানে কোনও বিখ্যাত রাষ্ট্রপ্রধান ছুটে আসবেন না তাঁর দেশকে উৎসাহ দিতে।

এই ওলিম্পিকের প্রতিযোগীরা কেউই কার্ল লিউইস-এর মতন ক্ষিপ্র নয়, ম্যাট্স বিয়ন্ডির মতো সুদক্ষ সাঁতারু নয়, এই ওলিম্পিকে যোগদানকারী নারীরা কেউ ফ্লো জো কিংবা নাদিয়া নয়।

এটা অঙ্কের ওলিম্পিক।

অঙ্ক-ওলিম্পিক বা 'ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিক ওলিম্পিয়াড' বয়সের দিক থেকে নিতান্ত শিশু নয়, ১৯৫৯ সাল থেকে এটি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। একমাত্র ১৯৮০ সালে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়নি, সেই হিসাবে এ-বছর ব্রাউনশাইগ শহরের ওলিম্পিকটি ছিল ত্রিশতম ওলিম্পিক।

কোনও কু-তার্কিক লোক প্রশ্ন তুলতেই পারেন, কেন? ১৯৮০ সালে ওলিম্পিকটি হয়নি কেন? সে-বছর তো কোনও বিশ্বযুদ্ধ ছিল না! তা হলে কি সে-বছর পৃথিবীতে কোনও অঙ্ককুশলী বালক-বালিকা খুঁজে পাওয়া যায়নি? বলা বাহুল্য, সব অঙ্কের যেমন উত্তর মেলে না, এ-প্রশ্নেরও সেরকম কোনও উত্তর নেই।

অঙ্ক-ওলিম্পিকের কোনও একক ব্যারন পিয়েরে কুবার্তা নেই। ১৯৫৯ সালে, রুমানিয়া হঠাৎ ঠিক করল, সারা পৃথিবীতে ১৯ বছরের কম বয়সী, হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়ের ছেলেদের মধ্যে একটা অঙ্ক-প্রতিযোগিতা করলে কেমন হয়? ওলিম্পিকের মতন, এখানেও সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জের মেডেল পুরস্কার দেওয়া হবে।

যে কথা সেই কাজ! ১৯৫৯-'৬০ পরপর দু' বছর রুমানিয়াতে অনুষ্ঠিত হল অঙ্ক-ওলিম্পিক। '৫৯ সালে প্রথম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল মাত্র সাতটি দেশ— রুমানিয়া, হাঙ্গারি, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া ও পূর্ব জার্মানি। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল সংগঠক দেশ রুমানিয়া। দানিয়ুব নদীর ধারে এই ছোট্ট দেশটিকে এবার থেকে তা হলে 'অঙ্কের গ্রিস' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে!

ওলিম্পিকের মতোই ধীরে-ধীরে জনপ্রিয়

হয়ে উঠেছে এই প্রতিযোগিতা। ১৯৬৭-তে ওলিম্পিকে প্রথমবার যোগ দিল ইতালি ও ফ্রান্স। আমেরিকা প্রথম যোগ দিল '৭৪ সালের ষোড়শ ওলিম্পিকে। '৭৬ সালের অষ্টাদশ ওলিম্পিকে প্রথম যোগ দিল এক এশীয় রাষ্ট্র—ভিয়েতনাম! খনা, লীলাবতী, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্যের দেশ ভারতবর্ষ? ব্রাউনশাইগে, ত্রিশতম ওলিম্পিকটিতেই ভারতের প্রথম অংশগ্রহণ!

অঙ্ক-ওলিম্পিকের জন্য প্রতি বছর সংগঠক দেশটি বিভিন্ন দেশের নামী অঙ্কবিদ ও অঙ্কের মাস্টারমশাইদের আমন্ত্রণ জানায় এবং একটি আন্তর্জাতিক জুরি-কমিটি গঠন করে। জুরি-কমিটির মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়।

জুরি-কমিটি এবার অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দেশকে ৬টি করে অঙ্ক পাঠাতে বলেন। শর্ত এই ধরনের অঙ্ক কোথাও, কোনও বইতে থাকা চলবে না। এক কথায়, অঙ্কগুলিকে পুরোপুরি আবিষ্কার করতে হবে। পাঠানো সমস্যাগুলির মধ্যে থেকে এবার জুরি-কমিটি মোট ৬টি অঙ্ক নির্বাচন করে নেন। ওলিম্পিক-প্রতিযোগিতাটি দু' দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের প্রত্যেক দিন ৩টি করে অঙ্ক দেওয়া হয়, সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি শেষ করতে হবে। এক-একটি অঙ্কের জন্য সাত নম্বর নির্দিষ্ট থাকে। কেউ বিয়াল্লিশের মধ্যে বিয়াল্লিশ নম্বর পেলে, তাকে বলা হয় পারফেক্ট স্কোর। যারা ৩৯ থেকে ৪২-এর মধ্যে নম্বর পাবে, তাদের দেওয়া হবে স্বর্ণপদক। ৩০ থেকে ৩৮-এর মধ্যে পেলে দেওয়া হবে রৌপ্যপদক ও ১৮ থেকে ২৯-এর মধ্যে পেলে দেওয়া হবে ব্রোঞ্জপদক।

অংশগ্রহণকারী দেশগুলি প্রশ্ন পাঠাবে, আর যেসব দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদানে আগ্রহী, তারা এই প্রতিযোগিতাটি কেমন হয়, সেসব দেখার জন্য একজন পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারে। তবে, কোনও ওলিম্পিকে পর্যবেক্ষক পাঠালে, তার পরের ওলিম্পিকে সেই দেশটিকে অংশগ্রহণ করতেই হবে।

'৮৮ সালের ওলিম্পিকে হঠাৎ দেখা গেল, শৈলেশ শিরালি নামে এক অঙ্কের অধ্যাপক সেখানে হাজির হয়েছেন। কথাবার্তায় জানা গেল, ভদ্রলোক ভারতীয়। অন্ধ্রপ্রদেশের ঋষি ভ্যালি স্কুলের অঙ্ক বিভাগের প্রধান। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বোর্ড অব হায়ার ম্যাথমেটিক্স' তাঁকে পর্যবেক্ষক হিসাবে এখানে পাঠিয়েছে। '৮৯ সালে, ব্রাউনশাইগ

ওলিম্পিকে যোগদান করতে ইন্ডিয়া নাকি রীতিমত আগ্রহী!

অধ্যাপক শিরালি দেশে ফেরার পর থেকে শুরু হয়ে গেল বাছাই-পর্ব। ১৯৮৫-তে ফিনল্যান্ডে ২৬তম ওলিম্পিকে ঠিক হয়েছিল, প্রতিটি দেশ ৬ জন করে প্রতিযোগী পাঠাবে। তারপর থেকে সেই নিয়ম আজও চলে আসছে। ইন্ডিয়া কীভাবে ৬ জন অঙ্কের পি· টি· উষা বা কর্তার সিং, খাজান সিংকে বাছবে? বলা বাহুল্য, ৬ জনেরই বয়স হতে হবে ১৯ বছরের মধ্যে, প্রত্যেকেই হবে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়ের ছাত্র। অধ্যাপক শিরালি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তাঁর দেশে হায়ার সেকেন্ডারি মানে ১০+২ সিস্টেম। কিন্তু জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ১০+৩ সিস্টেম। তা হলে, ভারতের কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের যোগদান করতে দেওয়া হবে না কেন? বলা বাহুল্য, জুরি-কমিটি তাঁর সেই যুক্তি মেনেও নিয়েছে।

'৮৮-র অগস্ট মাসে ভারতের প্রায় সমস্ত স্কুল ও কলেজে একটি করে লিফলেট পাঠানো হল। তাতে বলা হয়েছে, ভারত অঙ্ক-ওলিম্পিকে যোগদানের জন্য প্রতিযোগী বাছাই করবে। প্রথমে রাজ্যভিত্তিক একটি পরীক্ষা হবে, প্রতি রাজ্য থেকে গড়ে অন্তত ১০ জন সফল প্রতিযোগীকে বেছে নেওয়া হবে। অক্টোবর মাসে, এই সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা হবে, সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ২০ জনকে বাছাই করা হবে। এই ২০ জনকে '৮৯-এর মে মাস থেকে বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, প্রশিক্ষণের শেষে ৬ জনকে বাছাই করে নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্তরে রাজ্যভিত্তিক ও দ্বিতীয় স্তরের সর্বভারতীয় উভয় পরীক্ষাতেই পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ওলিম্পিকে অংশগ্রহণের জন্য বাঙ্গালোরে ট্রেনিং দেওয়া হল এ-বছর ২০ মে থেকে ১০ জুন অবধি। ভারতের ২০ জন বাঘা-বাঘা অঙ্কের ছাত্র সেখানে হোস্টেলে থাকে, সকাল ১০টা থেকে ১টা অবধি তাদের অঙ্ক-ক্লাস নেওয়া হয়, দুপুরে খাওয়ার পর আবার ২টো থেকে বিকেল ৫টা ৩০ অবধি ক্লাস। একদিন অন্তর-অন্তর পরীক্ষা। খেলাধুলোর ওলিম্পিকে, যেমন লং জাম্প, ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতার, ৫০০ মিটার দৌড় ইত্যাদি ইভেন্ট ঠিক করা থাকে, অঙ্ক-ওলিম্পিকেও সেরকম অঙ্কের ইভেন্টগুলি নির্দিষ্ট করা থাকে। প্রতিযোগিতায় থাকবে নম্বর থিওরি, কম্বিনেটরিক্স, সলিড জিওমেট্রি, প্লেন জিওমেট্রি এবং গ্রাফ থিয়োরির অঙ্ক। তথাকথিত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই· আই· টি পরীক্ষা থেকে এই অঙ্কগুলি একেবারেই আলাদা।

১০ জুন বিকেলে ওলিম্পিক-টিমের নির্বাচিত ৬ জনের নাম ঘোষণা করা হল

▲ ব্রাউনশাইগ্ স্টেট-হলের সামনে সমবেত প্রতিযোগীরা

▲ একমাত্র বাঙালি প্রতিযোগী মনোজপ্রতিম

ভোজসভায় ভারতীয়-দল। সঙ্গে অধ্যাপক শিরালি ও তরুণী ইনা ▼

অঙ্ক-ওলিম্পিকের প্রথম ভারতীয় যোগদানকারী হিসাবে আছে বম্বে আই· আই· টি-র প্রথম বর্ষের তিনজন ছাত্র। এদের নাম অজয় সুব্রহ্মণ্যম, আমুল এস· দিঘে ও উপেন্দ্র কুলকার্নি, বাকি তিনজন এ-বছরেই সদ্য হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে। এরা হল উত্তরপ্রদেশের অরবিন্দ রাজারামন, অন্ধ্রপ্রদেশের আর· মুরলিধর ও পশ্চিমবাংলার মনোজপ্রতিম সামন্ত। দলের অধিনায়ক অধ্যাপক ইসার হুসেন, সহ-অধিনায়ক শৈলেশ শিরালি। এঁরা দু'জনে কেউ অঙ্ক কষবেন না। প্রতিযোগিতার খাতা দেখবেন। অধ্যাপক হুসেন ও শিরালি বাঙ্গালোর থেকেই দলটিকে নানাভাবে তৈরি করে আসছেন, আপদে-বিপদে এঁরা দলের সকলের সঙ্গে একাত্ম।

১৫ জুলাই, ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দর থেকে আকাশে উড়ল ভারতীয় দল। ৬ জনের দলের সঙ্গে রয়েছেন সহ-অধিনায়ক শৈলেশ শিরালি। অধিনায়ক ইসার হুসেন দু'দিন আগেই রওনা হয়ে গেছেন, সেখানে সব দলের অধিনায়কদের ভোট নিয়ে তারপর এ-বছরের ৬টা প্রশ্ন নির্বাচন করা হবে।

ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন পেরিয়ে, ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের তারিখ এখন ১৬ জুলাই, সন্ধে সাতটা। হ্যানোভারের বিমানে উঠল একদঙ্গল কিশোর কিশোরী। ফরাসি ও ভারতীয় ছেলেমেয়েরা এই বিমানেই অঙ্ক-ওলিম্পিকে অংশ নিতে চলেছে। ভারতীয় দলটি ফ্রাঙ্কফুর্টে যথাসময়ে, বিকেল ৪টেতে পৌঁছেছে কিন্তু ফরাসিদের জন্য তাদের বিমানবন্দরের ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হয়েছে।

হ্যানোভার থেকে ব্রাউনশাইগ বাসে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ। হ্যানোভারে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিল ব্রাউনশাইগ টেকনিকাল ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচারের ছাত্রী ইনা শোয়ার্জ। হাসিখুশি, চঞ্চল স্বভাবের এই তরুণী জানাল, এখন থেকে সে-ই ভারতীয় টিমের সুপারভাইজার। সব দেশের দলের সঙ্গে এখন থেকে থাকবে জার্মান সুপারভাইজার। সুপারভাইজাররা সবাই ওখানকার ছাত্রী। সহ-অধিনায়করা ব্রাউনশাইগে নেমে দলছাড়া হয়ে যাবেন, সব দেশের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কদের জন্য একটা হোটেল ঠিক করা হয়েছে। কেন সহ-অধিনায়ক আর দলের সঙ্গে থাকবেন না? কারণ অধিনায়ক ইতিমধ্যে দু'দিন আগে এসে ভোটের সময় ৬টি অঙ্কই দেখে ফেলেছেন। যদি তিনি সহ-অধিনায়কের মাধ্যমে তাঁর দলকে প্রশ্নগুলো বলে দেন? অঙ্ক-বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে অনেকটা রাজনীতিকদের মতোই। তাঁরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না।

ব্রাউনশাইগ একটি ছোট্ট, সুন্দর মফস্বল শহর, এখানে সব দলের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়করা আছেন হোটেল মারকারি এটরিয়ামে, প্রতিযোগীদের জন্য বরাদ্দ মোট চারটি হোটেল ইয়ুথ ইন, লোরেন্জ, জুর অপার ও লেসিংগর্ফ। ভারতীয়রা আছে ইয়ুথ ইন-এ।

সতেরো তারিখ উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর ভাষণ দিলেন পশ্চিম জার্মানির শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ফ্রিৎজ্ শুমান, লোয়ার স্যাক্সন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হোর্স্ট হোরমান। আমন্ত্রণ জানালেন এ-বছরের জুরি কমিটির চেয়ারম্যান, ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার এঞ্জেল। ভাষণের শেষে ছিল ভূরিভোজের ব্যবস্থা। অধ্যাপক এঞ্জেল তাঁর বক্তৃতায় জানালেন, এই ওলিম্পিকে যোগদানকারী ২৭০ জনের মধ্যে মাত্র ৪০ জন ছাত্রী। যোগদানকারী সব ছাত্রছাত্রীকেই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। পদক পাবেন ১৩৫ জনের উপরে। ৩৯ থেকে ৪২ পেলেই স্বর্ণপদক। স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদকের সংখ্যার অনুপাত হবে মূলত ১ : ২ : ৩। অর্থাৎ, ২০ জন স্বর্ণপদক পেলে, রুপো পাবে ৪০ জন, ব্রোঞ্জ

পাবে ৬০ জন। সবাই কে কত নম্বর পেয়েছে, জানিয়ে দেওয়া হবে ২২ তারিখ বিকেলে।

২২ তারিখ বিকেলে ছাত্রছাত্রীরা হাতে পাবে আর-একটি তালিকা। ধরা যাক, চিন ৪টি স্বর্ণপদক, ২টি রৌপ্যপদক পেয়েছে। রুমানিয়াও ৪টি স্বর্ণপদক, ২টি রৌপ্যপদক পেয়েছে। কিন্তু কোন ছাত্র কত নম্বর পেয়েছে, তারও তালিকা আছে। চিনের ৪ জন স্বর্ণপদক জয়ীই হয়তো ৪২ পেয়েছে। সেখানে রুমানিয়ার হয়তো ১ জন ৪২, ২ জন ৪০, ৩ জন ৩৯ পেয়েছে। তা হলে, স্কোর

খাবারের টেবিলেও চলছে অলিম্পিক-জয়ের পরিকল্পনা

পয়েন্ট এগিয়ে প্রথম হল চিন। এঞ্জেল জানালেন, ওই লিস্টটা আন-অফিশিয়াল। তারপর হাসতে হাসতেই ডঃ শুমানকে দেখিয়ে বললেন, আমরা মাস্টারমশাইরা ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত নম্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু মন্ত্রীরা ছাত্রছাত্রীদের, রাষ্ট্রের নম্বরে বিশ্বাসী।

ব্রাউনশাইগ টেকনিকাল ইউনিভার্সিটির হলে ১৮, ১৯—পরপর দু'দিন পরীক্ষা। ২০ থেকে ২২ অবধি দলের অধিনায়ক সহ-অধিনায়ক ও জুরিরা খাতা দেখায় ব্যস্ত। প্রতিযোগীরা তখন মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেলো, লুনেবার্গ, হ্যানোভার শহরে। সেই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রাইন নদীর উপত্যকা আর অঢেল খেলার ব্যবস্থা।

২২ জুলাই বিকেলে প্রকাশিত হল পরীক্ষার ফল। সোনা পেয়েছে ২৬ জন, রুপো ৫২ জন ও ব্রোঞ্জ ৭৮ জন। ভারত পেয়েছে ৪টে ব্রোঞ্জ। পেয়েছে উত্তরপ্রদেশের অরবিন্দ রাজারামন ও বম্বে আই, আই, টি'র তিনজন ছাত্র। আর, মন্ত্রীরা যেই আন-অফিশিয়াল, রাষ্ট্রগত তালিকায় বিশ্বাসী, তার ফল ?

ত্রিশতম ব্রাউনশাইগে ম্যাথমেটিক ওলিম্পিয়াডে প্রথম হয়েছে, চিন, দ্বিতীয় রুমানিয়া, তৃতীয় রাশিয়া, চতুর্থ আমেরিকা। ভারত পেয়েছে পঁচিশতম স্থান।

২৩ জুলাই, ব্রাউনশাইগ স্টেট হলে ওলিম্পিকের সমাপ্তি উৎসব। অর্কেস্ট্রা, ভাষণ আর লোভনীয় ভোজসভা। দেখা গেল এক জাপানি ভদ্রলোককে। তিনি পর্যবেক্ষক। '৯০ সালের ওলিম্পিয়াডে জাপান যোগ দিতে ইচ্ছুক। আর সমাপ্তি-উৎসবেই '৯০ সালের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন চিনের দলনেতা মা জি উয়েন। বেজিং শহরে অনুষ্ঠিত হবে একত্রিশতম ওলিম্পিয়াড। ব্রাউনশাইগ ওলিম্পিয়াডের ম্যাসকট ছিল জার্মান গণিতজ্ঞ গাউসের দাড়িওয়ালা মুখ। বেজিং ওলিম্পিয়াডে আমরা নিশ্চয় একজন চিনা গণিতজ্ঞের মুখদর্শন করব, কিন্তু ভারতের ব্যর্থতার কারণ কী ? কেন সে হল ২৫তম ?

ম্যাথমেটিক ওলিম্পিয়াডে সাফল্য কিছুটা নির্ভর করে ট্রেনিং-এর উপর। ছোট্ট দেশ হাঙ্গারিতে ৬ জনকে বেছে নেওয়া হয় ৬টি পর্যায়ের পরীক্ষার মাধ্যমে, ভারতের ৬ জনকে বাছা হয় ৩টি পর্যায়ের পরীক্ষার মাধ্যমে।

চিন, রুমানিয়া ও রাশিয়ায় ডিসেম্বরে, দল-বাছাইয়ের পরই শুরু হয়ে যায় ট্রেনিং-পর্ব। দীর্ঘ ৬ মাস ধরে ওই ৬টি ছাত্রছাত্রীকে তারা শুধু অঙ্ক ওলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত করে। ওই ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্স-এর সমতুল্য পরীক্ষাগুলি দিতে হয় না। তারা যে কলেজে ভর্তি হতে চায়, সরকার সেখানেই তাদের ভর্তি করে নেন।

ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশগুলি নিজেদের মধ্যে একটি ইউরোপীয় অঙ্ক প্রতিযোগিতা আহ্বান করে, তারপর সেই পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে নিজের দেশের ৬ জনকে বাছাই করে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় প্রতিযোগীদের ট্রেনিং হয়েছে মাত্র কুড়ি দিন—২০ মে থেকে ১০ জুন। মে অবধি তাদের সবাইকে উচ্চ মাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই. আই. টি ইত্যাদির বেড়াজাল টপকাতে হয়েছে

দ্বিতীয়ত, বইয়ের অভাব, ছোট্ট দেশ হাঙ্গারিতে ৩০% ছাত্রছাত্রীই অঙ্ক ওলিম্পিক সম্বন্ধে জানে, আমাদের দেশের প্রতিযোগীরা নিজেরা কেউ এক বছর আগেও এই অলিম্পিকের নাম শোনেনি। শ্রেফ এই ওলিম্পিকের প্রশ্নপত্র, নিয়ম ইত্যাদি নিয়ে আমেরিকায় 'ক্রুকস ম্যাথমেটিকোরাম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে অঙ্ক-ওলিম্পিকের উপর মাসিক পত্রিকার কথা স্বপ্নের মতো।

তৃতীয়ত, খেলাধুলোর মতো বোধ হয় অঙ্ক ওলিম্পিকেও ভারত গোড়া অবধি পৌঁছতে রাজি নয়। ব্রাউনশাইগ ওলিম্পিয়াডে একমাত্র ভারতীয় প্রতিযোগীদের গড় বয়স ছিল ১৮ থেকে ১৯। অন্যসব দেশের প্রতিযোগীদের গড় বয়স সেখানে ১৫ থেকে ১৬।

তবে, পৃথিবীর মানুষ সবজায়গায় একরকম। মনোজপ্রতিম জানাল, ব্রাউনশাইগ শহরের বাস-স্টপে একজন ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "অঙ্ক ওলিম্পিক! সেটা কী ?" সাধারণ লোকেরা শহরে যথারীতি অফিস-কাছারি করেছে, স্কুল-কলেজের সামান্য কয়েক শতাংশ ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর কেউ এ-প্রতিযোগিতায় তেমন উৎসাহ দেখায়নি।

পৃথিবীর সব সাধারণ ছেলেমেয়েই অঙ্ক থেকে শতহস্ত দূরে!

তার এক হাঙ্গারীয় বন্ধুর কাছে মনোজ নাকি ফিজিক্স ওলিম্পিয়াডের প্রশ্ন দেখেছে। ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতেও নাকি অঙ্কের মতো ওলিম্পিক হয়।

ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজি

অমর দাশ

ভারতের যেসব জিনিস বিদেশে রপ্তানি হয় তার মধ্যে পাট, চা অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। এমন দিন ছিল, যখন ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটশিল্পের ছিল রমরমা অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে তখন প্রচুর পাট উৎপন্ন হত, স্বদেশের আর বিদেশের বাজারের চাহিদা মেটাতে হুগলি নদীর দু'পাশে গড়ে উঠেছিল জুট মিল। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যদি উৎপাদন বাড়াতে হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বাড়াতে হয় তা হলে দরকার প্রশিক্ষণরত দক্ষ কর্মীর। এই দক্ষ ও কুশলী কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ১৯৫১ সালের ১০ মার্চ ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজি *ফোটো : রাজীব বসু*

এই ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠার আগে জুট টেকনোলজি পড়ার জন্য ছুটতে হত বিলেতের ডাণ্ডিতে। এখন ডাণ্ডিতে এই কোর্স পড়ানো হয় না। জুট টেকনোলজি পড়ার জন্য ইনস্টিটিউটই এখন প্রধান। ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজির ঠিকানা হল: ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯। এ ধরনের ইনস্টিটিউট ভারতে আর নেই।

বিভিন্ন কোর্স

বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে (ক) শর্ট কোর্স ফর জুনিয়ার লেভেল সুপারভাইজার্স (খ) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স এবং (গ) ফাইবার টেকনোলজিতে বি. টেক. কোর্স পড়ানো হয়। জুনিয়ার লেভেল সুপারভাইজার্স শর্ট কোর্সের নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই কোর্সটি জুট মিলে কর্মরত জুনিয়ার লেভেল সুপারভাইজারদের জন্যই চালু হয়েছে। যাঁরা জুট মিলে উৎপাদনের কাজে যুক্ত, তাঁদের পক্ষে এই কোর্স শেখার প্রয়োজন আছে। এই কোর্সে এলিমেন্টারি স্পিনিং, এলিমেন্টারি উইভিং, এলিমেন্টারি টেক্সটাইল সায়েন্স, এলিমেন্টারি টেক্সটাইল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়।

এবার জানা দরকার এই কোর্স কারা পড়তে পারবেন ? কোনও জুট মিলে জুনিয়ার লেভেল সুপারভাইজারের যদি কমপক্ষে চার থেকে ছ' মাসের কাজের অভিজ্ঞতা থাকে এবং তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি অন্তত মাধ্যমিক পাশ হয়, তা হলে তিনি এই শর্ট কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। তবে প্রার্থীর ইংরেজিতে কাজ করার যোগ্যতা থাকা চাই। বিভিন্ন জুট মিল তাদের মনোনীত প্রার্থীদের এই কোর্স পড়ার জন্য পাঠান। তখন ইনস্টিটিউট তাঁদের ইন্টারভিউ নিয়ে ভর্তি করে নেন।

কোর্সটির মেয়াদ সাত মাস। তার মধ্যে একমাস মিলে কাটাতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, এটি পুরো সময়ের কোর্স। জানুয়ারিতে শুরু হয়ে সেই বছরের জুলাইতে কোর্সটি শেষ হয়। এজন্য মিলের মনোনীত প্রার্থীদের লাগে ৭৫০ টাকা। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য লাগে ১২৫০ টাকা এবং বিদেশী কোনও ছাত্রের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ২০০০ টাকা।

তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব কোনও হস্টেল নেই, প্রয়োজনে বাইরের ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা

নিজেদেরই করে নিতে হয়। তবে ক্যান্টিন থেকে খাবারদাবার পাওয়া যেতে পারে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই কোর্সে ভর্তির জন্য অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্র পাওয়া যায় অধ্যক্ষের অফিস থেকেই। মোট আসন সংখ্যা ৪০।

ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় কোর্সটি হল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স। দু' বছরের পুরো সময়ের কোর্স। এই কোর্সে মোট আসন ৪০টি। স্পনসর্ডদের জন্য ৩০টি এবং নন-স্পনসর্ডদের জন্য ১০টি। তাই ভর্তির ক্ষেত্রেও দু'রকম ব্যবস্থা আছে।

৩০টি স্পনসর্ড আসনে ভর্তি হতে হলে কোনও মিলের মনোনয়ন পাওয়া দরকার। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রিয় সরকারের মনোনীত প্রার্থীকেও নেওয়া হয়। সকলের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা একই। প্রার্থীকে পিওর সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশন স্তরে ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স বা স্ট্যাটিসটিকস বিষয় নিয়ে পাশ করে থাকতে হবে।

অগস্ট মাসে মিল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভর্তির আবেদনপত্র পাঠাতে হয় অধ্যক্ষের কাছে। মনোনীত প্রার্থীদের সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। যাঁরা লিখিত পরীক্ষায় এবং ইন্টারভিউতে সফল হন এবং যাঁদের তিন থেকে ছ'মাসের মিল-ট্রেনিং আছে, ভর্তির ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মোট আসনসংখ্যা ৪০। প্রার্থীদের বয়স হওয়া চাই ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তবে প্রয়োজনে ২৪ বছরের বেশি বয়স্ক প্রার্থীদেরও ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হয়।

এবার পড়াশুনোর খরচপত্র সম্বন্ধে একটু ধারণা দেওয়া যাক। স্পনর্সড প্রার্থীদের টার্মপিছু টিউশন-ফি দিতে হয় তিন হাজার টাকা অর্থাৎ দু'বছরে তাদের জন্য মিলকে দিতে হয় ছ' হাজার টাকা। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার চোদ্দ হাজার টাকা। এ ছাড়া সব প্রার্থীকেই কশান ডিপোজিট হিসেবে ২০০ টাকা জমা দিতে হয়।

দুটো প্রধান পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথম টার্মের শেষে পার্ট-১ পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় টার্মের শেষে পার্ট-২ পরীক্ষা। এ ছাড়া পিরিয়ডিকাল পরীক্ষাও নেওয়া হয়। তিন মাসের মিল-ট্রেনিং শেষে প্রার্থীকে প্রথম এবং দ্বিতীয় টার্ম ইনস্টিটিউটে কাটাতে হয় এবং তৃতীয় টার্ম আবার মিলে কাটাতে হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে কোর্স শুরু হয়।

অনেক ছাত্রছাত্রীর এই কোর্সে পড়ার ইচ্ছে থাকায় কিছু নন-স্পনসর্ড প্রার্থীকেও এই কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা একই ধরনের। বয়ঃসীমা ২০ থেকে ২৪ বছর। নন-স্পনসর্ড ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রতি টার্মের জন্য টিউশন-ফি দিতে হয় এক হাজার টাকা করে অর্থাৎ মোট দু' হাজার টাকা। এ ছাড়া পরীক্ষার ফি ৮০ টাকা হিসেবে দিতে হয় দু'বার অর্থাৎ পার্ট-১ এবং পার্ট-২ পরীক্ষার সময়ে। কশান ডিপোজিট দু'শো টাকা জমা রাখতে হয়। অন্যান্য সমস্ত নিয়মকানুন স্পনসর্ড প্রার্থীদের মতোই। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা, মিল-ট্রেনিং সবই আছে। আবেদনের ফর্ম সরাসরি অধ্যক্ষের অফিসে পাওয়া যায় অগস্ট মাসে। বলে রাখা ভাল, নন-স্পনসর্ড প্রার্থীদের থাকার জন্য ইনস্টিটিউটে কোনও হস্টেলের ব্যবস্থা নেই।

প্রথম টার্মে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত প্রার্থীকে ইনস্টিটিউটে পড়াশুনো করতে হয়। মে-জুন একমাস মিলে ট্রেনিং নিতে হয়। আবার জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, তিন মাস ইনস্টিটিউটে পড়াশুনো। অক্টোবরে ছুটি। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস আবার ইনস্টিটিউটে পড়াশুনো। শেষ দিকে পার্ট-১ পরীক্ষা। দ্বিতীয় টার্মেও এইভাবেই বছর কাটিয়ে শেষ দিকে পার্ট-২ পরীক্ষা। তৃতীয় টার্মে চার মাস মিলে ট্রেনিং। মিল ট্রেনিং-এর শেষে মৌখিক পরীক্ষা হয়।

বি· টেক· কোর্স

সবশেষে আমরা যে কোর্সটি নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হল— ফাইবার টেকনোলজিতে বি· টেক· কোর্স, (বি· টেক· ইন ফাইবার টেকনোলজি)। এই কোর্সটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে শুরু করা হয়েছে। এই কোর্সের মাধ্যমে ফাইবার টেকনোলজি, ওয়েট প্রসেসিং এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত শেখানো হয়।

এটি এক বছরের পুরো সময়ের কোর্স। থিওরিটিকাল এবং প্রাকটিকাল— দু' ধরনের শিক্ষারই ব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলে অধীত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে শেখানোর উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়। এই কোর্স পড়ানোর সময় জুট, কটন এবং উলেন মিলের কাজকর্ম দেখাশোনা এবং বিভিন্ন রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কাজকর্মের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও সম্যকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কারা ভর্তি হতে পারবেন

যেসব প্রার্থী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (জুট টেকনোলজি) পাশ করেছেন এবং স্নাতক স্তরে যাঁরা ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস সহ শতকরা ৫৫ নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন, তাঁরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। মোট আসন ১৫টি। কোর্সের জন্য টিউশন-ফি এক হাজার টাকা এবং পরীক্ষার-ফি ৮০ টাকা। টিউশন-ফি আগেভাগেই জমা দিতে হবে। এ ছাড়া ল্যাবরেটরি কশান ডিপোজিট দিতে হয় একশো টাকা। উপরন্তু লাইব্রেরি কশান ডিপোজিট আরও একশো টাকা জমা রাখতে হয়।

প্রতি বছর টার্ম শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসে। টার্ম শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি· টেক· পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

সিলেবাস

প্রথম পত্রে থাকে আর্ন ম্যানুফ্যাকচার। দ্বিতীয় পত্রে ফেবরিক ম্যানুফ্যাকচার। তৃতীয় পত্রে টেক্সটাইল প্লান্ট এঞ্জিনিয়ারিং। চতুর্থ পত্রে টেক্সটাইল সায়েন্স। পঞ্চম পত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট। প্রতিটি পত্রে একশো নম্বরের পরীক্ষা। দুটি অংশে বিভক্ত প্রথম অর্ধাংশ এবং দ্বিতীয় অর্ধাংশ। এ ছাড়া ষষ্ঠ পত্রে ইলেকটিভ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যাডভান্সড প্রসেসিং টেকনোলজি অব জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবারস, অ্যাডভান্সড কটন, কটন ব্লেন্ডস প্রসেসিং টেকনোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এঞ্জিনিয়ারিং, স্পেশ্যাল মেথডস অব টেক্সটাইল প্রসেসিং প্রভৃতি। এ ছাড়া প্রতিটি পেপারের উপর রয়েছে প্র্যাকটিকাল, প্রজেক্ট ওয়ার্ক এবং মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা।

ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকসে যারা বি· এসসি অনার্স পাশ করে এম এসসি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাননি, তাঁরা এখানে বি· টেক· কোর্স শেষ করে বম্বে, আই টি আই দিল্লি, মাদ্রাজ, বরোদা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম টেক কোর্স করার সুযোগ নিচ্ছেন এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে নিচ্ছেন। সেদিক থেকে বি টেক· কোর্সের চাহিদা বেড়েছে। আর এ-কারণেই এখন ভর্তির সময় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ভর্তির পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে অবজেকটিভ টাইপের। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকসের উপর প্রশ্ন থাকে। তা ছাড়া ইংরেজি এবং জেনারেল নলেজের ওপরও প্রশ্ন করা হয়।

বাদামওলা আর টুলু

শিশির কর

সমীর গোরক্ষপুরে থাকে। দিদির বাড়িতে এসেছে কলকাতায়। লোডশেডিং বলে গ্রীষ্মের দুপুরের পচা গরমে বিনা ফ্যানে মোটাসোটা সমীর আইঢাই করছিল। দিদি বলল, "এ আপদ কি সহজে যাবে? সারাদুপুরই এখন লোডশেডিং চলবে। গরমে ঘেমে মরার চেয়ে বরং একটু বেড়িয়ে আয়। কাছেই তো ভিক্টোরিয়া। বড় বড় গাছের ছায়ায় বসে চমৎকার বাতাস পাবি। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। বিকেলে ওখানে দারুণ হইচই ব্যাপার চলে। চলে যা ওখানে। এখান থেকে একটুখানি রাস্তা তো।"

দিদির কথায় ও যেন হাতে স্বর্গ পেল। এই গরম ওর আর সহ্য হচ্ছিল না। ও হাঁফিয়ে উঠছিল। কাল সারারাত ট্রেনে ঘুমোতে পারেনি। আজ খাওয়াদাওয়ার পর একটু লম্বা দেবে মনে করেছিল। কিন্তু এ কী আপদ। গরমে খালি ঘামছে। চোখের পাতা বুজবে কি? ও তখনই উঠে পড়ল। ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজার থেকে ভিক্টোরিয়া সামান্যই পথ। কপাট খুলে বাইরে পা বাড়িয়েছে, অমনি টুলু আব্দার ধরল, "মামা, আমি যাব।" ও একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত টুলুকে সঙ্গে নিতেই হল।

এখনও রোদের বেশ তেজ। সূর্য সবে পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। সমীর টুলুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল। যদুবাবুর বাজার পেরিয়ে ট্রাম-স্টপে এল। এসপ্ল্যানেডগামী একটা ট্রাম থামল। ট্রামে দু-চারজন যাত্রী। বাকি সব আসনই ফাঁকা। ওরা প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসল। একটু পরেই ট্রাম প্ল্যানেটোরিয়ামে পৌঁছল। ট্রাম থামল। বাঁ দিকের রাস্তাটা জনহীন। টুলু বড় ছটফটে ছেলে। ও মামার হাত ছেড়ে জোরে-জোরে ভিক্টোরিয়ার গেটে চলে গেল।

তখনও রোদের তেজ বেশ। তবে সূর্য পশ্চিমের দিকে ঢলতে শুরু করেছে। সমীর একটা বড় গাছের ছায়ায় বসল। গাছটা আকাশমণি, অর্থাৎ সোনাঝরা হবে। চারদিকে রোদ। তবুও বেশ বাতাস দিচ্ছে। ঘর্মাক্ত সমীর জামার বোতাম খুলে গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাল। টুলুকে বাদাম কিনে দিল। ও মহানন্দে তা খেতে লাগল। দেখতে-দেখতে রোদের তেজ কমে এল। বাতাসও আরও ঠাণ্ডা, আরও আরামের হয়ে উঠল। সমীরকে আর গাছতলায় ছায়ায় বসে থাকতে হল না। কোথাও আর রোদ রইল না। ও উঠে এসে সামনের সিমেন্ট-বাঁধানো বেঞ্চে বসল।

টুলু যেন বকলেস খোলা কুকুর। ও আনন্দে আটখানা। চারধার ছুটে বেড়ায়। কখনও দূরের ঝিলের ধারে, কখনও বাঁধানো খালের পাড়ে। সমীর ভয় পায়, যদি কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে। ও-ও পিছু-পিছু দৌড়য়। টুলু বারবার সেই বাদামওলাকে ধরে আনে, আর বলে, "মামা খাব।" সমীর তিন-চারবার বাদাম কিনে দেয়। বাদাম খাবার পরই ও কোথায় ছুটে পালায়। সমীর "টুলু, টুলু" করে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। টুলুর পেছনে ছুটে ও আর পারে না। ও

যখন দেখল টুলু জলের দিকে যায়নি, তখন আর কিছু বলল না।

সমীর বেঞ্চে বসে তন্ময় হয়ে চারপাশ দ্যাখে। আগে কোনওদিন ও এখানে এসে বসেনি। এসেছে আর পাঁচ-সাত মিনিট থেকে চলে গেছে। এ-জায়গাটা এত চমৎকার, এত আকর্ষক, কোনওদিন ওর মনে হয়নি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিঁড়ির সামনের সুন্দর সাদা পাথরের নুড়ির রাস্তা, ঝিলের শান-বাঁধানো পাড়ে রং-বেরঙের ফুলের বাহার, বেঞ্চে-বেঞ্চে অসংখ্য সুবেশ তরুণ-তরুণীর ভিড়, দূরের পুকুরের লাল শালুকের পাশে সাদা হাঁসের দল —ও দু' চোখ ভরে দ্যাখে, আর দ্যাখে। দেখে দেখে ওর যেন আশ মেটে না।

সমীরের আরও একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসার ইচ্ছে হল। অদূরে সবুজের কার্পেটটি যেন ওকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ও টুলুকে নিয়ে একটা ফুচকাওলার কাছে গিয়ে পেটপুরে ফুচকা খেল। তারপর ওই মাঠের মাঝবরাবর চলে গেল। নিরিবিলি দেখে মাঝখানে গিয়ে বসল। টুলুকেও পাশে বসাল। দুরন্ত টুলু বসতে চায় না। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। ওদিকে নরম সবুজ ঘাসের উপর সমীর দেহটা এলিয়ে দিল। বেশ বাতাসও দিচ্ছে। দূর দক্ষিণের সমুদ্র থেকে আসছে বাতাসের বন্যা। বেশ ঠাণ্ডাও। কালকের ট্রেন জার্নির ক্লান্তি। শরীর যেন অবশ হয়ে আসছিল। সমীর একটু একটু করে একেবারে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে টুলু আপন মনে ছোটাছুটি করছে।

কী কালঘুম সমীরকে পেয়ে বসে ছিল কে জানে? ওর যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়েছে। এতক্ষণ পেরিয়ে গেছে সমীর একটুও বুঝতে পারেনি। ও অকাতরে ঘুমিয়েছে। হয়তো নাকও ডাকিয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাল। ইলেকট্রনিক ঘড়ির রেডিয়াম দেওয়া কাঁটা দুটো জ্বলজ্বল করছিল। দ্যাখে, রাত আটটা বেজে গেছে। তখনই ওর টুলুর কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য, ও একটানা অঘোরে ঘুমোচ্ছে অথচ টুলু ওকে একবারও ডাকল না। ও গেল কোথায়? ও তো ঘুমিয়ে পড়ার ছেলে নয়,যা দুরন্ত। টুলুর জন্য ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। ডাকল "টুলু, টুলু", বলে। টুলুর দেখা নেই। সন্ধের আবছা-আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছিল, টুলু ছোটাছুটি করছে। এখন তো আর দেখা যাচ্ছে না। এখন অন্ধকারও গাঢ়। একটু দূরেও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ও পাগলের মতো সারা মাঠ দৌড়োদৌড়ি ফেলে দিল। টুলু, টুলু বলে সারা মাঠ মাত করে ফেলল। টুলুর তো দেখা নেই। ও তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, "টুলু, টুলু", টুলুর কোনও সাড়া নেই। সেই ডাক প্রতিধ্বনি হয় সারা মাঠে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না।

সমীর ছুটতে-ছুটতে ভিক্টোরিয়ার কাছে এল। সেখানে তখনও জমজমাট অবস্থা। নিয়ন আলোয় চারদিক ঝকমক করছে। ও ভিক্টোরিয়ার আশপাশ, পেছন তন্নতন্ন করে দেখল। কোথাও টুলুর দেখা নেই। ওর মনে হল টুলু যদি মাঠে কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে ওর মতো। অন্ধকারে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একটা ফুচকাওলাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে, তাকে দুটো টাকা দিয়ে তার হ্যারিকেনটা নিল। হ্যারিকেনের আলোয় সারা মাঠ খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথায় টুলু? চেঁচাতে-চেঁচাতে ওর গলা ধরে গেছে। ছুটতে-ছুটতে ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। টুলুর দেখা পেল না তবু।

সারা মাঠ, ভিক্টোরিয়ার চারপাশ, রাস্তা, সব খুঁজে পরিশ্রান্ত, বেদনার্ত সমীর যখন ফুচকাওলাকে হ্যারিকেনটা ফেরত দিতে এল, ও তখন কেঁদে ফেলল। "দিদিকে কী বলব।" বলতে বলতে ও হাউ-হাউ করে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে লাগল। সমীরের চারপাশে বেশ ভিড় জমে গেল। দুটো সেপাইও এল। ভিড়ের ভেতর থেকে এক জুতোপালিশওলা বলল, "হাম এক বাদামওলাকো সাথ এক বাচ্চা বাঙালি লেড়কাকো দেখা।"

সেপাই দুটো তাকে অনেক জেরা করল। কিন্তু সে এর বেশি কিছু বলতে পারল না।

নিরাশ সমীর অগ্যতা ভগ্নহৃদয়ে দিদির বাড়ির দিকে পা বাড়াল। ওদের ফেরার দেরি দেখে বাড়ির সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। সমীরকে একা দেখে দিদি বললেন, "টুলু কোথায়?"

সমীর কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "টুলু কোথায় হারিয়ে গেছে। কত খুঁজলাম। দেখতে পেলাম না।"

দিদি শিশুর মতো ককিয়ে কেঁদে উঠলেন, "আমি খোকার জন্য পায়েস করেছি। ও কাল থেকে পায়েস খাবে বলে বায়না করছে। তুই আমার এ কী সর্বনাশ করলি?"

টুলুর মায়ের কান্নায় নীচের তলার রবিনবাবু ছুটে এলেন। পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা ছুটে এল। রবিনবাবু টুলুকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন। তাঁর ছেলে সুমনের বন্ধু টুলু। সবাই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। ফুলের মতো ফুটফুটে এই ছেলেটা কোথায় গেল?

টুলুর বাবা জীবনবাবু সমীরকে বারবার জিজ্ঞেস করলেন, " ও জলের দিকে যায়নি তো?"

সমীর বলল, "না, ওকে জলের ধারে যেতে দেখিনি, তবে আমি একবার মাঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন কী হয়েছে বলতে পারব না।"

"সমীরের দিকে না চেয়ে জীবনবাবু নিজে নিজে বললেন, "কী অদ্ভুত লোক! ময়দানে গিয়ে আবার কেউ ঘুমোয়?"

সমীরকে সঙ্গে নিয়ে ওরা আবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এল। জীবনবাবু, রবিনবাবু, পাড়ার ক্লাবের দুজন ছেলে বিনয় ও রজত। টুলুর মা'ও সঙ্গে এলেন। টর্চ ফেলে-ফেলে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ওরা সারা মাঠ, ভিক্টোরিয়ার আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু টুলুর দেখা মিলল না। শেষে ওরা থানায় ডাইরি করে বাড়ি ফিরল। বিষণ্ণ মনে, ক্লান্ত পায়ে ওরা ফিরে এল। জীবনবাবু, সমীর, টুলুর মা ছাড়া সকলে যে-যার বাড়ি চলে গেল, ঘরে আলো জ্বালাই রইল। তিনটি মানুষ তিনটি ভিন্ন প্রাণীর মতো ঘরে বসে রইল। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন জীবনবাবু। কেঁদে-কেঁদে পরিশ্রান্ত সমীরের দিদি এক-একবার অস্ফুটস্বরে "টুলু-টুলু,"বলে উঠছেন। সমীর ঘাড় নিচু করে বসে-বসে ওর ঘুমের কী ভয়ঙ্কর খেসারত তা ভাবছে।

ভোরের আলো ফুটতেই জীবনবাবু সমীরকে নিয়ে ভিক্টোরিয়ায় এলেন। ভিক্টোরিয়ার সামনে শান-বাঁধানো খাল। পিছনের পুকুরে ও আশেপাশে যত জলাশয় ছিল জীবনবাবু সব ভাল করে দেখলেন। টুলু জলে পড়ে গেলে নিশ্চয়ই ভেসে উঠত। না, এবারও টুলুর দেখা মিলল না।

বিকেল হতে-না-হতেই জীবনবাবু আবার এলেন। সমীর ছাড়া রবিনবাবুও এবার সঙ্গে এলেন। কাল বিকেলে সমীর যেখানে-যেখানে বসেছে, যেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল, যার কাছে ফুচকা খেয়েছিল, সব ঘুরে-ঘুরে দেখাল। ফুচকাওলার টুলুর কথা মনে ছিল। ও বলল, "হ্যাঁ, এ-বাবুর সঙ্গে এক বাচ্চাও ফুচকা খেয়েছিল আমার কাছে।"

সমীর আগের দিনের সবাইকে পেল। পেল না শুধু সেই বাদামওলাকে। আশপাশের কেউ বাদামওলার কথা বলতে পারল না। সমীরের মনে হচ্ছিল বাদামওলাটা হয়তো টুলুর কিছু হদিস দিতে পারত। টুলু তো বারবার ওর কাছে ছুটে যাচ্ছিল। জীবনবাবুকে ও সে কথা বলল। জীবনবাবু থানায় গিয়ে বাদামওলার নামে ডাইরি করলেন। পরের দিনও ওরা এল সেই বাদামওলার খোঁজে। ওর দেখা মিলল না। কিন্তু অন্য কোনও ফেরিওলা বাদামওলার হদিস দিতে পারল না। ওর আস্তানা কোথায়, তাও কেউ বলতে পারল না।

দেখতে-দেখতে জীবনবাবুর সুখের সংসারে নেমে এল শোকের ছায়া। রোজ সকালে টুলুর স্কুল যাওয়ার সময় হলেই মা ডুকরে-ডুকরে কাঁদেন। কাঁদতে-কাঁদতে সুনন্দার সুন্দর চোখ দুটো ফুলে রাঙাজবার মতো হয়ে গেছে। জীবনবাবু রোজ অফিস থেকে ফেরার সময় টুলুর জন্য চকোলেট কিনে আনতেন। টুলু চকোলেট খুব ভালবাসত। পরে দু-একদিন ভুল করে চকোলেট এনেও ছিলেন। আজকাল আর আনেন না। এখন জীবনবাবু অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেছেন। হাসিখুশি প্রাণবন্ত মানুষটা এখন যেন যন্ত্রের পুতুল। তাঁর সব-কিছু এখন যন্ত্রচালিত কৃত্রিম মানুষের মতো। তিনি আর রক্তমাংসের মানুষ নন। দম-দেওয়া এক রোবট। টুলুহারা সংসারের জাঁতাকল এইভাবেই চলে। কয়েক মাসেই সুশ্রী সুনন্দা যেন কীরকম হয়ে গেলেন। উনি আর পরিপাটি করে চুল বাঁধেন না, পাউডার, স্নো, ক্রিম মাখেন না। অনুতপ্ত সমীর গোরক্ষপুরে ফিরে গেছে। ও খালি ভাবে, হায়! কী কাল ঘুম আমাকে পেয়েছিল। একবার ওর মনে হয়েছিল বাড়ি ফিরবে না, ট্রেনে মাথা দেবে। শেষ পর্যন্ত ফিরেই গেছে।

॥ ২ ॥

ওদিকে সেদিন সকলের অলক্ষ্যে বাদামওলার সঙ্গে টুলুর কেমন বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সমীর যখন তন্ময় হয়ে ভিক্টোরিয়ার শোভা, মানুষজন দেখছিল, ও তখন বারবার ছুটে গেছে বাদামওলার কাছে। টুলু যখনই গেছে তখনই বাদামওলা মুঠো-মুঠো বাদাম তুলে দিয়েছে টুলুর হাতে। টুলু খুশিতে ভরে গেছে। বাদাম যে ওর খুব প্রিয়। কিছুক্ষণ ছাড়া-ছাড়াই টুলু বাদামওলার কাছে ছুটে যায়। দেখতে-দেখতে সন্ধের কোলাহল কমে এল। ভিড়ও পাতলা হয়ে গেছে। বাদামওলার বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে আসছে। তবু টুলু বাদামওলার সঙ্গ ছাড়ে না। ওর সঙ্গের বাবুটারও দেখা নেই। বাদামওলা ওর মালপত্র গুছিয়ে মাথায় তুলে অন্যদিনের মতো এগিয়ে চলে। দেখে টুলুও ওর সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে। প্রথমে কিছু না বলে বাদামওলা নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল। টুলুও সঙ্গে-সঙ্গে চলে। খানিকটা পথ চলার পর বাদামওলা টুলুকে কোলে তুলে নিল। চারধার ভাল করে দেখল। যদি কেউ লক্ষ করে। না, কেউ এদিকে দেখছে না। মাথায় বাদামের ঝুড়ি, আর ডান কাঁখে টুলুকে নিয়ে ও চলল। টুলু খুবই হালকা। বাদামওলার কোনও অসুবিধাই হল না। টুলুর ওপর বাদামওলার কেমন লোভ হয়ে গেল। ভাবল, এই ফুটফুটে ছেলেটাকে যদি নিজের করে নিতে পারে তা হলে কত আনন্দেরই না হয়!

আশ্চর্য! টুলুও কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। একটুও আপত্তি তুলল না। বাদামওলা প্রথমে টুলুকে নিয়ে একটু দূরে নিরিবিলিতে বসল। অনেকক্ষণ দেখল, কেউ যদি টুলুর খোঁজ করে? কেউই আসে না টুলুর খোঁজে। আরও কিছুক্ষণ টুলুকে নিয়ে বসে থাকল। টুলুকে বাদাম দিল। তবুও কেউ আসে না। ও মাঠের ভেতরে আরও নিরিবিলিতে গেল। টুলুকে পাশে বসাল। ওর কচি-কচি নরম পা দুটো টিপে দিল। বলল, "খোকাবাবু, আমার সঙ্গে যাবে? তোমায় গঙ্গা দেখাব। নৌকা চড়াব। বাঘ দেখাব।"

বাদামওলার কথা শুনে টুলু খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, "সত্যি আমায় নৌকা চড়াবে? আমি কোনওদিন নৌকায় উঠিনি। কবে নৌকা চড়াবে? বাঘ দেখাবে?"

বাদামওলা বলল, "এই এখনই তোমায় নৌকা চড়াব। চলো, আমার সঙ্গে। বাঘও দেখাব। আমার দেশে বহুত শের আছে।"

টুলু ব্যস্ত হয়ে বলল, "চলো, আমাকে নিয়ে চলো। তোমার নৌকা আছে?"

বাদামওলা মাঠ পেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে ধীরে-ধীরে গঙ্গার দিকে এগোল টুলুকে নিয়ে। কখনও কাঁখে, কখনও হাত ধরে চলে টুলু বাদামওলার সঙ্গে। বদামওলা রোজ এ-পথেই গঙ্গা পার হয় বাড়ি ফেরার সময়। প্রতিদিন ভিক্টোরিয়ার ধারে বাদাম বেচে নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এ-পথেই বাসায় ফেরে। বাদামওলা থাকে হাওড়া টিকেপাড়ার এক বস্তিতে। একটা ছোট ঘরে ও একাই থাকে।

আজ বাদামওলা অন্যদিনের মতো জেটির কাছে নৌকায় উঠল না। ভিড় এড়ানোর জন্য চাঁদপাল ঘাটের ডান দিকের একটা ফাঁকা জায়গা থেকে নৌকায় উঠল। নৌকায় উঠে টুলুর কী আনন্দ! এর আগে কোনওদিন ও নৌকায় চাপেনি। নৌকায় ওঠার আনন্দে টুলু সব ভুলে গেল। ভুলে গেল মামার কথা। ভুলে গেল বাড়ির কথা। মায়ের বাবার কথাও। ও অবাক বিস্ময়ে দ্যাখে গঙ্গার জলরাশি। উপরের নক্ষত্রভরা আকাশ। মাঝে-মাঝে ঢেউ দিচ্ছে। নৌকা হেলছে-দুলছে। এত সুন্দর শোভা টুলু আগে যেন দ্যাখেনি। ওর মনে হচ্ছিল, ও বুঝি সিনেমা দেখছে। হেলতে-দুলতে এঁকে-বেঁকে গঙ্গার বুক চিরে নৌকা এগিয়ে চলল। টুলু তো আনন্দে অধীর। ও দু'চোখ ভরে দ্যাখে, শুধু দ্যাখে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা জাহাজ। আলোয় ঝলমল করছে সেটা। সেখান থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি বাজনা। ও বাদামওলাকে বলল, "আমাকে নিয়ে যাবে ওই জাহাজে?"

বাদামওলা বলল, "হঁ, খোকাবাবু, অন্যদিন যাব।" নৌকাটা বেশ দুলে উঠল। টুলু ভয় পেয়ে বাদামওলার কাছে সরে এল। বাদামওলা ওকে কোলে নিয়ে বসল। আশপাশ দিয়ে আরও দু-একটা নৌকা যাচ্ছিল। নৌকার ওপরে কেরোসিনের আলোটাই খালি অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে। তা দেখে টুলুর মনে হল, বুঝি গঙ্গা দিয়ে একটা আলো ভেসে যাচ্ছে। ও বাদামওলাকে বলল, "ওই আলোটা নিভে যাচ্ছে না?"

বাদামওলা ওর কথায় হেসে ফেলে বলল, "নিভবে কেন? আলোটা তো নৌকার ওপর আছে, আর নৌকা দরিয়া দিয়ে যাচ্ছে। বাতিতে তো জল লাগছে না।"

বাদামওলা হাজারিবাগ জেলার লোক। অনেক বছর এখানে আছে। ভাল বাংলা বলতে পারে। খেতির সময় দেশে যায়। বাকি সময় কলকাতায় বাদাম ফেরি করে। আগে হাওড়া-মাঠের ধারে বসত। ভাল বিক্রি হত না। তাই এখন রোজ দুপুরে ভিক্টোরিয়ায় চলে আসে। জোর রোজগার হয়। তবে বাসা বদলায়নি। সেই টিকেপাড়ার বস্তিতেই আছে।

গঙ্গা পেরিয়ে ওরা তেলকল ঘাটে এল। ঘাটের একটু দূরে নৌকা ভিড়ল। যাত্রী বাদামওলা আর টুলু। মাঝিরা এপারে থাকে। গঙ্গার ধারে নৌকা ভিড়িয়ে খোঁটায় নৌকা বেঁধে ওরা ঘাটে নামল। কাল সকালে আবার যাত্রী নিয়ে ওপারে যাবে। আজ রাতের মতো বিশ্রাম। এবার রান্না চাপাবে। খেয়েদেয়েই ঘুম।

টুলুকে নিয়ে বাদামওলা রাস্তায় উঠল। এদিকটা খুব নির্জন। তা ছাড়া রাতও হয়েছে। পথচারী নেই। কিন্তু বার্ন কম্পানি পেরিয়েই ওর খুব ভয় হচ্ছিল। এদিকটা তো একদম নির্জন নয়। দু-একটা চায়ের দোকান খোলা। থানাও কাছে। যদি কেউ সন্দেহ করে ওর সঙ্গে কেন এই ফুটফুটে বাঙালি ছেলেটা?

বাদামওলা মনে-মনে ভেবে নিল, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে এক বাবুর ছেলে। ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলেছে। তাই গঙ্গার ধারে বেড়াতে এনেছে। যাই হোক, কেউ বাদামওলাকে কোনও প্রশ্ন করল না। তবু সাবধানের মার নেই। ও রাস্তা দিয়ে না গিয়ে কোর্টের ভেতর দিয়ে গেল। এসব পথ ওর ভালভাবেই জানা। কতদিন চিনেবাদাম বেচতে এসেছে। কোর্টের ভিতর দিয়ে মিউনিসিপ্যাল

অফিসের সামনে পড়েই ও ঢুকে গেল চার্চ রোডে। এ-রাস্তাটা নিরিবিলি, লোকজন থাকেই না। রাতের বেলা দুটো মাঠের মাঝের পথটাও নির্জনই থাকে। তবে এ-রাস্তাটা আরও নির্জন। চার্চ রোড দিয়ে জিটি রোডে পড়েই বাদামওলা একটু ভড়কে গেল। ও-রাস্তাটায় খুব ভিড়। কী করবে ? ও সোজা বেলিলিয়াস রোডে না ঢুকে জিটি রোড ধরে বাঙালবাবুর পোলে এল। পোলের বাঁ দিকে সিঁড়ি দিয়ে বেলিলিয়াস রোডে নামল। এখান থেকে ওর বাসা একটুখানি। সোজা বাসায় গেল। বাসায় ঢুকে বাদামওলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টুলুকে ঘরে রেখে ও দোকান থেকে মিষ্টি, কচুরি কিনতে গেল। আসতে-আসতে টুলু বাদামওলার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই ওকে শুইয়ে রেখে ও কপাট বন্ধ করে গেল। খাবার এনে টুলুকে তুলল। টুলু কিন্তু কিছুই খেল না, বাদাম খেয়েই ওর পেট ভরে গিয়েছিল। বাদামওলা বিছানায় পরিষ্কার চাদর পেতে টুলুকে ভাল করে শুইয়ে দিল। ওর কচি-কচি নরম পা দুটো আস্তে-আস্তে টিপে দিল। ক্লান্ত টুলু অঘোরে ঘুমোতে লাগল।

টুলুর মিষ্টি মুখটার দিকে বাদামওলা অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। অগাধ ঘুমে টুলু অজ্ঞান। টুলুর মিষ্টি মুখটার দিকে চেয়ে বাদামওলার মনে হল, সকাল হলেই তো বস্তির বাসিন্দারা ওকে প্রশ্ন করবে, এ লেড়কা কে ? ও তখন কী বলবে ? টুলুর খবর শুনে সবাই ছুটে আসবে। ও কী জবাব দেবে ? ওদিকে ওর বাবা-মা-ও নিশ্চয়ই থানায় খবর দেবেন, খুঁজবেন, ও টুলুকে নিয়ে কী করবে ? জানাজানি হলে তো ওর জেল হবে।

বাদামওলা একবার ভাবল, টিকেপাড়া ফাঁড়িতে গিয়ে বলে আসবে যে, ও রাস্তায় একটা লেড়কাকে কাঁদতে-কাঁদতে ঘুরতে দেখে সঙ্গে এনেছে। ওর আবার মনে হল, এ খোকাবাবু ওকে এত ভালবাসে, এত সুন্দর লেড়কাকে ও হাতছাড়া করবে না, ও নিজের করে নেবে। এ তো ভগবানের দান। দেশে নিয়ে যাবে।

বাদামওলার চোখে ঘুম আসে না। ও বসে-বসে ভাবে, আর টুলুর দিকে দ্যাখে। ও মনস্থির করে ফেলল। আজ রাতের ট্রেনেই টুলুকে নিয়ে দেশে চলে যাবে। সকাল হলেই অনেক ঝামেলায় পড়বে। জবাব দিতে-দিতে শেষ হয়ে যাবে।

ওর বাক্সে যত টাকা-পয়সা ছিল সব বের করল। জামাকাপড় বদলাল। তারপর ঘুমন্ত টুলুকে কোলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। ও তখনও ঘুমোচ্ছে। রাতের অন্ধকারেই ও হেঁটে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। সিঁড়ি দিয়ে বাঙালবাবুর পোলে উঠে রেল কোয়ার্টারের মাঝের রাস্তা দিয়ে স্টেশনে পৌঁছল। নির্বিঘ্নেই এল স্টেশনে।

তখনও বম্বে মেল ছাড়তে কিছুক্ষণ দেরি। ও ওই ট্রেনে অনেকবার উঠেছে। এই ট্রেনেই ও বেশির ভাগ সময় দেশে যায়। বাদামওলা টুলুর মুখটা আড়াল করে সপ্রতিভ হয়ে বসল। মনে-মনে ভগবানের নাম জপে। না, চেকার আর এদিকে এল না। বিপদ কেটে গেল। বাদামওলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। টুলু ট্রেনে ঘুমিয়েই এল। বাদামওলা সবসময় সযত্নে ওর মুখটা আড়াল করে থাকে। পাছে কারও সন্দেহ হয়।

তখন মাঝরাত। ট্রেনটা হাজারিবাগ রেল-স্টেশনে থামল। বাদামওলা টুলুকে নিয়ে সেই রাতেই উঠল হাজারিবাগ টাউনের বাসে। স্টেশনের কোলাহলে টুলু জেগে উঠল। বাদামওলা বলল, "খোকা, এবার তোমাকে বাঘ দেখাব। জঙ্গলে এসে পড়েছি আমরা।" জলজ্যান্ত বাঘ দেখার আশায় টুলু রোমাঞ্চিত। বাঘ দেখার উৎসাহ ও উত্তেজনায় টুলু বিভোর। ও ভাবতেই পারে না জঙ্গলে ছাড়া অবস্থায় জীবন্ত বাঘকে ও দেখবে।

স্টেশন থেকে শহরের দিকে বাস যখন ছাড়ল, তখন রাত তিনটে। লাল বাস। বাসের দরজা বন্ধ করে কন্ডাক্টর হুইসল দিলেন। অন্ধকারের বুক চিরে নিস্তব্ধ নিঝুম রাস্তা দিয়ে বাস ছুটে চলল। দু'পাশে পাহাড়ে বিরাট-বিরাট গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দু-একটা জোনাকি ঝিকমিক করছে। আর গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে দূর আকাশের তারা। হাজারিবাগ শহরে যখন বাস পৌঁছল, তখনও অন্ধকার। পুব আকাশে সূর্য উঁকি দিতে শুরু করেছে। সামান্য আবছা আলো ফুটে উঠেছে। দেখতে-দেখতে দূরের সূর্যের লাল আভা আকাশ থেকে গাছে-গাছে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রকৃতির এমন বিচিত্র শোভা টুলু আর কোনওদিন দ্যাখেনি। ও বলে, "ও বাদামওলা, তোমার দেশ এত সুন্দর ! বাঘেরা কোথায় থাকে ?"

বাদামওলা বলল, "হুঁ, খোকাবাবু, তোমাকে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে যাব। খেতিতে নিয়ে যাব। দেখবে আরও সুন্দর-সুন্দর গাছ, জন্তু, পাখি— কত কী ! বাঘও !"

একটু পরে রিকশ বাদামওলার বাসার কাছে থামল। পিচের রাস্তায় ওরা রিকশ থেকে নামল। তারপর মাটির রাস্তায় খানিকটা হেঁটে বাদামওলার ঘর।

বাদামওলাকে দেখে ওর বউ-মেয়ে তো অবাক। এই তো ও মাসে খেতির কাজ সেরে বাদামওলা গেছে। এত তাড়াতাড়ি আবার এল কেন ? সঙ্গের বাচ্চাটাই বা কে ? ওরা কিছু বলার আগে বাদামওলা নিজেই বলল, "এই খোকাকে রাস্তা থেকে পেয়েছি। কী সুন্দর দেখতে ! একেবারে শ্রীকৃষ্ণ। ভাবলাম, ভগবানই নিয়ে এসেছেন। লেড়কার জন্য তো কত মানত করেছি। এতদিনে বুঝি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। তাই ওকে বাসায় নিয়ে এলাম।"

বাদামওলার বউ ছুটে এসে ওকে কোলে তুলে নিল। বলল, "সত্যিই তো এক খোদ দেবতা। কী চমৎকার মুখ, কী রং !"

বাড়ির দাওয়ায় টুলুকে বসিয়ে বাদামওলার বউ রান্নাঘরে চলে গেল। টুলুর জন্য একগ্লাস দুধ নিয়ে এল। একেবারে খাঁটি দুধ। একটু রাখতেই সর পড়ে গেল।

বাদামওলা বলল, "খোকাবাবু, খেয়ে নাও। একটু পরেই তোমায় বাদামের খেতিতে নিয়ে যাব। সেখান থেকে বাদাম তুলে দেব। দেখবে গাছের শেকড়ের সঙ্গে কেমন বাদাম ফলেছে। এ বাদাম বাজারের বাদামের চেয়ে কত মিষ্টি !"

দুধ খাবার পর টুলুকে নিয়ে বাদামওলা খেতিতে গেল। সঙ্গে মেয়ে সরস্বতী গেল। বাড়ির দক্ষিণে খানিকটা উঁচুনিচু জমিন। তারপর একটা ছোট নদী। হেঁটেই সে নদী পার হওয়া যায়। নদীর পর লম্বা মাঠ। একেবারে দিগন্তবিস্তৃত। এত বিশাল মাঠ। মনে হয়, মাঠের একদিক যেন নীল আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। আর এক দিকে ঘন জঙ্গল। ওই মাঠের একটা ছোট্ট টুকরো জমিন বাদামওলার। চারধারে আল দিয়ে ঘেরা, এরকম অসংখ্য আল দিয়ে মাঠের জমিন ভাগ করা। অন্তত বিশটা ভাগ। সবই আলাদা-আলাদা লোকের।

খেতিতে এসে বাদামওলা বলল, "দ্যাখো খোকাবাবু, কত বাদামগাছ। তোমার যত খুশি খাও। সবই তোমার জন্য।"

টুলু অবাক বিস্ময়ে দু' চোখ ভরে সব দ্যাখে। খেতে নেমে ও বাদামগাছগুলোয় হাত দিয়ে দ্যাখে। অনেকক্ষণ দেখেও বাদাম খুঁজে পায় না। বাদামওলা আর সরস্বতী ওর মনের কথা বুঝতে পারে। সরস্বতী তো খিলখিল করে হেসে ওঠে। বাদামওলা এগিয়ে এসে একটা গাছ টেনে মাটি থেকে উপড়ায়। সেটা টুলুর হাতে দিয়ে বলে, "খোকাবাবু, তুমি বাদাম খুঁজে পাচ্ছ না। এই দ্যাখো বাদাম। কত বাদাম। তোমায় বলেছি, বাদাম শেকড়ের কাছে থাকে। গাছ না তুললে কী করে বাদাম মিলবে।"

টুলু একটা বাদাম ভেঙে মুখে দিল। সত্যি, এ বাদাম কত

রসালো। কত মিষ্টি। কী চমৎকার স্বাদ!

টুলু বাদাম খেয়ে বলল, "এ বাদামগুলো কী মিষ্টি! এত গাছ সব তোমার?"

বাদামওলা বলল, "হুঁ, খোকাবাবু, তুমি রোজ-রোজ খাবে। যত ইচ্ছে খাবে।"

পাশের খেতে উঁচু-নিচু অড়হর কড়াইয়ের গাছ। টুলু সেদিকে তাকিয়ে বাদামওলাকে বলল, "ওগুলো কী গাছ?"

বাদামওলা, "অড়হর। আজ ভাতের সঙ্গে এই অড়হর ডাল খাবে।" এই বিশাল মাঠের অসংখ্য খেতি নানা সবজিতে ভরা। মনে হয়, একটা সুবিশাল সবুজ কার্পেট বিছানো। দূরের জঙ্গলের ঘন সবুজ গাছগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত। টুলু বিস্ময়ভরা বিস্ফারিত চোখে তা দ্যাখে। এত সবুজ, এত সুন্দর, এত গাছের সমারোহ ও কোনওদিন দ্যাখেনি।

এর পরের খেতে ফলেছিল অসংখ্য কড়াইশুঁটি। ছোট-ছোট গাছে, ঠিক বাদামগাছের মতোই। মুঠো-মুঠো কড়াইগুলি কে যেন বেঁধে রেখেছে। টুলু লাফিয়ে মাঠে নেমে তা দ্যাখে। রসালো শুঁটিগুলো ও টিপে-টিপে পরখ করে ভেতরে সত্যিই কড়াই আছে কি না। একটা গাছে তো পাতার চেয়ে শুঁটির সংখ্যা বেশি। ও-খেতের চাষি তখন জমিতে জল দিচ্ছিল। ও টুলুকে একমুঠো কড়াই দিল। কচি-কচি শুঁটিগুলো খেতে খুব মিষ্টি লাগল। টুলু শুঁটি খেতে-খেতে বাদামওলাকে বলল, "এটা গাছে ফলে আর ওটা মাটির নীচে কেন?"

এই বলে বাদামখেতের দিকে আঙুল দিল। বাদামওলা হাসতে-হাসতে বলল, "এ কেউ বলতে পারে না, খোকাবাবু, এ ভগবানের ইচ্ছা।"

এর পরের খেতেই হয়েছে তাজা-তাজা মুলো গাছ। টুলু শুঁটি খেতে খেতে মুলোখেতে নেমে গেল। শিশিরভেজা সজীব সবুজ পাতাগুলোতে হাত দিয়ে বলল, "এগুলো কী গাছ?"

বাদামওলা বলল "মুলা গাছ।"

টুলু বলল, "কই, গাছে মুলো নেই তো?"

বাদামওলা বলল, "মুলো তো মাটির তলায় হয়, ঠিক বাদামের মতোই। এই দ্যাখো," বলে বাদামওলা একটা গাছ তুলে দেখাল। শিকড়ের সঙ্গে একটা সাদা ধবধবে মুলো ফলেছে।

টুলু বাদামওলার কাছ থেকে মুলোটা নিয়ে দ্যাখে। তারপর সেটা দূরের একটা খেতে ছুঁড়ে দিল। সরস্বতী সেটা তুলে খেতে লাগল।

টুলু বলল, "কাঁচা মুলো আবার কেউ খায় নাকি?"

"হুঁ, খোকাবাবু। এ খেতে খুব ভাল।" এই বলে বাদামওলা সরস্বতীর কাছ থেকে মুলোটা নিয়ে একটা কামড় দিল। এর পাশের খেতিটা ছিল অনেক বড়। শুঁটি গাছের মতো অনেক গাছ হয়েছে। বাদামওলা বলল, "এটা আলুর খেত। আলুও মুলোর মতো মাটির ভেতরে শেকড়ের কাছে ফলে।"

টুলু বলল, "কই, দেখি।"

বাদামওলা একটা গাছের গোড়া খুঁড়ে দেখাল কেমন ছোট-ছোট আলু ফলেছে। টুলু হাত দিয়ে সেগুলো দেখল।

পরের খেতেও ঠিক আলুগাছের মতো অসংখ্য গাছ। এ-গাছে সাদা-সাদা অসংখ্য ফুল। আলুর মতো কিছু ফলও ফলেছে। কোনওটা সাদা, লালও আছে। টুলু একে আলুগাছই ভেবেছিল। খেতিতে নেমে বলল, "এ আলুগুলো গাছের ওপরে হয়েছে তো।"

বাদামওলা বলল, "না, খোকাবাবু। এ বিলাতি বেগুন, আলু নয়।"

সরস্বতী একটা লাল টকটকে টম্যাটো ছিঁড়ে এনে টুলুকে দিল। টুলু অনেকক্ষণ ধরে সেটা নাড়াচাড়া করল। টিপেটিপে দেখল। তারপর কী মনে হল, সেটা দূরে ছুঁড়ে দিল। সরস্বতী আবার ছুটে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনল।

পাশের খেতটা ছোট-ছোট হলদে ফুলে ভরে ছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, একটা বুঝি হলুদ রঙের চাদর বিছানো। টুলু ছুটে সেই হলুদ ফুলের বনে নেমে পড়ল। বাদামওলা তাড়াতাড়ি টুলুর হাত ধরে তুলল। বলল, "খোকাবাবু, খেতি নষ্ট হয়ে যাবে। উঠে এসো।"

টুলু বলল, "কত ফুল, হলুদ ফুলে লাল-হলুদ প্রজাপতি বসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। কী সুন্দর! আমাকে যেতে দাও। আমি একটা প্রজাপতি ধরব।"

বাদামওলা বলল, "খোকাবাবু, হাতে ওদের ধরা যাবে না। উড়ে যাবে। কাল ধরে দেব। সরস্বতীর একটা ফাঁস আছে। তাতে করে ধরতে হবে।"

পরের খেতটা ছিল খুব বড় বেগুনের খেত। তাজা-তাজা গাছে অসংখ্য বেগুন ফলে আছে। বিরাট-বিরাট সাদা-সাদা বেগুন। এত বড় বেগুন টুলু কোনওদিন দ্যাখেনি। ও দু'হাতেও এক-একটা বেগুন মুঠো করতে পারে না। ও বলে উঠল, "যেন একটা ফুটবল।"

বাদামওলা বলল, "খোকাবাবু, এ বেনারসি বেগুন, একেবারে মাখনের মতো খেতে।"

এর পরেই ফুলকপি আর বাঁধাকপির খেত। সবে ফুল এসেছে। বাঁধাকপিগুলোও তেমন বড় হয়নি। এই খেতের আল দিয়ে ওরা ঢুকল শালগম, গাজর, বিট আর ওলকপির খেতে। একটা বিরাট খেতের চারকোণে চার রকম গাছ রোয়া হয়েছে। প্রথমেই ওলকপি। তারপর জল দেবার কাঁচা নালা। ওপাশে একবারে গাজর, অন্যপাশে বিট। আর শালগম বসানো হয়েছে ওলকপির পাশে এক লটে। সরস্বতী একটা লাল গাজর তুলে মুখে দিল। টুলুকে বলল, "খাবে? বহুত মিঠা।" টুলু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল।

দেখতে-দেখতে এই বিশাল প্রান্তরের শেষ প্রান্তে ওরা এসে পড়েছে। খেতের শেষ প্রান্তে অসংখ্য পেঁপে গাছ। অনেকগুলো বড়-বড় ঘন সবুজ পেঁপে ফলেছে। এর পরই খানিকটা উঁচু-নিচু পতিত জমি। তারপর ঘন জঙ্গল। দূরের পাহাড়ের কোল পর্যন্ত।

টুলু বাদামওয়ালাকে বলল, "এই জঙ্গলে আমাকে নিয়ে চলো, আমি দেখব।"

বাদামওলা বলল, "না, খোকাবাবু, ওই জঙ্গলে যায় না। ওতে বাঘ আছে। নানা জানোয়ার আছে। ওখানে যাওয়া ভীষণ কষ্টের।

বিপদের।"

বাঘের কথা শুনে টুলু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, "ওখানে চলো না। আমি বাঘ দেখব। তুমি তো আমাকে বাঘ দেখাতেই এনেছ।"

বাদামওলা বলল, "হুঁ, খোকাবাবু, তোমাকে জরুর বাঘ দেখাব। এখানে নয়, আরও বড় জঙ্গলে যাব। আজ নয়। অন্যদিন। আজ সকলের ভুক লেগেছে। ঘর যাই চলো।"

যেতে-যেতে ঘুরতে-ঘুরতে বেশ বেলা হয়েছে। রোদও বেশ চড়া। বাদামওলা টুলুকে কাঁধে তুলে নিল। সরস্বতী ছুটে-ছুটে ঘরের দিকে চলল।

বাড়ি পৌঁছতে বাদামওলার বউ খুব রাগারাগি করল। বলল, "এত দেরি করলে, আমি তো আজ খোকার জন্য ক্ষীর বানিয়েছি। ইতিমধ্যে সরস্বতী ফিরেছে। একগাদা সবজি ও কখন যে কোঁচড়ে করে এনেছে, সেগুলো দাওয়ায় পড়ে ছিল।

বাদামওলা বউকে বলল, "খোকাবাবুর খিদে পেয়েছে। অনেকক্ষণ ঘুরেছে। ওকে আগে খেতে দাও।"

বাদামওলার বউ টুলুকে এক বাটি ক্ষীর খেতে দিল। টুলু প্রথমে একটু মুখে দিল। ওর খুব ভাল লাগল। ও জিব দিয়ে চেটে-চেটে সব খেয়ে নিল।

খাওয়ার পর টুলুকে কুয়োতলায় নিয়ে গেল বাদামওয়ালা চান করাতে। কুয়োর জলে চান করতে টুলু খুব মজা পেল। চিরকাল জানলা-দরজা বন্ধ করে বাথরুমের বন্ধ ঘরে চান করেছে, খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় চানের এত মজা ও কোনওদিন পায়নি। গায়ে রোদ এসে পড়ছে। পাশের পেয়ারা গাছে অসংখ্য ফল ফলেছে। পুবের গাছটা থেকে এক-একটা পাখি মাঝে-মাঝে ডেকে উঠছে। টুলুর কাছে ও একেবারে নতুন। এক অনাস্বাদিত আনন্দে ও বিভোর।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠ ছেড়ে আসার পর থেকে টুলু নতুন নেশায় বুঁদ ছিল। গঙ্গায় নৌকা চাপা, সবুজের পর সবুজ খেত, জঙ্গল—সবই তার কাছে নতুন। তার ওপর বাঘ দেখার আশা ওকে একেবারে তো সম্মোহন করে রেখেছে। বাড়ির কথা ভুলেই ছিল এতক্ষণ। চানের পর এবার কিন্তু খেতে বসে মায়ের কথা মনে পড়ল। রোজ সকালে চানের পর মা আদর করে কোলে বসিয়ে ওকে খাওয়াতেন। দুধ দিয়ে ভাত মেখে মুখে পুরে দিতেন। আজ খেতে বসে টুলুর মায়ের জন্য মন কেমন করে উঠল। বাড়ির কথা, বাবার কথা মনে পড়ল। বাদামওলার বউ ভাতের থালা মুখের সামনে দিতেই ও "মা, মা" বলে ককিয়ে কেঁদে উঠল। সে কান্না আর থামে না। টুলু কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। ও বারবার বলতে থাকে, "আমার মা কোথায়? আমি মায়ের কাছে যাব। আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো।" টুলুর কপোল দিয়ে অবিশ্রাম জল গড়ায়। ও কারও কথা শোনে না। "মা, মা" বলে খালি কাঁদে। কেঁদে-কেঁদে ওর চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। ওর আর খাওয়া হল না। বাদামওলা, বাদামওলার বউ, সরস্বতী—কারও কথা শোনে না। শুধু "মা, মা" বলে কেঁদে যায়। বাদামওলা ওকে বলল, "খোকাবাবু, তোমাকে বাঘ দেখাব। জলদি খেয়ে নাও। বাঘ দেখিয়ে তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব।"

কিন্তু কিছুতেই টুলুর ভ্রুক্ষেপ নেই। ও "মা, মা" বলে কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। বাদামওলা টুলুকে নিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল। ওর আর খাওয়া হল না। টুলু বেশ খানিকক্ষণ ঘুমোল। ওকে ভোলাবার জন্য বাদামওলা জঙ্গলে বাঘ দেখাতে নিয়ে যাবে ঠিক করল।

রোজ দুপুরের খাওয়ার পর বাদামওলা একটু ঘুমোয়। আজ আর ঘুম এল না। চিন্তায় ও খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে ছটফট করে। আজ আর চোখের পাতা এক হল না। ও ভাবল, খোকাবাবুকে নতুন-নতুন জিনিস দেখিয়ে নেশায় রাখতে হবে। বাড়ির কথা ভোলাতে হলে নতুন-নতুন জিনিস দেখাতে হবে রোজ-রোজ। বাদামওলার বাড়ির কাছে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী। হাঁটুজল। গোরুর গাড়ি, মানুষজন, গোরু, মোষ—সব পার হয় হেঁটে-হেঁটে। বাদামওলা ঠিক করল, খোকাবাবুকে আজ ওই নদীতে নিয়ে যাবে।

টুলু ঘুম থেকে উঠলে বাদামওলা ওকে বলল, "খোকাবাবু, খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট সুন্দর নদী আছে। দেখতে যাবে?"

নদীর কথা শুনে টুলু আনন্দে আটখানা। ও তখনই বলল, "হাঁ, যাব।"

বাদামওলা তখন এক গ্লাস দুধ এনে ওকে বলল, "এটা খেয়ে নাও, তবে যাব।"

এবার আর টুলু আপত্তি করল না। নদীতে যাওয়ার কথা শুনে ও তাড়াতাড়ি গ্লাসে চুমুক দিয়ে দিল। দুধ খাবার পর বাদামওলা টুলুকে নদী দেখাতে নিয়ে গেল। একটা সরু পাহাড়ি নদী। তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। বাদামওলা টুলুকে কোলে নিয়ে নদী পার হল। এর আগে কখনও টুলু হেঁটে নদী পার হওয়া দ্যাখেনি। ওর খুব মজা লাগল। বাদামওলার কোল থেকে পা দিয়ে নদীর জল নাড়াতে লাগল। ওর বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গেল। আবার আনন্দে হাসিখুশিতে ভরে উঠল। কখনও হাত দিয়ে, কখনও পা দিয়ে নদীর জলে খেলা করতে লাগল।

বিকেল, সন্ধেটা বেশ হাসিখুশিতে কাটল। কিন্তু রাতে খাবার সময় আবার ওর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। খেতে বসে ফের "মা, মা" বলে কাঁদতে লাগল। রাতেও তাকে কিছু খাওয়ানো গেল না। কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাদামওলার বউ বলল, "লেড়কাকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে এসো। মায়ের জন্য কেঁদে-কেঁদে না খেয়ে ও তো মরে যাবে।"

বাদামওলা বলল, "দু-চারদিন গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়াও মাত। ও লেড়কার বাড়ি কি আমি চিনি? তা ছাড়া এখন গেলে পুলিশ আমাকে পাকড়াবে।"

পুলিশের কথা শুনে বাদামওলার বউ ভয়ে শিউরে উঠল। আর কিছু বলল না।

সকালে উঠে টুলু যখন বাদামওলার সঙ্গে খেতিতে গেল, তখন ও আবার আনন্দে ভরপুর। আপন মনে খেতির পর খেতি ছুটে বেড়ায়। ফড়িং ধরতে ছুটে চলে যায় সেই দূরের জঙ্গলের কাছে। তখন ও একবারও বলে না মায়ের কথা। এ যেন এক অন্য টুলু। কিন্তু দুপুরে খেতে বসেই টুলু কাঁদে মায়ের জন্য। কিছুতেই খায় না। "মা, মা" বলে কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। এই টুলু বিকেলে আবার যখন জঙ্গলে, নদীতে বেড়াতে যায়, তখন সে খুশিতে মশগুল। প্রকৃতিকে এত নিবিড়ভাবে ও কোনওদিন পায়নি। এত কাছ থেকে প্রকৃতিকে ও কোনওদিন দ্যাখেনি। ঘন সবুজ গাছের বন, ছোট্ট পাহাড়ি নদী, মাঠে মাঠে ফসল—ওর মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়। সন্ধের পর ঘরে ফিরে রাতের খাবার দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। খেতে বসেই মায়ের জন্য মন কেমন করে। কিছুতেই কিছু খাওয়ানো যায় না। কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

টুলুকে বাড়ির কথা, মায়ের কথা ভোলাবার জন্য বাদামওলা নানা গল্প করে। বাঘ, শুয়োর, নেকড়ের গল্প। কতবার এই গাঁয়ে এসে বাঘ, শুয়োর, নেকড়েরা বাছুর ধরে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। একবার একটা বাঘ খেতিতে এসে একজন লোককে থাবা মেরে ফেলে দেয়। সে আর বাঁচে না। এমনি কত গল্প বলে বাদামওলা। শেষে একদিন বাদামওলা টুলুকে জঙ্গলে নিয়ে গেল বাঘ দেখাতে।

হাজারিবাগের ন্যাশনাল ফরেস্টের গাড়িতে বাদামওলা আগে থেকে সিট রিজার্ভ করে রাখল। রিকশয় শহরের বনবিভাগের অফিসে গেল টুলুকে নিয়ে। ওখান থেকে জঙ্গলে বাঘ দেখানোর

গাড়ি ছাড়ে। আগে থেকে সিট বুক করায় বসার জায়গাটা ভালই পেয়েছিল। একেবারে সামনের আসন। শহর থেকে জঙ্গলের পথে গাড়িটা এগোল। ন্যাশনাল ফরেস্টের গেটের মুখে চারজন দর্শক অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের গাড়িতে তুলে জঙ্গলে সার্চলাইট ফেলতে-ফেলতে গাড়িটা এগিয়ে চলল। খানিকটা যাওয়ার পরই হরিণের বাগান। সার্চলাইটের আলোয় তিন-চারটে হরিণকে খেলা করতে দেখা গেল। সুন্দর ফুটফুটে হরিণদের দেখে টুলু বেজায় খুশি। ও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "কী সুন্দর!"

গাড়িতে একটা বাঙালি পরিবার ছিল। তাদের মধ্যে একজন মহিলা বললেন, "আরে, ছেলেটা তো দেখছি বাঙালি।"

বাদামওলা ভয় পেয়ে গেল। কথা চাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হুঁ, শের দেখার জন্য খোকা আমার সঙ্গে এসেছে।"

এঁকে-বেঁকে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে আবার গাড়ি এগিয়ে চলল সার্চলাইট ফেলতে-ফেলতে। হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন চালক। গাইড সকলকে উত্তরের জঙ্গলের দিকে দেখতে বললেন। সার্চলাইটের তীব্র আলোয় দেখা গেল বেশ খানিকটা দূরে একটা জলাশয়ের ধারে দুটো শম্বর দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো জল খেতে এসেছে। সার্চলাইট ফেলে-ফেলে বনবিভাগের গাড়ি সারা জঙ্গল ছুটে বেড়াল। এক জায়গায় কয়েকটা খরগোশকে খেলা করতে দেখা গেল। একবার দেখা গেল একটা বুনো বেড়ালকে ছুটে বেড়াতে। তিন-চারবার দেখা গেল শিয়াল। বনবেড়ালও দেখা গেল। কিন্তু দেখা গেল না বাঘ। সারা জঙ্গল তীব্র সার্চলাইটে তন্ন-তন্ন খুঁজেও কোথাও বাঘ দেখা গেল না। সকলে বাঘ দেখতে উদগ্রীব। টুলু তো একবারও চোখের পাতা ফেলে না। দু'চোখ মেলে দ্যাখে কোথায় বাঘ? অনেক ঘুরে কোথাও বাঘের দেখা মিলল না। অবশেষে গাইড বলল, "আজকে কোনও স্পটেই বাঘ আসেনি। এই জঙ্গলে বাঘের সব ক'টা স্পটই ঘুরে-ঘুরে দেখলাম। কিন্তু বাঘের দেখা মিলল না। এখন আপনারা শেষ চেষ্টা করতে পারেন অবজারভেটরিতে বসে। আপনাদের এখানে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। দু'ঘণ্টা পর পরের গাড়িতে আপনারা ফিরবেন। এখানে গার্ড আছে। ওদের আমি বলে যাচ্ছি।"

এই গভীর জঙ্গলে রাতে দু' ঘণ্টা অবজারভেটরিতে বসে থাকতে কেউই রাজি হল না। টুলু কিন্তু নাছোড়বান্দা। বাঘ না দেখে ও ছাড়বে না। অগত্যা বাদামওলা টুলুকে নিয়ে অবজারভেটরিতে রয়ে গেল। অন্যরা গাড়িতে শহরে ফিরে গেল।

টুলুকে নিয়ে বাদামওলা অবজারভেটরিতে উঠল। ওঠার আগে বাদামওলা গার্ডের কাছ থেকে খানিকটা খইনি নিল। উঁচুতে উঠে ওরা অদূরের একটা জলাশয়ের দিকে চেয়ে থাকল। গার্ডের কাছ থেকে বাদামওলা একটা বড় টর্চ এনেছিল। সেটা থেকে যেখানে আলো ফেলল, এটাই জঙ্গলের সবচেয়ে ভাল স্পট। ওখানে একবার-না-একবার বাঘ আসবেই। বিশেষ করে বেশি রাতে। ওরা অপলক চোখে সেদিকে চেয়ে রইল। বসে থাকতে-থাকতে বাদামওলার চোখে ঘুম আসে। মাঝে-মাঝে ও ঢলে পড়ে। টুলুর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ও যে বাঘ দেখার জন্য রোমাঞ্চিত। একটা শিহরন যেন ওকে আবিষ্ট করে ফেলেছে। ও যে বাঘ দেখার উত্তেজনায় অধীর। ওর একটুও ক্লান্তি নেই। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূরের জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ ওর মনে হল, জলের ধারে কী যেন নড়ছে। ও সেদিকে টর্চের আলো ফেলল। ভাল করে চোখ মেলে টুলু দেখল। সত্যিই বাঘ-ই তো! একটা নয়, দু-দুটো বাঘ! ও আনন্দে উত্তেজনায় "বাঘ, বাঘ" বলে চিৎকার করে উঠল। এক অনাস্বাদিত আনন্দে ওর সারা শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। লোমগুলো যেন ঝাঁটাকাঠির মতো শক্ত হয়ে খাড়া হয়ে উঠল।

বাদামওলাও চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল। জঙ্গলের দিকে

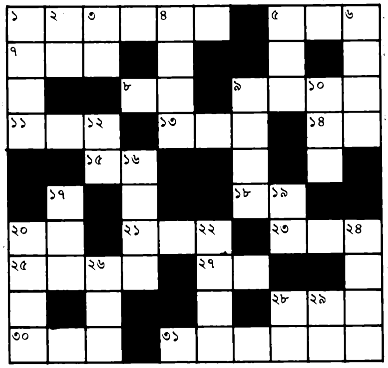

সংকেত : পাশাপাশি : (১) গ্রহান্তরের খবর জানতেই এর আবিষ্কার। (৫) বিখ্যাত বিমানঘাঁটি। (৭) ভিড়। (৮) স্থির, নিশ্চল। (৯) পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। (১১) পুত্রকন্যা। (১৩) মজা, কৌতুক। (১৪) 'বসে আছি—কূলে/একেলা জগৎ ভুলে'। (১৫) ছোট হলেও দু'জনের মধ্যে এর নামই আগে আসে। (১৮) দড়ি। (২০) এমন ফলই ভাল, তবে সব ফল নয়। (২১) মালা। (২৩) সংগীতের রাগিণীবিশেষ। (২৫) ঝরনা বা নদীর স্রোতের শব্দ। (২৭) গ্রীষ্মের ফল। (২৮) দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। (৩০) লোকের সঙ্গে যে সহজে মিশতে পারে না। (৩১) সকালে ঘুম থেকে উঠেই এটা চাই।

উপর-নীচ : (১) আসর, বৈঠক। (২) রোজ বসে না, বসে বিশেষ-বিশেষ দিনে। (৩) বধির। (৪) এমন মানুষও আছে, পাখিও আছে। (৫) বিখ্যাত খাল। (৬) দক্ষিণ-ভারতের নদী। (৯) জাঁকজমক। (১০) ইনি একাধারে রাজা ও ঋষি ছিলেন। (১২) বিদর্ভরাজ। (১৬) নদী ও সময় যেমন। (১৭) রূপ আছে গুণ নেই এমন ফল। (১৯) আগুনের যা কারও-কারও মাথায় ওঠে। (২০) রান্নাঘর। (২২) পশ্চিমবঙ্গের এক পার্বত্য শহর। (২৪) এখানে পথিক-পর্যটকের পিপাসা মেটে। (২৬) ভূসম্পত্তি। (২৮) বর্জন। (২৯) উষ্ণতা।

গত সংখ্যার সমাধান

ম্যা	রা	থ	ন			রি	ম	ঝি	ম
কা			মা	ক	ড়	সা			গ
ও	ল	ন্দা	জ			লা	খে	রা	জ
	ঘু			খ	গ			জ	
বে	গু	নি		ব	ন্ধ		বি	ধা	ন
শু	রু		প	র	ক	লা		নী	র
মা		তো	য়			গ	ঙ্গা		প
র	স		ম	ল	মা	স		ই	তি
	ত	দ	ন্ত			ই	শা	রা	
মা	ত	লা					মা	ন	ত

রঞ্জন

তাকাল। সত্যিই বাঘই তো! বাদামওলা আগেও কয়েকবার এ-জঙ্গলে এসেছে বাঘ দেখতে। কোনওদিন বাঘ দ্যাখেন। ওর একটা ধারণা হচ্ছিল এ-জঙ্গলে শের নেই। থাকলেও দেখা যায় না। আজ ও-ও বাঘ দেখল। একটা নয়, একেবারে দু-দুটো একসঙ্গে।

টুলুর চিৎকারে গার্ড দু'জনও উপরে উঠে এল। তারাও সবিস্ময়ে বাঘেদের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ ওরা জলের ধারে ছিল। তারপর আবার গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিল।

বাঘ দেখার পর একটা অদ্ভুত শিহরন, একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ টুলুকে পেয়ে বসল। বাঘ দেখার পর টুলুর জীবনস্রোতে যেন নতুনের জোয়ার এল। একটা অভূতপূর্ব তৃপ্তি, অনুভূতিতে ও মশগুল থাকে। ওর জীবনের আনন্দের পাত্র বুঝি কানায়-কানায় ভরে গেছে।

বাঘ দেখে ফিরে টুলু ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাতেও ওর চোখের পাতা পড়েনি। সেই উত্তেজনায় অধীর সারারাত ওর কেটেছে অপলক চোখে। তাই ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বেলা হয়ে গেল।

বাদামওলা আজও টুলুকে কুয়োতলায় নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে দিল। তারপর খাবার দিল বাদামওলার বউ। দুধ, ডিম, সবজি ভাত। আশ্চর্য! আজকের টুলু যেন অন্যজন। বাঘ দেখার শিহরনে, উত্তেজনায় ও যেন এখনও আবিষ্ট হয়ে আছে। আজ খাবার সময় টুলু একটুও কাঁদল না। মা, মা করল না। ভাত, সবজি, ডিম, দুধ সবকিছু হালুম-হুলুম করে খেয়ে নিল। বাদামওলা আজ খুব খুশি। বলল, "খোকাবাবু, আবার তোমায় বাঘ দেখাব।"

টুলু বলল, "সত্যি? আবার বাঘ দেখাবে? আমি আবার বাঘ দেখতে যাব। জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে খুঁজব। আমার খুব মজা লাগে জঙ্গলে ঘুরতে।"

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও টুলু বারবার উত্তেজনায় বাঘ, বাঘ বলে চেঁচাল।

॥ ৩ ॥

টুলুকে আনার পর বাদামওলার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এল। প্রতি বছর গরমের সময় বাদামওলা কলকাতা চলে আসত হাজারিবাগের গ্রাম থেকে। পথে-পথে বিক্রি করত বাদাম। দেশে বউ, মেয়ে, জমি, গোরু-বাছুর ফেলে ও প্রতিবার একবার কলকাতায় আসতই। কলকাতা ওকে টানত। একবার শুখার সময় দেশোয়ালিদের সঙ্গে কলকাতা এসেছিল। সেবার থেকে ওকে পেয়ে বসে কলকাতার নেশা। ভাল ফলন হলে, দরকার না হলেও ও বছরে একবার কলকাতা আসতই। ওর খেতিতে কখনও আখ হয়, কখনও সবজি হয়, ধানও ফলে কিছু-কিছু। ওর খেতির লাগোয়া জঙ্গল। সেই জঙ্গলে বড়-বড় শাল গাছ আছে। আছে আরও অনেক গাছ—নানা জাতের। ওই জঙ্গলে নেকড়েরও উৎপাত কম নয়। একবার নেকড়ে এসে বাদামওলার খেতি থেকে একটা গোরু ধরে নিয়ে যায়। মাঝে কুয়োতলাতেও নেকড়ে আসে জলের খোঁজে। যখন গরম পড়ে বা প্রচণ্ড শুখা চলে, আকাশে একফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না, তখন এ-তল্লাট থেকে লোকেরা রুজি-রোজগারের জন্য কলকাতা ছোটে। এ-জেলার আরও অনেক মরদের মতো বাদামওলা চলে যেত কলকাতায় ফি-বছর। যখন খেতে কোনও কাজ থাকে না, ধুধু করে মাঠ, ধুলো ওড়ে। তখন এ-জেলার মরদেরা ছোটে হাওড়া স্টেশনে, শিয়ালদায়—ঠিক যেন মরসুমি পাখিদের মতো। সবার লক্ষ্য কলকাতা—কেউ পাটনা, দিল্লি যায় না। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস কলকাতা ওদের বিমুখ করবে না। ঝাঁকে-ঝাঁকে মরসুম পাখিরা যেমন আসে শীতে কলকাতায় সুদূর সাইবেরিয়া থেকে, ওরাও গরমে ছুটে কলকাতায় রুজির খোঁজে। কেউ বাদাম বেচে, কেউ আইসক্রিম, কেউ ফুচকা, কেউবা টিকিয়া, কেউবা ঠেলে রিকশ, কিছু না জুটলে হাওড়া শিয়ালদায় মাল বয়ে এ-সময় ওরা ভালই আয় করে।

গরমে বেলাও বেশি, বিক্রিও ভাল। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাদাম ফেরি করত ও। রোজ সকালে বের হত না। তবে ছুটির দিন দু'বেলাই বাদাম ফেরি করত। ফেরার সময় জরু-মেয়ের জন্য জামা-কাপড় কিনে নিয়ে যায়। এখানকার আরও অনেকের মতো বাদামওলার জীবনও চলছিল এই একই ছন্দে। টুলু আসার পর বাদামওলার জীবনের ছন্দপতন ঘটল। আর কলকাতা যাওয়া হয় না বাদামওলার। এখন তো খোকাবাবুকে ঘিরেই ওর জীবন। এখন ওর একটাই ভাবনা, কী করে খোকাবাবুকে খুশি রাখা যায়। কী করে খোকাবাবুর মন পাওয়া যায়। ওর আর মন চায় না গাঁও ছেড়ে যেতে। ও গেলে কে রোজ খোকাবাবুকে বেড়াতে নিয়ে যাবে? বাদামওলা এখন খেতির কাজে বেশি মন দিয়েছে। মাঝে-মাঝে জঙ্গলে গাছ কাটার ইজারাও নেয়। দেখতে-দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল। বছরে অন্তত একবার বাদামওলা টুলুকে নিয়ে যায় হাজারিবাগের ন্যাশনাল ফরেস্টে। বাঘ দেখার নেশা টুলুকে টানে। বাদামওলার সঙ্গে কয়েকবার টুলু এ-জঙ্গলে এসেছে বাঘের টানে। কয়েকবার বাঘও দেখেছে। পুজোর পর শীতের মুখে সেবারও টুলু আর বাদামওলা বাঘ দেখতে গিয়েছিল। ফরেস্ট বিভাগের গাড়িতে। টুলু এখন ভাল হিন্দি শিখে গেছে, পড়েও এক হিন্দি স্কুলে। বাদামওলার সঙ্গে আজকাল হিন্দিতেই কথা বলে। গাড়িতে কয়েকজন টুরিস্টও ছিল। ওরাও বাঘ দেখতে যাচ্ছে। গাড়ি জঙ্গলে ঢোকার মুখে টুলু বাদামওলাকে বলল, "আজ জরুর শের দেখেগা।" বাদামওলা কিছু বলল না, শুধু হাসল।

গাড়ির অন্য আরোহীরা সবাই বাঙালি। তারা সকলে টুলুর দিকে তাকাল। একজন মহিলা টুলুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না। মনে হয়, কত চেনা যেন ছেলেটা। উনি অপলক নয়নে দু'চোখ ভরে টুলুকে দ্যাখেনি। ওর মুখের দিকে চেয়ে আকাশপাতাল ভাবেন। এই কী সেই টুলু? দেখতে-দেখতে সাত বছর কেটে গেছে। সেদিনের শিশু টুলু আজ বালক। তবু মুখের ভাব তো একই আছে। উনি তন্ময় হয়ে শুধু টুলুকে দ্যাখেন। সত্যি এ টুলু? অনেকক্ষণ পর হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "এই তো টুলুকে ফিরে পেয়েছি।"

গাড়ির সবাই হতভম্ব। জীবনবাবু ভাবলেন, এবার বুঝি ও ফিট হবে, আবার ঘোর এসেছে। টুলুকে হারানোর পর থেকে এই রোগটা সুনন্দাকে পেয়ে বসেছে। রবিনবাবুর স্ত্রী সুনন্দার পাশে বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "দিদি, চুপ করো, টুলু এখানে আসবে কী করে?"

টুলুকে হারানোর পর জীবনবাবু সুনন্দা এবারই প্রথম ঘরের বাইরে বের হয়েছেন। রবিনবাবুরাই জোর করে এনেছেন। রবিনবাবুর ভগ্নিপতি এখানকার স্টেট ব্যাঙ্কের এজেন্ট। ভাল কোয়ার্টার পেয়েছেন। পুজোর ছুটিতে রবিনবাবু বোনের কাছে বেড়াতে এসেছেন। জীবনবাবু সুনন্দাকেও জোর করে এনেছেন। যাতে একঘেয়েমি থেকে ওঁরা একটু রেহাই পান। সুনন্দার কান্না যদি থামে ক'টা দিনের জন্যও। রবিনবাবুর ছেলে বিলুও এসেছে। ওর সঙ্গে টুলুর ছিল দারুণ দোস্তি। বিলুর আবদারেই সুনন্দা রাজি হন এখানে আসতে।

বিলু হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সামনের সিটে বসা টুলুর হাত ধরে টেনে আনল। বলল, "টুলু, কোথায় ছিলিস তুই এতদিন? সকলে কত খুঁজেছে।" সকলে টুলুর দিকে দেখল। সত্যিই কি এ টুলু? সুনন্দার আর একবিন্দু সন্দেহ নেই। উনি টুলুকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

গাবলু
এটা অন্যায়...এটা অন্যায়! তুমি জোচ্চুরি করছ!
এই...এবার তুমি ভুল দিকে যাচ্ছ!
ওটা তোমার নিজের গোল।
ধন্যবাদ, গাবলু... তুমি আমার হয়ে একটা গোল দিয়ে দিলে!

গাবলু
ভুট্টার খই বিক্রি
২৫ পয়সা থলে
ভুট্টার খই বিক্রি
২৫ পয়সা থলে
ভুট্টার খই বিক্রি
দাম কমল
২০ পয়সা থলে
ভুট্টার খই বিক্রি
দাম কমল
১০ পয়সা থলে
ভুট্টার খই বিক্রি
জলের দামে
৫ পয়সা থলে
ভুট্টার খই বিক্রি
জলের দামে
২ পয়সা থলে
থলে বিক্রি

পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি

অদ্রীশ বর্ধন

"লোকটাকে দেখতে অবিকল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সিনেমার হাতেগড়া দৈত্যটার মতন। হাইটে যা একটু ছোট। তেমন হৃষ্টপুষ্টও নয়। কিন্তু মাথার গড়ন হুবহু বরিস কারলফের মাথার গড়নের মতন।" এই পর্যন্ত বলে দারুণ আওয়াজ করে নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

আমি ব্যাজার মুখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। ইদানীং বড্ড বেশি নস্যি নিচ্ছে আমার এই খামখেয়ালি বন্ধুটি।

খুবই কড়া নস্যি নিশ্চয়। ঝাঁঝের চোটে জল এসে গেছে ইন্দ্রর

চোখে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। বললে মুখটিপে হেসে, "আমার নস্যি নেওয়াটা তোর সহ্য হচ্ছে না বুঝতেই পারছি। কিন্তু কী করি বল ?"

আমি বললাম, "কী করি মানে ? নস্যি না নিলেই হল। কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি।"

"তা দেয়নি। তবে কী জানিস, মাথাটাকে ঝাঁকুনি না দিলে মনে হয় যেন মরেই গেছি। অনেকদিন তেমন অ্যাডভেঞ্চার করাও হচ্ছে না। নস্যিই এখন একমাত্র ভরসা।"

সকালের রোদ জানলা দিয়ে এসে পড়েছে ইন্দ্রনাথের ফর্সা শরীরে। এতক্ষণ ডনবৈঠক করছিল। এই শীতেও তাই ঘেমে গেছে। হাতের আর বুকের মাস্‌ল আরও ফুলে উঠেছে। দু' চোখের শান্ত চাহনি কিন্তু একই রকম আছে। সুন্দর মুখখানা আর ওই চোখজোড়া দেখলে ওকে কবি অথবা শিল্পী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, বিপদ আর অ্যাডভেঞ্চার শান্ত চেহারার এই মানুষটাকেই একেবারে পালটে দিয়ে যায়। তখন ওর দু চোখে হিরে ঝকঝক করে, হাতে-পায়ে বনমানুষের শক্তি ভর করে, গলায় বাঘ ডাকে।

খাটের ওপরেই বসে পড়লাম। ইন্দ্রনাথ চেককাটা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে বললে, "যা বলছিলাম। লোকটাকে দেখতে একটা ছোটখাটো দৈত্যের মতন।"

"এসেছিল কেন ?"

"ওর ধারণা, কেউ ওর ওপর তুকতাক চালিয়ে যাচ্ছে।"

"তুই কি পালটা তুকতাকের মন্ত্র জানিস ? তোর কাছে কেন ? তুই তো গোয়েন্দা।"

"আমিও তাই বলেছিলাম। লোকটা বললে, 'আপনি রহস্য নিয়ে ভাবতে ভালবাসেন, তাই এসেছি আপনার কাছে। আমার জীবনটাই একটা রহস্য। 'লক্ষ হাতির' দেশের লোক আমি।' এই পর্যন্ত বলেই এই জানলাটা দিয়ে তাকিয়েই কীরকম যেন হয়ে গেল। চট করে উঠে পড়ে বললে, 'আজ আর নয়। কাল সকালে আসব, রাত হলেই ওদের উৎপাত বাড়ে।' বলেই পাঁই-পাঁই করে এমনভাবে পালাল, যেন ভূতে তাড়া করেছে।"

"ঘড়িতে তখন ক'টা বেজেছিল ?"

"অত দেখিনি। তবে ঘটনাটা ঘটে সন্ধের দিকে। চাঁদের আলো আসছিল এই জানলাটা দিয়ে। এখন যেমন আসছে সূর্যের আলো। লোকটা দাঁড়িয়েছিল এই জানলাটার সামনেই। দেখতেই পাচ্ছিস, এখানে দাঁড়ালে সুভাষ সরোবরের গাছপালা দেখা যায়, লেকের জল দেখা যায়। লোকটা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে পড়পড়িয়ে পালিয়ে গেল।"

আমি বললাম, "তা হলে ভূত নয়, কাউকে দেখেই পালিয়েছে।"

ইন্দ্রনাথ বললে, "যাই হোক, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি।"

আমি হেসে বললাম, "ইন্দ্র, তুই উড়োজাহাজে চাপলেই পারিস। ওরকম ঝুঁকি আর অ্যাডভেঞ্চার কোথাও পাবি না—যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে।"

রসিকতার মুডে নেই ইন্দ্রনাথ। অন্য সময় হলে মুখরোচক এই প্রসঙ্গটা নিয়ে বিরাট গল্পগাছা শুরু হয়ে যেত। সেদিন কিন্তু আনমনা হয়ে রইল, আমি চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর ও বলল, "মৃগ, তুই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিস না, আমিও করি না। বিশ্বাস না করেও তুই গল্প লিখেছিস তাদেরকে নিয়েই, যাদের দেখা যায় না। তা হলে এরকম অ্যাডভেঞ্চারে দৌড়নোর ডাক যদি আমি পাই, আমিও বা যাব না কেন ?"

আমি বললাম, "গল্প লিখি মজা করার জন্য। যারা পড়ে, তারাও মজা পাওয়ার জন্যই পড়ে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার সেখানে নেই। তবে তোর কেসটা আলাদা। গোয়েন্দা হয়ে তুই যদি ভূতদের পেছনে দৌড়স, লোকে তোর নিন্দে করবে।"

রাগ করে বললে ইন্দ্রনাথ, "লোকের কথার ধার ধারি না। আমার মন যা চায়, তাই করেছি চিরকাল। লোকটার ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের তৈরি দানবের মতো মাথাখানা দেখবার পর থেকেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে অলৌকিক অ্যাডভেঞ্চার, 'ওরে আয়' 'ওরে আয়' 'ওরে আয়' বলে ডাক দিচ্ছে আমাকে।"

অট্টহেসে বললাম আমি, "নস্যি নিয়ে-নিয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে কোনও কালেই পাত্তা দিতিস না। নিজের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের ওপরেই ভরসা রেখেই চিরকাল চলেছিস। আজকের ইন্দ্রনাথ রুদ্র এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়কেই ঠিকমতো খাটিয়েই তৈরি হয়েছে।"

"মৃগ, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই কি সব ?"

"মানে ?" অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমি। "কী বলতে চাস, খুলে বল ইন্দ্র। চোখ-কান -নাক- জিভ-চামড়া — এ ছাড়া আবার কী থাকতে পারে মানুষের ? ল্যাজ ? সে তো আমাদের আদিপুরুষ বাঁদরদের ছিল !"

আমি একটু ঝাঁঝালো হয়ে গেছিলাম এই কথাগুলো বলতে গিয়ে। ইন্দ্রনাথ আমার চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

তারপর বললে, "ক্রাইমের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে, আজ পর্যন্ত যেগুলোর কিনারা হয়নি। বিলেত-আমেরিকার দুঁদে অপরাধ-বিজ্ঞানীরা নাকের জলে চোখের জলে হয়েছেন।"

"সব সময়ে সব অপরাধের অপরাধী ধরা পড়ে না !"

"তা নয়, মৃগ, অপরাধী আসলে কে, অনেক সময়ে তাও জানা যায় না। এসব ক্ষেত্রে অপরাধের কিনারা হবে কী করে ? আমি ভাবছি না, এমন অনেক ঘটনা ক্রাইম হিস্ট্রিতে লেখা হয়ে আছে, যা মাথা ঘুরিয়ে দেয়, ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না। আমেরিকায় একজন রজক খুন হয়েছিল তার নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। দরজার মাথায় ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি, বড় মানুষ গলতে পারে না। তাকে গুলি করা হয়েছে, খুব কাছ থেকে। শার্টে বারুদের ঝলসানি লেগেছে। কিন্তু শার্ট বা ভেতরের গেঞ্জি ফুটো হয়নি। শুধু চামড়া ফুটো হয়েছে। রিভলভার পড়ে রয়েছে পাশেই। ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। কী বলবি ? আত্মহত্যা ?"

"অবশ্যই।" বললাম আমি।

"তাই যদি হয়, তা হলে নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলার পর রজক কি দানো হয়ে জামাকাপড় পরে নিয়েছিল ?"

"তা হলে কেউ ওকে গুলি করে জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছে।"

"পালাল কী করে ? দরজা তো বন্ধ ভেতর থেকে।"

"দরজার ওপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে," কাষ্ঠ হেসে বললাম আমি।

"সেখান দিয়ে বড় মানুষ গলতে পারে না আগেই বলেছি। একটা বাচ্চাছেলেকে তার মধ্যে দিয়ে ঠেলেঠুলে নামিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। খুনি অত কষ্ট করতে যাবে কেন ? সে তো খুন করে দরজা খুলেই পালাতে পারত ?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তা হলে তো রহস্যময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।"

"এরকম রহস্যময় কাণ্ড আরও আছে, মৃগ," বললে ইন্দ্রনাথ, "কথা তুললি বলে একটা উদাহরণ দিলাম। অজস্র ঘটনা আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। আমরা হাজার মাথা খাটিয়েও সেসবের

আদি-অন্ত রহস্য ধরতে পারি না।"

"কিন্তু হঠাৎ এই নিয়ে এত ভাবছিস কেন, ইন্দ্র, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন-মার্কা লোকটাকে দেখে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বা সুড়সুড় করে উঠল কেন?"

খোঁচা মেরে বললে ইন্দ্রনাথ, "হে সাহিত্যিক বন্ধু, তুমি অন্তত এই ভুলটি কোরো না। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামটা দানবটার নয়, দানবকে যিনি বানিয়েছিলেন তাঁর নাম। আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি হঠাৎ সুড়সুড় করে, আমার কিছু করার নেই। তবে লোকটা এসে গেছে, এখানেই আসছে। কীরকম অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে আসছে, তা জানা যাবে এক্ষুনি।"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম বেঁটেখাটো নিরিমিষ চেহারার একটা লোক বেজির মতো খরখর করে ঢুকে পড়ল গেট পেরিয়ে! যাচ্চলে! এই লোক বলে কিনা সে, লক্ষ হাতির দেশের লোক!

অজানা শক্তি

লোকটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে আমার দিকেই তাকিয়ে রইল। যেন সে অনেকদিন ধরেই আমাকে চেনে-জানে, এমনি ভাবেই তাকিয়ে রইল। আমাকে এই প্রথম দেখেছে বলে চোখে-মুখে এতটুকু কুণ্ঠা নেই।

হাতজোড় করে নমস্কার করতে করতে বললে, "মৃগবাবু, নমস্কার। এইমাত্র যার কথা শুনছিলেন, আমিই সেই।"

আমি তো আমি, ইন্দ্রনাথ পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল এই কথা শুনে। চোখ বড়-বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, "বোসবাবু, আপনি কী করে জানলেন এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল? মৃগকে আপনি চেনেন?"

"আজ্ঞে না।" ঘরের ভেতর ঢুকতে-ঢুকতে বললেন রহস্যময় লোকটা, "মৃগবাবুকে কখনও দেখিনি। তবে ওঁর নাম শুনেছি। আরও ভাল করে শুনলাম একটু আগে। আমাকে ছোটখাটো দৈত্য বলুন আর যাই বলুন, আমি লোকটা কিন্তু একেবারে নিরীহ।"

এইবারে মুখ হাঁ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। আমার মুখের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল কীরকম, তা বলতে পারব না। সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেতাম!

বোসবাবু একটা চেয়ারে বসলেন। আমি প্রচণ্ড অবাক হলেও লোকটার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত এই ফাঁকে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। পাঁচ ফুট হাইটও হবে কি না সন্দেহ। মাথার গড়নটা অদ্ভুত। খুলির ওপর দিক চ্যাপটা। খুলির পেছন দিকটাও চ্যাপটা, ঠিক যেন একটা চৌকোনা বাক্স। অল্প-অল্প চুল—কাঁচাপাকা। কপালের চামড়ায় অনেক ভাঁজ। চোখের দু' কোণের চামড়াতেও অনেক ভাঁজ। নাকের দু'পাশের চামড়াও ভাঁজ খেয়ে ধনুকের মতো বেঁকে নেমে এসেছে দু'ঠোঁটের দুই কোণ ঘিরে। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। গোটা মুখটা যেন তেল-চকচক করছে। তেল বেরোচ্ছে লোমকূপ থেকেই। তাই সারা মুখখানাকে একটু নোংরা-নোংরা মনে হচ্ছে। চোখ দুটো সামান্য কটা, বেড়ালের চোখের মতো একেবারে কটা নয়। চোখের গড়নটা দেখলেই বোঝা যায় চিনেম্যান অথবা মঙ্গোলিয়দের সঙ্গে বংশের পূর্ব-পুরুষদের একটা সম্পর্ক ছিল। এরকম চিনেম্যান-চিনেম্যান চোখ নদী-নালার দেশের বাঙালিদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না। গায়ে তাঁর একটা ময়লা ভাঁজখাওয়া বুশ শার্ট, আর একটা ঢলঢলে তাকিয়ার খোলের মতন প্যান্ট।

আমি ঢোক গিললাম। তারপর নমস্কার করলাম। বললাম, "আপনার নমস্কারটা একটু দেরিতে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। হ্যাঁ, একটু আগেই আপনার কথা শুনছিলাম ইন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে? আড়ি পেতেছিলেন?"

জিভ বের করে দুই হলদেটে নোংরা দাঁত দিয়ে রীতিমত লম্বা সেই জিভটাকে কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বললেন বোসবাবু, "অত অসভ্য আমি নই। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওই লেকের পাড়ে। গাছের তলায়। চেয়ে ছিলাম অবশ্য এইদিকেই। ঠিক তক্ষুনি...কিছু মনে করবেন না সার, আমার এই ব্যাপারটা গোড়া থেকে যদি না শোনেন, বুঝতে পারবেন না, কেন আপনাদের কাছে দৌড়ে এসেছি। আমার ভেতরে আছে একটা অজানা শক্তি। আমি এমন কিছু লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু অদ্ভুত এই ক্ষমতাটা ভগবান আমাকে দিয়েছেন ছেলেবেলা থেকে। এই ক্ষমতা পেলে অন্য কেউ হয়তো রাজাবাদশা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমি তা হতে চাই না, আমি চাই শুধু শান্তিতে থাকতে। তাও পারছি না। এ তো ক্ষমতা নয়, এ যে অভিশাপ। কী কুক্ষণে আমি গেছিলাম লাওসে, দেখেছিলাম পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি। তারপর থেকেই শনি লেগেছে আমার পেছনে। ইন্দ্রনাথবাবু, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, দূর থেকেই মারবে, আমার গায়ে ফুটো পর্যন্ত হবে না। কিন্তু আমি মরে যাব। ওরা ভয়ানক লোক। ওরাও যে একটা ভয়ঙ্কর শক্তিকে দখলে রেখেছে। বছরের পর বছর আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একটা গল্পের বইয়ে আপনার নামটা পড়লাম দু' দিন আগে। লিখেছেন ইনি, মৃগবাবু। প্রকাশকের কাছে গিয়ে আপনার নাম-ঠিকানা জোগাড় করেই দৌড়ে এসেছিলাম কাল রাতে। কিন্তু ওরাও এসে গেছে গন্ধে-গন্ধে। তাই পালিয়েছিলাম। ইন্দ্রনাথবাবু, শুনবেন আমার আশ্চর্য কাহিনী? শুনবেন ব্যাঙ্ককের পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তির রহস্যকথা?"

বোসবাবু হাঁফাচ্ছিলেন শেষের দিকে। ভদ্রলোক খুবই ভয় পেয়ে রয়েছেন। এত কথা একটানা বলে যাওয়ার সময়ে তাঁর চোখে-মুখে ভয়ের যেরকম আনাগোনা দেখলাম, সেরকমটা ইচ্ছে করেও কেউ মুখে ফোটাতে পারে না।

তবে ওঁর একটা কথা শুনে আমি চেয়ে ছিলাম ইন্দ্রনাথের দিকে, ইন্দ্রনাথও চেয়ে ছিল আমার দিকে। উনি তড়বড় করে বলে গেলেন, ওঁকে মেরে ফেলা হবে দূর থেকে; গায়ে ফুটো পর্যন্ত হবে না, কিন্তু উনি মরে যাবেন।

ঠিক এই ধরনের কথাই তো একটু আগে বলছিলাম আমি আর ইন্দ্রনাথ। আমেরিকার সেই রজক খুন হয়েছিল বন্দুকের গুলিতে। জামা ঝলসে গিয়েছিল বারুদে। অথচ শার্ট আর গেঞ্জি ফুটো হয়নি, ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছিল শুধু বুকের চামড়া। আজও সে-রহস্যের সমাধান হয়নি।

বোসবাবু দেখছি ঠিক এই ধরনেরই সৃষ্টিছাড়া রহস্যের কথা বলছেন!

আমার চোখে-চোখে তাকিয়ে নিয়েই চুপচাপ বাকি কথাগুলো শুনে গেল ইন্দ্রনাথ। তারপর হাতের তালুতে নস্যি ঢালতে-ঢালতে বললে, "বলুন আপনার রহস্য গল্প, আমরা শুনতে চাই।"

হাত বাড়িয়ে বোসবাবু বললেন, কষ্টের হাসি হেসে, "একটু নস্যি দেবেন?"

দূরের ছবি মনের চোখে

"আমার নাম ভিভিয়ান বোস নয়। আমার বাবা আর মা কোনওকালেই বোস ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন পল। মাইকেল পল আমার বাবার নাম। মা শ্যামদেশের মেয়ে।

"আমি জন্মেছিলাম বর্মার রেঙ্গুন শহরে। আমরা খ্রিস্টান। মাকে আমার মনে নেই। মা মারা যান আমার একুশ দিন বয়সে। তারপর

থেকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। বোর্ডিং হাউসে ভর্তি হলাম তারপর। ছুটিছাটার দিনেও বোর্ডিং-এ থাকতাম। বাবা এসেও আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারতেন না। যেতে ইচ্ছে করত না।

"বর্মায় যখন বোমা পড়ে, তখন আমার বাবা মারা যান বোমার টুকরোয়। আমি পালিয়ে আসি। কিছুদিন ছিলাম কাঁচরাপাড়ায়। নীলমণি বোসের বাড়িতে। গভর্নমেন্ট আমাকে তিনদিনের মধ্যে ইণ্ডিয়া ছেড়ে যেতে বলেছিল একটা মিথ্যে ব্যাপারে। নীলমণি বোস বললেন, 'আজ থেকে তুমি পল নও, বোস হয়ে যাও। তা হলে আর কে ধরবে? চলে যাও কলকাতায়।'

"সেই থেকে আছি কলকাতায়। খুবই কষ্টে। থাক সে কথা। শুনুন, এবার আমার ভেতরকার অদ্ভুত শক্তিটার কথা। আজগুবি মনে হতে পারে। কিন্তু প্রমাণ দেব।

"মায়ের কথা আমার মনে নেই। মায়ের ছবি পর্যন্ত দেখিনি। মায়ের জন্য মন কেমনও করে না। বাবা একাই মায়ের আদর দিয়ে গেছেন। নিজেকে কক্ষনো একা মনে হত না। এমনকী বাবা যখন আমাকে বাড়িতে রেখে দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যেতেন কাজে, তখনও মনে হত, বাবাকে ডাকলেই দৌড়ে আসবেন। এরকম মনে হওয়ার একটা কারণ আছে। বাবাকে আমি দেখতে পেতাম। প্রথম-প্রথম চোখ বন্ধ করে বাবার কথা ভাবলেই, বাবাকে দেখতে পেতাম কাঠগোলায় কাজ করছেন। কখনও দেখতাম নদীর ধারে কাঠের গুঁড়ি গুনছেন। তারপর থেকে এমনই হল যে, চোখ চেয়ে থেকেই দেখতে পেতাম বাবাকে। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ঠিক যেন ছবি ফুটে উঠত দেওয়ালে।

"আমার তখন এত কম বয়স, এটা যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা, তা বুঝতে পারতাম না। বাবা বাড়ি ফিরে এলে গল্প করতাম। সারাদিন বাবা কী করেছেন, কোথায় ছিলেন, স-ব বলতাম। বাবা অবাক হতেন। ভয় পেতেন। বলতেন, 'আর কাউকে বলিসনি, মাইকেল।'

"কেন অত ভয় পেতেন, তখন বুঝতাম না। পরে জেনেছিলাম। ডাইনি সন্দেহ করে কতজনকে তো পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। দূরের জিনিস আমি দেখতে পাই জানাজানি হয়ে গেলে যদি আমাকে মেরে ফেলে? বাবা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন এই কারণেই।

"একদিন আমার এই আশ্চর্য ক্ষমতাটা আর-একটু বেড়ে গেল আমি নিজেই ভয় পাওয়ার পর। বাড়িতে একলা থাকতাম ঠিকই, কিন্তু কোনও অসুবিধে হত না। খাবারদাবার সাজিয়ে রেখে যেতেন বাবা। দরজা বন্ধ থাকত বাইরে থেকে। আমি খেলনা, বই নিয়ে ভুলে থাকতাম।

"একদিন কিন্তু ভয় পেলাম প্রচণ্ড। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলাম বাগানের ফুল আর পাখি। এমন সময়ে একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে এসে পড়ল জানলার গোবরাটে, সেখান থেকে আর-একটা লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকবার আগেই ভীষণ বেগে কী যেন একটা ছিটকে এল জানলার দিকে। বাগানের মাটি থেকে জানলার গোবরাট অনেকটা দূরে। এতটা পথ যা ছিটকে এল প্রথমে তাকে দেখতেই পাইনি। মনে হয়েছিল যেন একটা কালো রেখা বাগান থেকে গোবরাট পর্যন্ত আচমকা শূন্যে তৈরি হয়ে শূন্যেই মিলিয়ে গেল।

"আর তারপরেই ইঁদুরটার আর্তনাদ শুনেই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল আমার। এত বড় মাকড়সা জীবনে দেখিনি। আটখানা পায়ে লম্বা-লম্বা কালো লোম। চোখ দুটো চুনি-পাথরের মতো লাল। জানলার দুটো গরাদের মধ্যে যতটুকু ফাঁক, তার চাইতেও

বড়। ধড়খানা আমার এই মুঠোর সমান। ইঁদুরটার ঘাড়ে দুটো হুল ফুটিয়ে দিয়ে সে পা দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে।

"আমি মাত্র হাতখানেক দূর থেকেই ভয়ঙ্কর সেই মাকড়সাকে দেখে বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মাকড়সা চেঁচানি শুনতে পায় কি না জানি না, কিন্তু আমার চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে ইঁদুরটাকে নিয়েই লাফ দিয়ে নেমে গেল বাগানে। আমিও দড়াম করে জানলার কপাট বন্ধ করে দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম বিছানায় বসে।

"একটু পরেই শুনলাম তালা খোলার আওয়াজ। আওয়াজ শুনেই বুঝলাম, বাবা এলেন। কিন্তু বাবা তো এত তাড়াতাড়ি ফেরেন না। আমি উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই বাবা দৌড়ে এলেন। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছিস? আর জানলা খুলিসনি। আজই নির্বংশ করব ওদের।'

"'কাদের?' ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল প্রশ্নটা।

"'মাকড়সাদের।'

"'তুমি জানলে কী করে?'

"' আমি যে দেখতে পেলাম ভীষণ ভয় পেয়েছিস। চোখ বড় বড় করে জানলার দিকে তাকিয়ে আছিস। ইঁদুরটাকে নিয়েই লাফিয়ে নেমে গেল বাগানে। ভাগ্যিস তোকে হুল ফোটায়নি।'

"'তুমি দেখতে পেলে?'

" অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বাবা। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এতদিন জানতাম শুধু তুই একা দেখতে পাস, আজ জানলাম, আমাকেও দেখাতে পারিস দূরের জিনিস।'

"সেইদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম, তাই মনের শক্তি যেন ফেটে পড়েছিল। বাবার মনকে ছুঁয়েছিল অত দূরেও। এমন ঘটনা অবশ্য সবসময় ঘটে না। ইচ্ছা করলেই আমি যা দেখেছি, তা আর-একজনকে দেখাতে পারি না। যেমন ধরুন, এই মুহূর্তে আপনাকে দেখাতে পারছি না একটা যমদূত এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি গুলি ছুঁড়তে পারেন?"

চোখ কুঁচকে বোসবাবুর কথা শুনছিল ইন্দ্রনাথ, জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমি বসে ছিলাম ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে সোফার ওপর। বোসবাবু জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থেকেও জানলার দিকে চোখ না তুলে শেষ প্রশ্নটা একটু উদ্বেগের সুরে বলার সঙ্গে-সঙ্গে চট করে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানলার মধ্যে দিয়ে সুভাষ সরোবরের হাওয়ায় উদ্দাম গাছপালার দিকে তাকিয়ে বললে, "কই, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।"

বোসবাবু এবার উঠে দাঁড়ালেন। চিনেম্যান টাইপের ছোট কটা চোখ দুটোয় ভয়ের চিহ্ন দেখলাম স্পষ্ট।

বললেন দ্রুত স্বরে, "রিভলভার! রিভলভার! প্লিজ! দূর থেকেই গুলি করে উড়িয়ে দিতে হবে। চোখের পাতা ফেলবার আগেই..."

অদ্ভুত চেহারার এই লোকের কথায় ইন্দ্রনাথের মতন ডাকাবুকো মানুষ তৎপর হবে ভাবতেও পারিনি। আমি যদি ইন্দ্রনাথের জায়গায় থাকতাম, তা হলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতাম, রিভলভার-টিভলভার আনতে যেতাম না।

কিন্তু আমার এই বন্ধুটির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দেয়। সেই মুহূর্তেও দেখলাম, চোখের পলক ফেলার আগেই ও হেঁট হয়ে সোফার কুশনের তলা থেকে টেনে বের করল ওর রিভলভার। অথচ রিভলভার রাখার জায়গা ওটা নয়। আগে থেকেই কি তা হলে তৈরি হয়েছিল ইন্দ্রনাথ? বোসবাবু কি ওঁর অলৌকিক শক্তি দিয়ে স্পর্শ করেছেন ইন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারি সত্তাকেও?

এত কথা তখন ভাববার অবসর পাইনি। এর পরের ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, ভাল করে দেখতেও পেলাম না। শুধু এইটুকু দেখলাম যে, একটা ধ্যাবড়া কালো মতো কী জিনিস বাইরে থেকে আচমকা আবির্ভূত হল জানলার দুটো গরাদের ফাঁকে এবং পরমুহূর্তেই পিস্তলের গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে গেল জানলার বাইরে।

ইন্দ্রনাথ ফুঁ দিয়ে বাকি ধোঁয়া উড়িয়ে দিল রিভলভারের নলচে থেকে। তারপর একটুও না হেসে বোসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, "টিপখানা কীরকম দেখলেন?"

ফের চেয়ারে বসে পড়ে বললেন বোসবাবু, "চমৎকার। এবার নিন আমার শক্তির পরীক্ষা। এইমাত্র যাকে গুলি করে উড়িয়ে দিলেন, সে কে জানেন?"

"আপনিই বলুন," রিভলভারটাকে সোফার কুশনের তলায় রাখতে রাখতে বললে ইন্দ্রনাথ।

"যার ইঞ্চিখানেক লম্বা দুটো হুলের বিষে মানুষ মারা যেতে পারে, চলবার সময়ে যার গায়ের লোমের ঘষাঘষিতে খস্‌খস্ আওয়াজ হয়, ওজন যার সাড়ে তিন আউন্স...।"

"এবং যার এক ঠ্যাং-এর ডগা থেকে আর-একটা ঠ্যাং-এর ডগা পর্যন্ত মাপলে দাঁড়ায় পাক্কা এগারো ইঞ্চি," এতক্ষণে মৃদু হাসি ভাসল ইন্দ্রনাথের পাতলা সুন্দর ঠোঁটে।

বোসবাবুর কটা চোখ দুটো বড় হয়ে গেল এই কথায়, "ক'টা ঠ্যাং বলুন তো?"

"আটটা।"

"এইটুকু সময়ের মধ্যে দেখলে কী করে?"

"গোয়েন্দার চোখ দিয়ে," ইন্দ্রনাথের চোখে-মুখে এখন হাসি। এ-হাসি এমনই হাসি, যার মানে আমিও ছাই বুঝি না। এ-হাসি যখনই হাসে ইন্দ্রনাথ, তখনই কিন্তু জবর রহস্যের গোলকধাঁধায় তলিয়ে যায় মনে-মনে। এ-আমি অনেকবার দেখেছি। একটু থেমে ফের বলল, ও,"আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েও দেখিয়ে দিতে পারেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই মাত্র যে তেড়ে এসেছিল আমার পিঠে লাফিয়ে পড়বে বলে, সে হয়তো র‍্যাম্‌বো স্বয়ং।"

"র‍্যামবো!" অস্ফুট গলায় বলে উঠেছিলাম আমি।

হেঁয়ালির হাসি হাসতে-হাসতে বললে ইন্দ্রনাথ, "ভায়া মৃগাঙ্ক, র‍্যাম্‌বো মানে সিনেমার দাঙ্গাবাজ র‍্যাম্‌বো হিরো নয়। একে বলা যায় মাকড়সাদের র‍্যাম্‌বো!"

"মাকড়সাদের র‍্যাম্‌বো!"

"টারানটুলা মাকড়সাও এর কাছে শিশু। এর নাম বর্জিয়া। নামটা মনে রেখো মৃগ, বর্জিয়া জামা ফুটো না করেও তোমার চামড়া ফুটো করে ছাড়তে পারে। কলারের ফাঁক দিয়ে বুকে-পিঠে চলে যেতে পারে। সাপকেও যারা সমীহ করে না, তারা আঁতকে ওঠে বর্জিয়ার সামনে। কিন্তু বোসবাবু, দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানা জঙ্গলে যার নিবাস, সে সুভাষ সরোবরের পাশের এই বাড়িতে এল কী করে?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বোসবাবু বললেন, "আশ্চর্য মানুষ তো আপনি? র‍্যাম্‌বোকে না দেখেই এত কথা বলে গেলেন? আমি কিন্তু মনের চোখ দিয়ে আগেই দেখতে পেয়েছিলাম ও আসছে, জানলার দিকে লাফাতে যাচ্ছে..."

"আমিও দেখেছিলাম। আপনার চোখের মধ্যে দিয়ে।" বোসবাবুর কটা চোখের দিকে তাকিয়ে দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে বলে গেল ইন্দ্রনাথ।

"আশ্চর্য! চলুন, গিয়ে দেখা যাক র‍্যাম্‌বোর লাশ।"

কিন্তু আরও আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখা গেল বাইরে গিয়ে। র‍্যাম্বোর দেহের কিছু অংশ ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে বটে, সাড়ে তিন আউন্স ওজনের বপুটা নেই!

শূন্যে মিলিয়ে গেল নাকি?

কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন

ঘরে ফিরে এলাম যখন, সূর্য তখন মাথার ওপর। বোসবাবুর চকচকে মুখে ঘামের ফোঁটা। ধূসর চোখে আতঙ্ক।

বললেন ফ্যাসফেসে গলায়, "দেখলেন সার, দেখলেন কাণ্ডটা। এক্কেবারে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে দিল।"

"কারা মিলিয়ে দিল, মিঃ পল?" চোখের তারা দুটোকে ছুঁচের মতো সরু করে এনে জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথ।

কটা চোখ নাচিয়ে বললেন বোসবাবু, "পল নয়, পল নয়। আমাকে বোসবাবু বলেই ডাকবেন।"

"বেশ তাই হোক, তাই হোক। এখন বলুন, বর্জিয়াকে অদৃশ্য করল কারা?"

"তারা, যারা পাঠিয়েছিল ওকে।"

"তারা কারা?"

"সেইটা বলতে দিল কই? আগেই পাঠিয়ে দিল যমদূতটাকে। এবার বলি!"

"বলুন।"

"আগেই বলেছি, মা ছিলেন শ্যামদেশের মেয়ে। যে দেশের নামডাক লাখ-লাখ হাতির জন্য। মায়ের বাবা থাকতেন লাওসদেশে। শ্যামদেশের ঠিক পাশের দেশ। যে-দেশের একদিকে চিন, একদিকে ভিয়েতনাম, আর-একদিকে ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশ।

"লাওসের আদিবাসীদের সংখ্যা কম নয়। এদের মধ্যে লাও থিয়াঙ্-রা থাকে পাহাড়ি অঞ্চলে। আমার দাদামশাই ছিলেন লাও থিয়াঙ্। তাঁর বাপ-ঠাকুর্দারা রাজা। সামসেনথাই-এর আমল থেকে রাজাদের সেবা করে এসেছেন। বাবার মুখে শুনেছি, রাজারা এঁদের এত মণিমাণিক্য দিয়েছিলেন, যা একজায়গায় রাখলে ছোটখাটো একটা পাহাড় হয়ে যায়। ওঁরা কিন্তু যত জহরত পেয়েছিলেন, তার বিনিময়ে পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তিই সঞ্চয় করে গেছেন। বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত পান্না-বুদ্ধদের মোট সংখ্যা কত, তা সঠিক কেউ জানে না। কেউ বলে এক হাজার, কেউ বলে হাজার-হাজার।

"পান্না-বুদ্ধরাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল। খোদ রাজপরিবারের নজর পড়ল বিখ্যাত এই কালেকশনের দিকে, আমার দাদামশাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিদারুণ অত্যাচার করে পিটিয়ে মেরে ফেলার পরেও তিনি বলে গেলেন না, কোথায় রেখেছেন অত পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি। তাঁর প্রাসাদ তন্ন-তন্ন করে দেখা হল, বলতে গেলে প্রত্যেকটা পাথর খুলে পান্না-বুদ্ধদের খোঁজ করা হল। কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকেই।

"এই সব কাণ্ড ঘটবার আগেই আমার মা পালিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে এবং দেশ ছেড়ে। বর্মায় এসে নিজের পরিচয় লুকিয়ে কী কষ্টে যে দিন কাটিয়েছেন, তা আর বলবার নয়। তারপর ঠাঁই পান একটা খ্রিস্টান মঠে।

"এসব গল্প শুনেছি বাবার কাছে। একটা কথা বেশ মনে আছে, কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন। আমার মা মারা যাবার ঠিক আগে এই কথাটাই বিড়বিড় করে বলেছিলেন। স্পষ্ট শুনেছিলেন আমার বাবা। কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন বলতে কী যে বোঝাতে চেয়েছিলেন আমার মা, তা জিজ্ঞেস করার আগেই মা আমার চলে যান পৃথিবী ছেড়ে।

"তারপর থেকেই বাবা হিমশিম খেয়ে গেছেন আমাকে মানুষ করতে গিয়ে। রীতিমত গতর খাটিয়েছেন। পান্না-পাথরের বুদ্ধদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এক্কেবারে পাননি। তবে বাড়ি ফিরে অনেক রাতে আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময়ে অনেক রূপকথা-উপকথার গল্প বলে যেতেন, ফাঁকে-ফাঁকে বলতেন লাওসের গল্প, শ্যামদেশের গল্প, লক্ষ হাতির গল্প, আর কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুনের গল্প।

"বর্মায় বোমা পড়তেই বাবাও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্গে। আমি পালিয়ে এলাম কলকাতায়। তারপর গেছে বেশ কয়েকটা বছর। মাঝে ছিলাম দার্জিলিঙের একটা খ্রিস্টান মঠে। সেইখানে দেখা হল শেরপা থুঙ্-এর সঙ্গে।

"লোকটা যে পয়লা নম্বরের খুনে-বদমাশ, আগে তা বুঝিনি। এমন মিঠে-মিঠে কথা বলত, এমন মিষ্টি-মিষ্টি চোখে তাকাত যে, তার কাছে মনের আগল খুলে কথা না বলে পারতাম না। এইরকম আলগা মনের আলটপকা কথা বলার সময়েই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল আমার মনের আশ্চর্য ক্ষমতার ব্যাপারটা। আমি দূর থেকে দেখতে পাই, সেরকম বিপদ এলে অন্যকেও দেখাতে পারি, এইসব কথা শুনে শেরপা থুঙ্ আমাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে নিয়ে গেল শ্যামদেশে, শ্যামদেশ থেকে লাওসে। উদ্দেশ্য ছিল খুবই খারাপ, ওদেশে টহল দিতে-দিতে নিশ্চয় একদিন মনের চোখে দেখতে পাব বুদ্ধমূর্তিদের। পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে, খিদেয় নাড়ি চনচন করেছে, তবুও কিচ্ছু দেখতে পাইনি। শেষকালে বদমাশ শেরপা থুঙ্ আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করল। এককালে নিজে ছিল সাউথ আমেরিকার গুয়ানা জঙ্গলে। সেখান থেকে পেল্লায় মাকড়সাদের ধরে এনে দুটো আলাদা বাক্সে রেখে দিত। একটা মেয়ে আর একটা পুরুষ। বাচ্চাগুলো বড় করে তুলত আর-একটা বাক্সে। মেয়ে-মাকড়সারা যখন ছেলে-মাকড়সাদের ধরে-ধরে খেত, আমাকে জোর করে দেখাত ভয়ানক দৃশ্য। ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু কিছুতেই মনের চোখে দেখতে পেতাম না, কোথায় আছে মামারবাড়ির পান্না-বুদ্ধরা।

"এই সময়ে একটা বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাজা প্রথমরাম ব্যাঙ্ককে নিজের রাজনগরে যে বিশাল বুদ্ধমূর্তিটা বসিয়েছিলেন, সেটা যে আসল নয়, নকল, তা একনজরেই আমি টের পেয়েছিলাম। আচমকা তা মুখ দিয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল। পাজির পাঝাড়া শেরপা থুঙ্ তা শুনে ফেলে কী অত্যাচারই না চালিয়ে গেল আমার ওপর। আমি কিন্তু জানলেও বলিনি কোথায় লুকনো আছে পান্না-পাথরের আসল বুদ্ধমূর্তি।"

পান্না-পাথরের পাকচক্র

ইন্দ্রনাথের খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়। আমারও পেটে ইঁদুর ডন মারছে মনে হচ্ছিল। কিন্তু দু'জনের কেউই হেঁশেলের দিকে উঠে যাইনি গল্পে জমে যাওয়ায়। চৌকো মাথা নেড়ে-নেড়ে গল্প বলতেও পারেন বটে বোসবাবু।

তাই দম নেওয়ার জন্য যেই উনি থেমেছেন, অমনি টপ করে উঠে পড়ে হেঁশেল থেকে বিস্কুট আর মাখনের কৌটো এনে নিচু টেবিলে রেখে বললে ইন্দ্রনাথ, "বেড়ে গল্প জমিয়েছেন, বোসবাবু, নিন, দুটো বিস্কুট খেয়ে পিত্তি রক্ষা করুন। পেট চুঁইচুঁই করছে না?"

"নাঃ," বলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন বোসবাবু, "দিন দিন,

এবার পুজোয় তিনগুণ আকর্ষণ— একে সত্যজিৎ রায়, তায় 'ডবল' ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়ের

দ্বিগুণ চমকে-ভরা বই

ডবল ফেলুদা

দাম ১৫·০০

'ডবল ফেলুদা'। অর্থাৎ একটি নয়, এ-বইতে গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য- অ্যাডভেনচারের দু-দুটি দুর্ধর্ষ উপাখ্যান। ফলে দুই মলাটের মধ্যে আকর্ষণও এবার 'ডবল'।
গোয়েন্দা ফেলুদার নতুন কাহিনী মানেই নতুনতর একেকটি পটভূমি।
এ-বইয়ের প্রথম কাহিনী কাশ্মীরের পটভূমিকায়।
ভূস্বর্গের নিসর্গে হঠাৎ মিশেছে রক্তের ফোঁটা। খুন হয়েছেন এক অবসর-নেওয়া বিচারপতি। কে খুন করল তাঁকে ? কেনই-বা ? শুধু কি দামী এক আংটির লোভে ? নাকি আরও বড় রহস্য এই খুনের পিছনে ?
প্ল্যানচেট-এ আত্মা-নামানো, ফেলুদার আংশিক ব্যর্থতা-মেশানো চমকপ্রদ সমাধান, কাশ্মীরের বর্ণনা—এ-সমস্ত-কিছু মিলিয়ে এক আলাদা স্বাদের কাহিনী 'ভূস্বর্গ ভয়ংকর'।
এ-বইয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস— 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা'। যাত্রাজগতের পটভূমিকায় গড়ে-ওঠা এই কাহিনীতে একটি অন্তর্ধান ও একটি খুনকে কেন্দ্র করে এক দুর্দান্ত রহস্যের জট খুলেছেন গোয়েন্দা ফেলুদা। তাঁর সহকারী রূপে স্বনামধন্য জটায়ুর নতুন ভূমিকা এখানে। সত্যজিৎ রায়ের অজস্র পাতা-জোড়া অলংকরণ, তাঁরই আঁকা প্রচ্ছদপট।

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বই : গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেনচার ॥
বাদশাহী আংটি ১২·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ১০·০০ সোনার কেল্লা ১২·০০ বাক্স-রহস্য ১০·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ১০·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ১২·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ১০·০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ১৪·০০ গোরস্থানে সাবধান ১০·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ হত্যাপুরী ৮·০০ যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে ৮·০০ টিনটোরেটোর যীশু ১০·০০ ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু ১২·০০ দার্জিলিং জমজমাট ১২·০০

প্রোফেসর শঙ্কুর তাজ্জব কাহিনী ॥
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ১০·০০ সাবাস প্রফোসর শঙ্কু ১০·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ১২·০০ স্বয়ং প্রেফোসর শঙ্কু ১২·০০ শঙ্কু একাই ১০০ ১৪·০০
নানা রসের গল্পগ্রন্থ ॥
এক ডজন গপ্পো ১৫·০০ আরো এক ডজন ১৫·০০ আরো বারো ১২·০০
এবারো বারো ১২·০০ মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প ১০·০০ একের পিঠে দুই ২০·০০
তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ ১০·০০ ব্রেজিলের কালো বাঘ (অনূদিত) ১৫·০০
অন্য স্বাদের উপন্যাস ॥ ফটিকচাঁদ ১২·০০
স্মৃতিকথা ॥ যখন ছোট ছিলাম ১৫·০০
অনুবাদ-কবিতা ॥ তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম ১৬·০০
রূপকথা ॥ সুজন হরবোলা ২০·০০
সম্পাদিত গ্রন্থ ॥ সেরা সন্দেশ ৬০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

তবুও খাই। কতদিন কেউ এভাবে খেতে দেয়নি।"

একমুঠো মোটাসোটা বিস্কুট বোসবাবুর হাতে গছিয়ে দিয়ে মাখনের টিনটা সামনে ঠেলে দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "এরপর দেব দুধ। খেতে-খেতেই গপ্পো চালিয়ে যান। ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত পান্না-বুদ্ধ তা হলে আসল নয়?"

"একেবারেই নয়," গায়ে-গতরে ভারী তিনখানা বিস্কুট একসঙ্গে মুখে চালান করে দিয়ে খড়মড় করে চিবোতে-চিবোতে বললেন বোসবাবু। তারপরেই ঘ্যাঁচ করে এক আঙুল মাখন তুলে মুখে পুরে চুষতে-চুষতে শেষ করলেন আধবোজা চোখে, "ওয়াট ফারা কেও বৌদ্ধমঠে যা আছে, তা জাল মূর্তি। বুরবক বনে যাচ্ছে হাজার-হাজার ট্যুরিস্ট।"

"বলেন কী!" ধীরে সুস্থে একটা বিস্কুটে কামড় দিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ, "আসল বুদ্ধ তা হলে গেল কোথায়?"

"কোথায় আবার যাবে," উদাসভাবে চোখ বন্ধ করে ফেলে বললেন বোসবাবু। সারা মুখের অজস্র চামড়ার ভাঁজে অসংখ্য ঢেউ খেলে যেতে লাগল, চোয়াল নেড়ে-নেড়ে বিস্কুট চিবনোর সঙ্গে-সঙ্গে। "আছে শ্যামদেশেই, না, না, সরি, তার পাশেরই একটা দেশে।"

"পাশের দেশে! পাশে তো তিনটে দেশ আছে। বর্মা, লাওস আর চিন। কোনটার কথা বলছেন?"

এবার পুরোপুরি খুলে গেল বোসবাবুর দু'চোখের পাতা। কটা রঙের চোখে নিমেষে খেলে গেল ধূর্ততার ঝিলিক।

বললেন থেমে-থেমে, "এখন বলব না। শেরপা থুঙ্ ব্যাটা ঠিক শুনতে পাবে।"

"এখানে সে কোথায়?"

"আছে, আছে, বদমাশটা সব জায়গায় আছে, সবরকম ভাবে আছে। ওর আকাশে কান আছে, বাতাসে কান আছে। শুনতে চান কেন? দেখিয়ে দেব।"

"দেখিয়ে দেবেন? কোথায়?"

"যেখানে আছে আসল পান্না-বুদ্ধ, যেখানে আছে হাজার-হাজার মামাবাড়ির বুদ্ধ। যাবেন? নিয়ে যাবেন আমাকে?"

স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে ইন্দ্রনাথ, "হ্যাঁ যাব।"

পেট-কাটা মেয়েটা

তাই আমরা এসেছি লাওসে।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকেই গাঁইগুঁই শুরু করেছিলাম আমি। "যাওয়ার কথা তো শ্যামদেশে, যাচ্ছি কিন্তু লাওসে। কেন?"

তেরিমেরি গলায় বলে উঠেছিলেন বোসবাবু, "দূর মশাই, অত ফ্যাচ-ফ্যাচ করছেন কেন? চুপ করে থাকুন না।"

আহত গলায় বলেছিলাম, "আর-একটু ভাল গলায় জবাবটা দিলে হত না। যাচ্ছি অনেক দূর দেশে। কতদিন একসঙ্গে ঘুরতে হবে আপনি জানেন না, আমিও জানি না। গোড়াতেই মেজাজটা মাটি করে দেবেন না।"

অমনি সারামুখে চামড়ার ভাঁজগুলোয় হাজারখানেক হিল্লোল তুলে হেসে উঠলেন বোসবাবু, "রাগ করবেন না, রাগ করবেন না। অ্যাংজাইটি আর টেনশনে আমার নার্ভের দফারফা হয়ে গেছে। ওই ব্যাটা শেরপা থুঙ্ যদি শুনে ফ্যালে কোথায় যাচ্ছি..."

"কোনও শেরপারই টিকি দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত।"

"সেইজন্যেই তো ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। ব্যাটা যদি আবার একখানা র‍্যাম্বো ছেড়ে দেয়..."

"এখন আর ছাড়বে না। বুদ্ধমূর্তিদের সামনে পৌঁছলেই কিন্তু বাক্সগুলোই উপুড় করে ধরবে আপনার মুখের ওপর।"

সঙ্গে-সঙ্গে বোসবাবুর মুখের রং পালটে গেল। মুখের ওপর কিলবিলে মাকড়সাদের অনুভব করেই যেন কীরকম হয়ে গেলেন। মনে হল এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

ইন্দ্রনাথ পাশ থেকে গা টিপে দিয়ে বললে নরম গলায়, "ঘাবড়াবেন না, আমি আছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি আছেন," ঢোক গিলতে-গিলতে বললেন বোসবাবু, "আপনার গুলি ফসকায় না। দেখলাম তো চোখের সামনেই।"

অনেক রকম কলকাঠি নেড়ে বিদেশ যাওয়ার হাজার বেড়াজাল পাশ কাটিয়ে ইন্দ্রনাথ আমাকে আর বোসবাবুকে এনে ফেলেছে লাওসে। নিদারুণ অ্যাডভেঞ্চারের লোভে আমিও টাকা ওড়াচ্ছি দেদার। মাঝেমধ্যেই এমনই করি আমি। জমানো টাকায় ময়লা জমতে দিই না। টিকটিকি বন্ধু ইন্দ্রনাথও কম যায় না। মাথা খাটিয়ে চোর-ডাকাতদের শায়েস্তা করে রোজগার করে যেমনই, খোলামকুচির মতো টাকাও ওড়ায় তেমনই। তা ছাড়া, বিয়ে-থা করেনি। অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবনে কোনও নেশা নেই। তা না হলে মাইকেল পল ওরফে বোসবাবুর পিলে-চমকানো কাহিনী শুনে এতদূর কেউ দৌড়ে আসে?

টাকা ওড়াচ্ছি শুধু আমরা দু'জনেই, হাত উপুড় করছেন না বোসবাবু। কাটা রেকর্ডের মতো একটা কথাই তিনি বলে যাচ্ছেন বারবার, "সুদে-আসলে সব ফিরিয়ে দেব, মশাই। একবার শুধু নিয়ে চলুন আমাকে পান্না-বুদ্ধদের সামনে।"

"সেটা কোথায় তা বলবেন তো?"

এ-প্রশ্নটা শুধু আমিই করে গেছি, ইন্দ্রনাথ মুখে চাবি দিয়ে থেকেছে। মুখনাড়া খেয়েছি প্রতিবারেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া দৈত্যর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বিড়াল-চোখ নাচিয়ে-নাচিয়ে বোসবাবু দিয়ে গেছেন একটাই জবাব, "না আঁচালে বিশ্বাস নেই। আগে দেখি আমার মন যা জেনেছে তা সত্যি কি না, বলব তারপর।"

জ্বালা বটে!

পলকে পলকে মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছে আরও একটা কারণে। পুরো ট্যুর প্রোগ্রামটা কনডাক্ট করে যাচ্ছেন বোসবাবু একাই। আমরা দুই বন্ধু কেবল কাঁড়িকাঁড়ি টাকাই খরচ করে যাচ্ছি। কিছু বলতে গেলেই ইন্দ্রনাথ আমার গা টিপে দিয়ে আড়ালে-আবডালে বলছে, "চুপ করে থাক না? ব্যাপারটা খুব মিস্টিরিয়াস।"

"ধুত্তোর মিস্ট্রি!" তেড়েমেড়ে জবাব দিয়ে গেছি আমিও, "কেন যাচ্ছি, শুধু এইটুকু ছাড়া কোথায় যাচ্ছি, কী ভাবে যাচ্ছি কিছুই জানছি না..."

"সেটাও তো একটা মিস্ট্রি," মুচকি হেসে বলেছে ইন্দ্রনাথ, "বোসবাবুর মনের ক্ষমতার প্রমাণ তো পেয়েছিস? বেশি জানতে চাসনি, আবার র‍্যাম্বো তেড়ে আসবে!"

ফলে গজগজ করেই শুরু হয়েছে আমার আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার। আশ্চর্য বলে আশ্চর্য! ইন্দ্রনাথের পাল্লায় পড়ে প্রাণটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়েছে অনেকবার। কিন্তু এরকম রহস্য, এরকম চমক, আর এরকম দিশেহারা কাণ্ডকারখানায় কখনও পড়িনি।

তবে হ্যাঁ, লাওসের কোনও অজ পাড়াগাঁ থেকে শুরু হয়নি বিচিত্র এই পর্যটন-পর্ব, প্লেন থেকে নেমেছি একেবারে রাজধানীতে, যার নাম

ভিয়েনতিয়ানে। প্রথম প্রথম আমার নিজেরও গুলিয়ে যাচ্ছিল ভিয়েতনাম আর ভিয়েনতিয়ানে নাম দুটোর মধ্যে। তারপর মুখস্থ হয়ে গেছে ভিয়েনতিয়ানে নামটা। লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে। ভিয়েতনাম দেশটা রয়েছে লাওসের ঠিক পাশে। একডজন বছর ধরে রাশিয়া আর আমেরিকার রাজনীতির লড়াই চলেছিল যে দেশে, আমি এসে দাঁড়িয়েছি সেই দেশের রাজধানীতে।

লাওস। রাজাদের আমল গেছে, এখন মার্ক্সিস্ট লেনিনিস্ট রাজত্ব দেশজোড়া মানুষের মনে আশা আর মুখে হাসি এনে দিয়েছে। এতদিন যে দেশ 'মুয়ান' অর্থাৎ স্রেফ আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে মশগুল হয়ে ছিল—এখন সেখানে কাজের জোয়ার এসেছে।

মেকং নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম, অনেকদিন পর বেরিয়েছি বাংলার বাইরে, ভারতের বাইরে এই প্রথম, কিন্তু কেন জানি না মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে রয়েছি ভারতের মাটিতেই। গঙ্গার জল দেখছি মেকং নদীর বুকে!

"সঙ্ কাবোই ?" কানের কাছে হঠাৎ বিদঘুটে দুটো শব্দ শুনেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম বছর নয়েক বয়সের একটি লাও মেয়েকে। পুরু ঠোঁট দুটোয় যেন রাজ্যের অভিমান। ছোট-ছোট দুটো চোখের একটায় পাথরের চোখ বসানো। হলুদ রঙের ফ্রকটা গুটিয়ে পেটের ওপর তুলে রেখেছে বলে দেখা যাচ্ছে তার লম্বালম্বিভাবে কাটা-পেটের সেলাই। চামড়া গুটিয়ে গিয়ে জোড়া লেগেছে। দু' হাতে দুটো নীল রঙের জিন প্যান্ট বাড়িয়ে ধরে আবার সে বললে, "সঙ কাবোই ?"

শাঁ করে কোত্থেকে ছুটে এলেন বোসবাবু। এই মারেন কি সেই মারেন করে বাচ্চা মেয়েটাকে কী যে ছাই বলে গেলেন উনিই জানেন। মুখ চুন করে চলে গেল মেয়েটা। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন আধবুড়ো লাও। ফেরিওলা নিশ্চয়। কাঁধে অনেক জিন প্যান্ট। সবই নীল রঙের। হাত তুলে দেখাল আমাদের। শিকারি বিড়ালের মতো গোঁফ নাচিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঘুসি পাকিয়ে মেয়েটার হাত ধরে চলে গেল লোকটা।

রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়ালাম বোসবাবুর দিকে, "ছিঃ ছিঃ! একফোঁটা মেয়ের ওপর ঝালটা না ঝাড়লেই পারতেন।"

বোসবাবু হাত-পা ছুঁড়ে বললেন, "স্পাই! স্পাই! মাকড়সা চালান করতে এসেছিল।"

"মাকড়সা! মাকড়সা দেখলেন কোথায় ?"

"আপনার চোখ থাকলে তো দেখবেন ?"

"সঙ্ কাবোই মানে কি মাকড়সা ?"

"আজ্ঞে না, সঙ্ কাবোই মানে ব্লু জিনের প্যান্ট। লাওসে তৈরি। সব লাও এখন এই প্যান্ট পরে।"

"আমিও না-হয় পরতাম।"

"তার আগেই মরতেন। পকেটে মাকড়সা পুরে সেফটিপিন দিয়ে মুখ আটকে রেখেছিল।"

"অ্যাঁ!" ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিলাম নিশ্চয়।

বোসবাবু অভয় দেওয়ার ভঙ্গিমায় বললেন, "ভয় পাবেন না, অত ঘাবড়ে যাবেন না। আমি তো আছি, আর আছেন ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

কে প্রথম

ঘোড়ায় চড়ে বুয়েনস আইরেস থেকে ওয়াশিংটন

ত্রিশ বছরের সুইস শিক্ষক অ্যামি ফেলিক্স শিফেলি (Amie Felix Tschifelly) ঘোড়ায় চড়ে এই অবিশ্বাস্য দশ হাজার মাইল পথে যাত্রা শুরু করেন ১৯২৫ সালের ২৩ এপ্রিল। তাঁর সঙ্গে ছিল দু'টি ঘোড়া, একটিতে চড়বেন আর অন্যটি মালপত্র বইবে। বৃষ্টিসিক্ত আর্জেন্টিনা অতিক্রম করে, আন্দিজ পর্বত পার হয়ে তিনি পৌঁছলেন বলিভিয়ায়। আন্দিজ পর্বত পার হওয়ার সময় তাঁকে রক্তে বিষক্রিয়ায় ভুগতে হয়। বলিভিয়া থেকে বিপজ্জনক পাহাড়ি পথ পেরিয়ে এবং রক্তপিপাসু ইন্ডিয়ানদের এলাকার ভিতর দিয়ে পৌঁছে গেলেন পেরুর উষ্ণ সমভূমিতে।
১০০ মাইল চওড়া এক মরুভূমি অতিক্রম করে এবার নদীপথে স্টিমারে চেপে ৪০০ মাইল উত্তরে গেলেন শিফেলি। একটি ঘোড়া জখম হওয়ায় পানামায় তাঁর দেরি হয়ে যায়, কিন্তু ডেথ মাউন্টেন ডিঙিয়ে পৌঁছে গেলেন কোস্টারিকায়। তারপরে নিকারাগুয়ার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য জাহাজে চাপলেন। কারণ নিকারাগুয়ায় তখন বিপ্লব চলছিল। মেক্সিকোয় তাঁর অন্য ঘোড়াটি জখম হয়। ডাকাতসঙ্কুল অঞ্চল পার করে তাঁকে আমেরিকার সীমান্তে পৌঁছে দিল গ্রিক সামরিক রক্ষী-দল। তবে ওয়াশিংটনের পথে যানবাহন তাঁর কাছে আরও বেশি বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। যাত্রা শুরুর সাড়ে-তিন বছর পরে ১৯২৮ সালের শরৎকালে আমেরিকার রাজধানীতে পৌঁছলেন শিফেলি।

লক্ষ্যভেদী ইন্দ্রনাথ রুদ্রের গুলি কখনও ফসকায় না। হাঃ হাঃ হাঃ! মশাই, মেয়েটার পেট-কাটা দেখেই গলে গেলেন?"

ঢোক গিলে বলেছিলাম, "ওরকম বীভৎস ভাবে পেটটা কাটল কী করে?"

"বোমায়···বোমায়···আমেরিকান বোমায় একখানা চোখ গেছে, পেটও ফেটেছে। ওরকম কেস এদেশে ঢের দেখবেন। গলে যাবেন না, গুপ্তচরের বেশে এদেরকেই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের পেছনে। পান্না-বুদ্ধর ঠিকানা যে শুধু আমিই জানি। হাঃ হাঃ হাঃ!"

মাথার মধ্যে কীরকম যেন করে উঠল সেই হাসি শুনে। ইদানীং বোসবাবু যখন-তখন এই রকম বিটকেল হাসি হেসে চলেছেন। নদীর পাড়ে জেটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অনেক মানুষই ঘুরে দাঁড়াল সেই হাসি শুনে। দূর থেকে হনহন করে হেঁটে আসতে দেখলাম ইন্দ্রনাথকে।

জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ? মেকং-এর দু' পাড়েই ঘন সবুজ গাছপালার জটলা বড্ড বেশি। শহুরে মানুষ আমি। আমার কাছে তা জঙ্গল বলেই মনে হয়। অনেক বড় নৌকো ভাসছে তীর ঘেঁষে। নৌকো না বলে সেগুলোকে কাঠের ভাসমান বাড়ি বলা উচিত। লাওসে ঋতু বিপর্যয়ের জন্য মানুষগুলো ডাঙার চাইতে জলে থাকাই অনেক নিরাপদ মনে করে।

ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে এল এইরকমই একটা বড় বজরার সামনের জঙ্গল থেকে। বজরা থেকে একটা কাঠের পাটাতন নেমে এসেছে তীর পর্যন্ত। জঙ্গল শুরু হয়েছে জলের ধার থেকেই। ইন্দ্রনাথ কি ওইখানেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল?

বিমূঢ় চোখে চেয়ে থাকায় প্রথমটা খেয়াল করিনি। তারপর স্পষ্ট দেখলাম, গাছপালার সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক। গায়ে তার মিলিটারি পোশাক। জংলা পোশাক বলেই পাতা আর ডালের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে তার হাতের অটোমেটিক রাইফেল থেকে। অত দূর থেকেও বুঝলাম লোকটা অনিমেষে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকেই।

মাছপুকুরে বিস্ফোরণ

তুরুক-নাচ নেচে নিয়ে বললেন বোসবাবু "কোথায় গিয়েছিলেন?"

পেছনের জঙ্গল দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওখানে···"

র‍্যাম্বো-রা কিন্তু ওঁত পেতে আছে। একটু আগেই মৃগবাবু স্বর্গে চলে যেতেন।"

বলার ঢঙ শুনে গা চিড়বিড় করে উঠল আমার। বললাম, "অত ক্যাবলা ভাববেন না আমাকে। এক মাকড়সার ভয়েই তো আপনি কুপোকাত। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেই কাটিয়ে চলেছি বছরের পর বছর।"

অট্টহেসে বললেন বোসবাবু, "সে তো মিঃ রুদ্র আপনার সঙ্গে আছেন বলে। কিছু মনে করবেন না, সার, লেখকরা কলম আর কাগজ নিয়েই শুধু আস্ফালন করে যান। কাজে নামলে···"

বাধা দিল ইন্দ্রনাথ, "বজরায় যাবেন, না গাড়ি নেবেন?"

থমকে গিয়ে মেকং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন বোসবাবু। একটু একটু করে ঘোলাটে হয়ে এল চোখ দুটো। হাওয়ায় উড়ছে পাতলা সিল্কের মতো রুখু চুল। মানুষটাকে এখন আর স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

একটু পরে বললেন জড়িত স্বরে, "একটু ভাবতে দিন। মনের ছবি কেন যে ছাই স্পষ্ট হচ্ছে না···।"

মেকং-এর দিকে তাকিয়ে বোসবাবু যখন ধ্যানস্থ, ইন্দ্রনাথ আমাকে টেনে নিয়ে সরে এল একটু তফাতে। বললে, "কী হয়েছিল রে?"

বললাম সঙ্ কাবোই আর পেট-কাটা মেয়েটার কথা।

সব শুনে বললে, "সঙ কাবোই মানে কাউবয় ট্রাউজার্স। লাও জোয়ানরা এখন এই প্যান্ট পরে। বিদেশী দেখে তোকেও পরাতে এসেছিল। বোসবাবু ধরেছেন ঠিকই। লোভে পড়ে এতক্ষণে পরলোকে চলে যেতিস।"

"তার আগে যেতে হত ওয়াট-এ," পেছন থেকে বলে উঠলেন বোসবাবু।

"সেটা আবার কোথায়?" সকৌতুকে শুধোয় ইন্দ্রনাথ।

"ওয়াট মানে মঠ। পরলোকেই যান আর ইহলোকেই থাকুন—ওয়াটে আপনাকে যেতেই হবে।"

রেগে যাচ্ছিলাম। কথা ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ, "আপাতত যাবেন কোন চুলোয়?"

"মন ব্যাটা বড় বেগড়বাঁই করছে। চলুন, রুট থার্টিন ধরে রাজধানী ছেড়ে একটু বেরনো যাক। কখন যে ফ্ল্যাশ দেবে মনের ভেতরে তা ভগবান জানেন।"

"চলুন।"

তাই আমরা রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে থেকে বেরিয়ে পড়েছি রুট থার্টিন সড়ক ধরে। চলেছি উত্তর দিকে। এখন শুকনো ঋতু। মাস তিনেক আগে থেমেছে বিরামবিহীন বৃষ্টি, বর্ষা আসতে আরও পাঁচ মাস।

"লাওস দেখবার উপযুক্ত সময় এটা," বিড়বিড় করে বললেন বোসবাবু।

"আপনার মনের জ্যোতির ফোয়ারা খুলে দেওয়ারও উপযুক্ত সময় বটে, টিপ্পনী কাটলাম আমি।

কুতকুতে চোখে শুধু আমার দিকে তাকিয়েই ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বোসবাবু। বেশ বুঝছি, ঝড় উঠেছে ওঁর মনের আকাশে। তাই এই অবস্থা। লোকটা একটা সচল রহস্য। যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি।

খোলা-জিপ হু-হু করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।বাদামি রঙের ধানখেত। চষা মাঠ। ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। গোড়াগুলো রোদে জ্বলে বাদামি হয়ে রয়েছে। গাড়ি মেরামতের একটা টিনের চালাও দেখলাম। ইংরেজিতে লেখা রয়েছ সাইনবোর্ডে 'সুইডেন প্রতিষ্ঠিত'। তারপরেই একটা মুরগির খামার। 'অস্ট্রেলিয়ান সরকারের উদ্যোগে' বোমায় বিধ্বস্ত লাওসকে গড়তে এগিয়ে এসেছে অনেক দেশ। শ্রীবৃদ্ধির ছাপ দু'পাশে দেখতে পাচ্ছি। কিছু বাড়ি লাও কায়দায় তৈরি হলেও থামগুলো কিন্তু আধুনিক কংক্রিটের। কাঠের নয়। খানকয়েক বাড়ি ইট দিয়েও গড়ে উঠেছে। এতক্ষণে দেখলাম একটা সবুজ ধানখেত। নতুন চারা গজাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান উপদেশে একই বছরে দু'বার ফলনের আয়োজন। সাইনবোর্ডের লেখা থেকেই যে-কোনও ট্যুরিস্ট যাতে বুঝতে পারে, সে ব্যবস্থার ত্রুটি নেই কোথাও। খেতের জল আসছে নাম গুম বাঁধের জলাধার থেকে।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম জলবিদ্যুৎ বাঁধে।ট্যুরিস্ট জিপ দেখেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন ম্যানেজার নিজেই। তড়বড় করে অনেক কথাই বলে গেলেন। এই কিছুদিন হল সুইডেন থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছেন। পাঁচখানা জেনারেটর আর অন্যান্য সরঞ্জাম

এসেছে জাপান, পশ্চিম জার্মানি আর ইণ্ডিয়া থেকে। সুইজারল্যান্ড দিয়েছে কারিগরি দক্ষতা, বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা।

ম্যানেজারের বক্তৃতা শুনলাম শুধু আমি আর ইন্দ্রনাথ। বোসবাবু সরে গেছেন অনেক তফাতে। বারোশো ফুট লম্বা বাঁধের মাথায় যে রাস্তা, তার ওপর দাঁড়িয়ে উনি আধবোজা চোখে চেয়ে রয়েছেন উত্তর-পুবের পাহাড়গুলোর দিকে। বিশাল সবুজ সরোবরে ছায়া ভাসছে পর্বতমালার।

ম্যানেজার হাত-পা নেড়ে বললেন, "লেকের জল কত গভীর জানেন ?"

"কত ?" আনমনা গলায় বললে ইন্দ্রনাথ। ওর চোখ বোসবাবুর দিকে।

"১৮০ ফুট। রোজ দশ টন মাছ ওঠে জল থেকে। মোট দশ রকমের মাছ। আর ওই যে তিনটে দ্বীপ দেখছেন, ওদের নাম শান্তির দ্বীপ, ছেলে দ্বীপ, মেয়ে দ্বীপ।"

"এরকম নাম কেন ?" এবারের প্রশ্ন আমার।

"স্বাধীনতার পর অশিক্ষিতদের ওই তিনটে দ্বীপে রেখে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের আর ছেলেদের রাখা হয়েছিল আলাদা দ্বীপে।"

"আর ওই উঁচু পাহাড়টা ? ওর নাম কী ?"

"ফৌবিয়া, এদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। হাইট ন'হাজার দু'শো পঁয়তাল্লিশ ফুট।"

নীল আকাশের বুকে ঠিক যেন ধোঁয়ায় গড়া চুড়ো লেপটে রয়েছে। চোখ নামিয়ে দেখলাম, বোসবাবুও একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন সেদিকে।

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্দ্রনাথ এবার এগোল ওঁর দিকে। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালাম পেছনে। বোসবাবু টের পেলেন না। কান পেতে শুনলাম ফিসফিস করে উনি বলছেন, "কলসির মাঠে দৈত্যদের উনুন···পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তি···ধুস্ ! যোগে মিলছে না !"

ফেরার পথে জিপ দাঁড়াল একটা মাঠের পাশে, বোসবাবু উত্তেজিতভাবে জিপের মধ্যে সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন বলেই জিপ দাঁড়িয়েছে।

লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেই উনি দৌড়লেন মাঠের মধ্যে। পেছনে আমি আর ইন্দ্রনাথ।

উঁচু রাস্তা থেকে দেখেছিলাম, তেপান্তরের মাঠে অজস্র গর্ত। ঠিক যেন চাঁদের বুকে উল্কাপাতের গহ্বর। কাছে গিয়ে দেখলাম, প্রতিটা গোল গর্তে জল ভর্তি, তাতে ঘাই মারছে অজস্র মাছ।

মাছের পুকুর প্রত্যেকটা গর্ত।

লাফাতে লাফাতে বললেন, "দেখলেন। দেখলেন। আমেরিকান বোমার কাণ্ড দেখলেন।"

হতভম্ব গলায় বললাম, "কী বলছেন, খুলে বলুন।"

"আর কত খুলে বলব মশাই ? আকাশ থেকে টপাটপ বোমা ফেলে গর্ত বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বোমারুরা। এখন তাতে হচ্ছে মাছের চাষ। একজন চাষি দুঃখ করেছিল মাছের পুকুর নেই বলে। সেই রাতেই পড়ল বোমা। চাষি পেল পুকুর।"

"আপনি পেলেন কী ?" আচমকা পাশ থেকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় ইন্দ্রনাথ।

"আ···আমি ! আমি আবার কী পাব ?" হকচকিয়ে গেলেন বোসবাবু।

"বোমায় কারও পেট ফেটেছে, কারও চোখ গেছে, কারও বাবা-মা সর্বস্ব গেছে, আবার কেউ পেয়েছে মাছের পুকুর, কেউ হয়েছে ফকির, কেউ হয়েছে উজির। বোমায় লণ্ডভণ্ড লাওস-এর মাটি ফেটে পুকুর গজায়, পান্না-পাথরের বুদ্ধমূর্তিরা কেন উঠে আসে না ?"

কথাটা ঠাট্টা করেই বলেছিল বোধ হয় ইন্দ্রনাথ। ওর চোখ-মুখের হাসি তার প্রমাণ। কিন্তু বোসবাবুর মুখটা শুকিয়ে কালো হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে বাঁ দিকে একটা মাছের পুকুর ফেটে উড়ে গেল আকাশের দিকে। কানে তালা লেগে গেল ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াজে। ধুলো আর জল আকাশে ছিটকে গিয়ে নেমে এল আমাদের সারা গায়ে।

ধোঁয়া কেটে গেলে বোসবাবুকে আমাদের পাশে দেখতে পেলাম না।

মেকং নদীর সোনার চড়া

বারুদের ধোঁয়ায় কাসতে-কাসতে বললাম, "গেলেন কোথায় বোসবাবু ?"

নির্বিকারভাবে আশপাশে তাকাতে-তাকাতে ইন্দ্রনাথ বললে, "ড্রাইভার আগেই বলেছিল, এ-মাঠে বোমার গর্তে এখনও অনেক বোমা পড়ে আছে। আকাশ থেকে পড়েও ফাটেনি।"

"তুই জানতিস ?"

"জেনেশুনেই তো এসেছি," ইন্দ্রনাথের গলার সুরে এবার হেঁয়ালি ফুটে ওঠে, "বোসবাবু নিজে হুজ্জুতি করে নেমে না পড়লে আমিই নামতাম।"

"বোমায় উড়ে যাওয়ার জন্য ?"

"মৃগ, বারো বছর ধরে, যে বোমাগুলো এদেশের নানান জায়গায় পড়ে রয়েছে, খুব জোরে ঘা না মারলে যারা ফেটে যায় না, আচমকা আজ তারা কেন ফেটে উড়ে গেল বল তো ?"

"জবাবটা তুই জানিস মনে হচ্ছে ?"

"আমি ? হয়তো জানি। কিন্তু এখন বলব না। সময় এলে অনেক কিছুই জানতে পারবি, মৃগাঙ্ক। তোর গল্পের ভাঁড়ারে এমন গল্প এর আগে আর জমা পড়েনি। যথাসময়ে বুঝবি, চল, খোঁজা যাক বোসবাবুকে।

"কোথায় তিনি ?"

"যেখানে বোমা থাকার আশঙ্কা নেই, সেখানে।"

বলে আমার কাঁধ ধরে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আঙুল তুলে দেখাল ইন্দ্রনাথ। দেখলাম, দূরে উঁচু রুট থার্টিন সড়কের জিপে উঠে বসে আছেন আমাদের রহস্যময় সঙ্গী মাইকেল পল ওরফে বোসবাবু।

কাছে যেতেই দাঁত বের করে হাসলেন ভদ্রলোক। হলুদ দাঁত। উনি যে কখনও দাঁত মাজেন না, সেটা একসঙ্গে বেরিয়ে ইস্তক লক্ষ করছি।

বললেন, "খুব জোর বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস একদম সামনের গর্তে এক্সপ্লোশনটা ঘটেনি।"

"ঘটলেও আপনার কিছু হত না," ইন্দ্রনাথ ওর সেই বিখ্যাত ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললে, "রাখে কেষ্ট, মারে কে। কেষ্ট এখন আপনাকে দিয়ে পান্না-বুদ্ধ খোঁজাচ্ছেন। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে।"

হাঃহাঃ করে আবার বিচ্ছিরি হাসি হেসে বোসবাবু বলে উঠলেন, "আপনার কেষ্টকে বলুন আমার ব্রেনে পান্না-বুদ্ধদেব ঠিকানার ছবিটা কেবল ভাসিয়ে দিতে। ব্রেন যে ফাংশন করছে না একেবারেই।"

"এরকম শক্ পেয়েও করছে না ? " বোসবাবুর চোখে-চোখে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ।

সে চোখের চাহনি বড় অসাধারণ। দূরবিনের মতো যেন মনের ভেতর পর্যন্ত দেখতে চায়। ইন্দ্রনাথ যখন এভাবে কারও দিকে তাকায়, তখন তার অবস্থা কাহিল না হয়ে যায় না।

বোসবাবু কিন্তু অটল রইলেন। ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রেখেই বললেন, "শক্ ? কিসের শক্ ?" গলার স্বর ঠাণ্ডা।

"এই যে আচমকা আওয়াজ, ধোঁয়া, চারদিক কেঁপে ওঠা..."

"ধুস ! ওতে আমার কিছু হয় না। চলুন, চলুন, ফেরার পথে 'কিলোমিটার সিক্স' দেখে যাই। যদি ব্রেন খোলে।"

আর কোনও কথা না বলে আমাকে টেনে নিয়ে জিপে উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। সেই সময়ে দেখলাম, মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা একদল লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে হনহন করে যাচ্ছে বোমা যে গর্তে ফেটেছে—সেইদিকে ।

বোসবাবুও তা দেখে নিয়ে তাড়া লাগালেন ড্রাইভারকে, "কুইক। কুইক !"

কিলোমিটার সিক্স একটা উপনগরী। ভিয়েনতিয়ানে শহরের বাইরে। আমেরিকানরা একসময়ে এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল, ইন্দ্রপুরী গড়ে তুলেছিল। এখন সেখানে লাও পিপলস রিভলিউশনারি পার্টির সদর আড্ডা। কড়া পাহারা দিয়ে চলেছে রাইফেলধারী শান্ত্রীরা।

দূর থেকে দেখেই চুপসে গেলেন বোসবাবু, "যাচ্চলে ! এখানেও মিলিটারি !"

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বললে, "ওরা তো দুশমনের যম। আপনার নয়।"

"ওদের দেখলেই আমার ব্রেন ফাঁকা হয়ে যায়। চলুন, চলুন।"

"এবার কোথায় ?"

"আগের রাজাদের রাজধানীতে।"

তাই এবার উড়ে যাচ্ছি আকাশ-পথে। বিশাল এই প্যাসেঞ্জার প্লেন তৈরি হয়েছে সোভিয়েত দেশে, উড়ছে লাওসের আকাশে। ভিয়েনতিয়ানে ছাড়িয়ে উত্তর দিকে যেতে-যেতে পায়ের তলায় পেরিয়ে এলাম অরণ্যসবুজ পাহাড়-পর্বত। ঠিক যেন সবুজ কার্পেট দিয়ে মোড়া উঁচু-নিচু পাহাড়গুলো। পায়ে খোঁচা লাগবে না যদি বিশাল পা নিয়ে হেঁটে যায় এর ওপর দিয়ে। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, মানুষজন থাকে না নির্জন এই প্রকৃতির দেশে। কিন্তু সে ভুল ভেঙে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। সবুজ আস্তরণ ফুঁড়ে উঠে আসছে নীলচে ধোঁয়া। আগুন জ্বালাচ্ছে লাও থিয়াঙ্ আর লাও সাউঙ্ উপজাতিরা। পাহাড়েই এদের বাস। পাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গল পুড়িয়ে ধানজমি বের করছে চাষ আবাদ করবে বলে। তিরিশ মিনিট পরে এসে গেল মেকং আর জেঙ নদীর সঙ্গম। বেশ কয়েকটা লাল আর সোনালি মঠ রোদ্দুরে ঝকমক করছে। বড় শান্তির দেশ এই লুআঙ্ প্রাবাঙ্। এখানে হাওয়া-গাড়ি নেই বললেই চলে। আকাশ-পথ থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু বৌদ্ধমঠ, সোনা আর মরকত দিয়েই তৈরি মনে হচ্ছে অত উঁচু থেকে।

কানের কাছে বোসবাবু ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছিলেন অনেকক্ষণ ধরেই। অপূর্ব সুন্দর মঠগুলোর দিকে আঙুল নামিয়ে বললেন, "ওই দেখুন, ওয়াট জিয়েঙ্ থঙ্। ওদিকে ওয়াট আফে, আর এই এদিকে তাকান, ওয়াট ভিক্সান।"

ভদ্রলোক অনেক খবর রাখেন। ওঁর এই বিরক্তিকর অট্টহাসিটা সহ্য করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু পাক্কা গাইডের মতো যখন কথা বলে যান, তখন মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে হয়। লাওস যেন ওঁর নখদর্পণে।

প্লেন থেকে নেমেও সেই প্রমাণ দিয়ে গেলেন বারবার। ভিয়েনতিয়ানে থেকে বেরোবার আগে উনিই বলেছিলেন, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে রয়্যাল প্যালেসে ঢোকা যাবে না। ইন্দ্রনাথ তক্ষুনি ফরেন মিনিস্ট্রিতে যোগাযোগ-তারবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিল লুআঙ্ প্রাবাঙে। তাই সহজেই ঢুকতে পারলাম সেখানে। বাইরে থেকে প্রসাদটা কাঠখোট্টা চেহারার হলে কী হবে, রিসেপশন-রুমে পা দিয়েই বুঝলাম রাজাদের জায়গায় এসেছি বটে। সোনা আর ব্রোকেডের ঝলমলানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর কি। ঘুরে-ঘুরে দেখলাম গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পাঠানো উপহারগুলো। মাও পাঠিয়েছেন একটা চায়ের কাপ, লিনডন জনসন দিয়েছেন মেডেল, শটগান পাঠিয়েছেন ব্রেজনেভ।

গুলি-গুলি চোখ করে বোসবাবু সবকিছুই দেখে যাচ্ছেন। ইন্দ্রনাথ রয়েছে ঠিক ওঁর পেছনে। ব্রেন যে কখন খুলবে, কখন বায়োস্কোপের মতন পান্না-বুদ্ধদের ছবি ভাসবে মনের পরদায়, সেই আশায় এরকম ঘোড়দৌড় জীবনে করিনি। ইন্দ্রনাথ আমার মতো কল্পনার ফানুস নয়। ও যে কেন হুট করে বোসবাবুর কথায় সায় দিয়ে মরীচিকার পেছনে দৌড়ে এল, তাও বুঝছি না। দু'চক্ষে দেখতে পারি না ওর এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটা, মাঝে-মাঝেই মনের সিন্দুকে ইয়াব্বড় তালা ঝুলিয়ে রাখে!

প্যালেস টুঁড়ে গেলাম মার্কেটে। পাহাড়ে চাষকরা আফিং বিক্রি করছিল পাগড়ি-পরা হোমোং মেয়েরা। পাহাড়ের বাড়ি থেকে এই বাজার তাদের কাছে মাত্র একদিনের পথ।

বোসবাবু আফিং-এর গুলিগুলোর দিকে গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে বলেই ফেললাম, "চলবে নাকি ? মৌতাতে পান্না-বুদ্ধদের ছবি এসে যেতে পারে মগজে।"

"ধুস !" বলে বেগে বাজার থেকে প্রস্থান করলেন বোসবাবু। পেছনে আমরা দুই বন্ধু।

পরের দিন ঠাণ্ডা ভোরে উঠে বসলাম নৌকোয়। মেকং নদীর চেহারা এখানে খুবই শীর্ণ। যেন খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। দু'পাশের পাড় খাড়াভাবে উঠে গেছে। উর্বর জমিতে চাষ আবাদ চলছে। মেয়েরা বালতি করে জল নিয়ে যাচ্ছে চাষের মাঠে ঢালবে বলে। গাছগাছড়া নদীর জল থেকেই গজিয়েছে অনেক জায়গায়। কুমড়োর মতন একরকম ঢাউস সবজি শুকোতে দেওয়া হয়েছে পাড় বরাবর।

আঙুল তুলে বললেন বোসবাবু, "ফাক নাম।"

"সেটা আবার কী ?" তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলাম বলে চমকে উঠেছি হঠাৎ বিদঘুটে শব্দ দুটো শুনে।

"ওই সবজিটার নাম। তোফা খেতে মশাই। ওর সঙ্গে বাঁশের টক-ঝোল, আর শুওরের ছক্কা।"

"আপনি খেয়েছেন মনে হচ্ছে ?"

"আপনিও চেটেপুটে মেরেছেন। এখান থেকেই সাপ্লাই যায় ভিয়েনতিয়ানে।"

জানি না হোটেলের কোন্ খানায় খেয়েছি ফাক নাম, শুওরের ছক্কা আর বাঁশের ঝোল, এখন কিন্তু গা পাক দিয়ে উঠল কথাটা শুনেই।

আচমকা ফের কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠলেন বোসবাবু, "লৌ লাও।"

"আবার কী হল ?"

"পানীয় মশাই, পানীয়। লাওদের অতি প্রিয় পানীয়। ওই দেখুন ভাত থেকে বানাচ্ছে।"

বাঁ দিকের তীরে খানছয়েক খড়ে ছাওয়া কুঁড়েঘরের দিকে আঙুল তুলে পানীয়খানাগুলো দেখাতে গিয়েই আচমকা উজান স্রোতের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গেলেন বোসবাবু। অস্ফুট স্বরে বললেন শুধু একটাই শব্দ, "সোনা !"

চকিতে মুখ ফেরাল ইন্দ্রনাথ। আমরা তিনজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি নৌকোর ছাদে। উজানে চলেছে নৌকো। কোথায় চলেছে তা জানতে চাইনি। বোসবাবু বলেননি। বললেন এখন।

"সোনা ! সোনা ! মেকং নদীর সোনা !"

কিন্তু কোথায় সোনা ? নদীর ঘোলাটে জলে শুধু দেখছি কালচে রঙের কাদাগোলা কিছু বালি বিভিন্ন রেখায় মিলেমিশে চলেছে। এর নাম কি সোনা ?

বোসবাবুর বিড়াল-চোখ কিন্তু জ্বলছে বললেই চলে। কণ্ঠে জেগেছে তীব্রতা, "ওই তো ! ওই তো ! সোনায় ভরা চড়া উঠে এসেছে জলের ওপর !"

অদূরে দেখলাম সেই দৃশ্য। নৌকো প্রতিকূল স্রোত ঠেলে এগোচ্ছে সেই দিকেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : বিমল দাস

নব বারাকপুর উপনিবেশ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

নব বারাকপুর স্টেশনের খুব কাছেই নব বারাকপুর উপনিবেশ বালিকা বিদ্যালয়। স্কুলের অদূরে পুব দিক দিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে যশোহর রোড। আজকের নব বারাকপুরের অন্যতম রূপকার এবং নব বারাকপুর কলোনিরও স্রষ্টা ছিলেন হরিপদ বিশ্বাস। ব্যক্তিগত জীবনে সামান্য সরকারি কর্মচারী ছিলেন তিনি, অথচ এতদ্‌অঞ্চলে অসামান্য কর্মবীররূপে তিনি আজও সকলের সম্মানের পাত্র। তিনি নব বারাকপুর উপনিবেশ উচ্চ বালিকা ও বালক উভয় বিদ্যালয়েরই প্রতিষ্ঠাতাই কেবল নন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ এবং শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ও তাঁরই অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছে। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন নব বারাকপুরের অন্যতম প্রাণপুরুষ।

নব বারাকপুর উপনিবেশ উচ্চ বালিকা

প্রধানশিক্ষিকা

বিদ্যালয় প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠে ১৯৫১ সালে। স্কুলবাড়ি বলতে তখন ছিল মাত্র একটা লম্বা চালাঘর। ১৯৫৭ সালে স্কুলটি মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। সরকারিভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের পরিচিতি পায় ১৯৭৬ সালে। এখন এর চারদিকে বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমে উত্তরে দুটি বিশাল দরজা। পুব-পশ্চিমে 'এল' প্যাটার্নের মস্ত বাড়ি। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা এক হাজারের কিছু বেশি। স্কুলের ভেতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। কিছুটা অংশ সবুজ ঘাসে ঢাকা। পশ্চিম কোণে বিশাল কলকে গাছটি ফুলে ফুলে ভরে আছে। দমদম বিমানবন্দরে বিভিন্ন বিমানের টেক অফ ও ল্যান্ডিংয়ের আওয়াজ স্কুলের ওপর যখন ছড়িয়ে পড়ে সচকিত হয়ে উঠতে হয়।

কচিকাঁচা মেয়েরা জানালা ও বারান্দা থেকে

মাঝে-মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দারুণ মজা উপভোগ করে। প্রথম-প্রথম ছাত্রীদের বেশ অসুবিধা হলেও এখন ওরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কথা হচ্ছিল এই স্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রেবা ঘোষের সঙ্গে। বেথুন কলেজে পড়ার সময় অধ্যাপিকাদের কাছ থেকে যে আদর্শের অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, তা তাঁর শিক্ষক জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। বাল্যকালে তিনি চট্টগ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করার সময় মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকে খুবই কাছ থেকে বহুবার দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের আদর্শ, দেশপ্রেম ও ত্যাগের মহিমা আজও তাঁকে আন্দোলিত করে। স্বাধীনতার আন্দোলনে তখন সারা ভারতবর্ষ উত্তাল। "এদেশের নারীশিক্ষা ও নারীমঙ্গলের জন্যে কিছু করা উচিত তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম।" শ্রীমতী ঘোষ কথায়-কথায় জানালেন,

ল্যাবরেটরিতে ছাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

পড়াশুনোয় ভাল ফলাফলের জন্য চাই বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ এবং নিয়মনিষ্ঠার। নিয়মিত লেখাপড়ার অভ্যাস। ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগী হওয়া অনেকটা নির্ভর করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়াশুনোয় আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর। এ-দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্ভাগ্য, নানা ধরনের অশুভ ছায়া দিন-দিন এতই বাড়ছে যে,স্কুলের পড়াশুনোর ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার আদর্শ ও মূল্যবোধ ক্রমেই ধ্বংস হতে চলেছে। এর ফলে প্রকৃত ছাত্রছাত্রীদের অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই এখানে পড়াশুনো করে বেশি। ভাল পড়াশুনোর চেয়ে পড়াশুনো কোনওরকমে চালিয়ে যাওয়া এলাকার মানুষজনের কাছে ভীষণ জরুরি।

স্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রেবা ঘোষ কথা প্রসঙ্গে জানালেন, "আমি পড়াশুনো করেছি বেথুন কলেজে। তখন বেথুন কলেজ নিয়ে চারদিকে নানা তর্ক-বিতর্কও চলত। বেথুন সাহেবের আদর্শ, নারীশিক্ষা ও নারী-প্রগতির চিন্তা-ভাবনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বেথুন কলেজ! সেই সময়ে এই কলেজের স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী মৃণালিনী ইমার্শন, নলিনী দাশ, তটিনী দাশ প্রমুখের কাছ থেকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। ছেলেবেলায় চট্টগ্রাম হাই স্কুলে স্বনামধন্যা শিক্ষয়িত্রী সুপ্রভা দাশগুপ্তার কাছে ছাত্রজীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার শিক্ষা পেয়েছিলাম। তখন

শারীরশিক্ষার ক্লাসে

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে স্নেহমধুর সম্পর্ক ছিল তা আজ গল্পকথার মতো। স্কুলের প্রতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের যে অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ছিল, তা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা মাস্টারমশাইরাও বোধ হয় সেদিনের মাস্টারমশাইদের মতো আর আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের সেভাবে ভালবাসি না। সব মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে পড়ছে অচলায়তন। ফলে শিক্ষাদানের আদর্শ ও শিক্ষালাভের উপযুক্ত পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সকলের চোখের সামনেই।"

প্রধানশিক্ষিকা কথায়-কথায় জানালেন, "১৯৮৪, '৮৬, '৮৮ সালে জেলা টেবিল টেনিস দলে খেলেছে এই স্কুলের ছাত্রী দেবাস্মিতা কর্মকার। পর-পর দু'বারই ওই টেবিল টেনিস দলটি রানার্স আপ হয়।"

এই স্কুলের বাংলার শিক্ষিকা নমিতা সেন, মৈত্রেয়ী ঘোষ, জলি সাহা জানালেন, "মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় দুটি পত্রের জন্য দু'শো নম্বর নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীরা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বাংলাতেই বেশি অমনোযোগী। সময়ও দেয় না সেভাবে। ফলে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বাংলাতে তারা নম্বরও পায় খুব কম। এর ফলে অনেকেরই রেজাল্ট ভাল হয় না।" ইংরেজির শিক্ষিকা ছবি চক্রবর্তী, সুব্রতা মুখোপাধ্যায়, অর্চনা দে ও কৃষ্ণা সান্যাল ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতির এখনও গোড়ায় গলদ। ইংরেজি একে তো বিদেশী ভাষা, তার ওপর এখন আগের মতো ইংরেজি পঠন-পাঠনেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা এখন কেবল কাজ চালানো গোছের টিক্‌মারা ইংরেজি শিখছে।"

"জীব-বিজ্ঞান ও ভৌত-বিজ্ঞান পঠন-পাঠনে ছাত্রীরা এখন খুবই আগ্রহী। সময়ও দেয় অনেক বেশি। ফলে এই বিষয়গুলিতে ছাত্রীরা নম্বরও পাচ্ছে ভাল।" বললেন এই বিষয় দু'টির শিক্ষিকা ছায়া দাম, আভা চৌধুরী, অঞ্জলি কর্মকার, সুস্মিতা বসু, বুলবুল শীল প্রমুখ।

"ছাত্রীদের ভূগোল পাঠে আগ্রহ বাড়লেও ইতিহাস পাঠের ভীতি ভূতের ভয়ের মতো পেয়ে বসেছে। ইতিহাসের বিশাল সিলেবাস ও অজস্র খুঁটিনাটি মনে রাখতে গিয়ে ছাত্রীরা এখন কেবল ভীতই নয়, অনেক সময়ে দিশেহারাও হয়ে পড়ছে। এ-ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনার বোধ হয় সময় এসেছে।" বেশিরভাগই অঙ্কে বেশ দুর্বল। অঙ্ককে তারা বাগে আনতে না পেরে, মুখস্থ বিদ্যাকেই

অরুন্ধতী সিংহ (দশম শ্রেণী)

অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় (নবম শ্রেণী)

মৌমিতা দত্ত (অষ্টম শ্রেণী)

রুমা চাকলানবিশ (সপ্তম শ্রেণী)

মৌমিতা মুখার্জি (ষষ্ঠ শ্রেণী)

প্রথম ছাত্রী

দেড়শো ছাত্রীর মধ্যে দশম শ্রেণীতে ৭১৮ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে **অরুন্ধতী সিংহ**। তার বাবা অশোককুমার সিংহ রেলওয়ে কর্মচারী। বাংলায়—১৩৩, ইংরেজিতে—৭১, অঙ্কে—৯৪, জীব-বিজ্ঞানে—৭৯, ভৌত-বিজ্ঞানে—৮৭ ও সংস্কৃতে সে পেয়েছে ৭৭।

অরুন্ধতী জানাল, তাঁকে পড়াশোনায় সাহায্য করেন পাঁচজন গৃহ-শিক্ষক। পঠন-পাঠনের জন্যে সে স্কুল ছাড়া আরও আট-দশ ঘন্টা সময় নেয়। খেলাধুলো সে তেমন পছন্দ করে না। অবসর সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়ের গল্পের বই ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা পাঠ করে। টিভিতে মাঝে-মধ্যে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা দেখে, দেখে ভাল সিনেমাও। "টেক্সট বই সব সময়েই আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। তারপর প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির উত্তর লিখি প্রাইভেট টিউটর ও রেফারেন্স বইয়ের সাহায্যে," জানাল অরুন্ধতী। সে আরও বলল, "লেখাপড়ায় আমি কখনও ক্লান্ত বোধ করি না। বরং উৎসাহিত হই, আনন্দ পাই। তবে সময় পেলেই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই কিংবা ছবি আঁকি। আমি একা। তাই বাবা-মা'র সঙ্গে পুজোর সময়ে বেড়াতে যাই। কখনও পাহাড়ে চড়ি, ঝরনা দেখি। নদ-নদী গাছগাছালি দেখেও আমি আনন্দ পাই, মনটাও খুশিতে ভরে ওঠে।" ভবিষ্যতে অরুন্ধতী বিজ্ঞান নিয়েই আরও পড়াশুনা ও গবেষণা করতে চায়। আগামী বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার জন্য, সে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

নবম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে **অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়**। সকালে ও রাতে তাঁর বাবা কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে পড়াশুনায় সাহায্য করেন। সে মোট ন'শো নম্বরের মধ্যে ৭১৮ পেয়েছে। তার মধ্যে বাংলায় ৭৪, ইংরেজিতে ৭৩, অঙ্কে ৯১, ভৌত-বিজ্ঞানে ৮৫, জীব-বিজ্ঞানে ৭৫ পেয়েছে সে। অবসর সময়ে সে খেলাধুলো, টিভি দেখা ও গান শুনতে ভালবাসে। ন'শো নম্বরের মধ্যে ৬৯৪ নম্বর পেয়ে অষ্টম শ্রেণীতে প্রথম ছাত্রী **মৌমিতা দত্ত**। সে নিজেই বাড়িতে পড়ে, বাবা-মা সাহায্য করেন। তার ইংরেজি ও ইতিহাস ভীষণ কঠিন বিষয় বলে মনে হয়। সে সংস্কৃততে ৯২, ভৌত-বিজ্ঞানে ৭৯, জীববিজ্ঞানে ৮৩ ও অঙ্কে পেয়েছে ৮৯। সে নাচ শেখে আর অবসরে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ও সত্যজিৎ রায়ের গল্পের বই।

রুমা চাকলানবিশ সপ্তম শ্রেণীতে ওঠা প্রথম ছাত্রী। সে সাতশোতে পেয়েছে ৫৯১। বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৯১, আর অঙ্কে পেয়েছে ৯৫। অবসর সময়ে গল্প, কবিতা পড়ে ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে ভালবাসে।

মৌমিতা মুখার্জি ছ'শোর মধ্যে ৫০৭ পেয়ে প্রথম হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছে। সে জানাল, "আমাদের এখনও ইংরেজি পড়ানো হয় না স্কুলে। তবে বাড়িতে আমি পড়ি।" 'ইতিহাস বেশ শক্ত', সে অনুযোগের সুরে জানাল। মৌমিতা আরও বলল, "বাকি সময়ে গান গাই, গল্পের বই পড়ি, নাচ শিখি আর বন্ধুদের সঙ্গে মনের আনন্দে খেলি।"

কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। অথচ এই অঙ্ক-ভীতি দূর হতে পারে যদি অঙ্কে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে নিয়মিত অঙ্ককষার অভ্যাস বাড়ানো যায়।" বললেন অঞ্জলি নিয়োগী মায়া বসু ও সতী ঘোষ প্রমুখ অঙ্কের শিক্ষিকা।

এই স্কুলের শরীর চর্চা ও খেলাধুলোর দায়দায়িত্বে আছেন—ইতিকা পাল ছাত্রীদের জিমনাস্টিক ও ব্রতচারী শেখান উমা গুহ রায়। এ ছাড়া এখানে কর্মশিক্ষা গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সূচি-শিল্প ও গৃহসাজানো ইত্যাদি এই স্কুলের ছাত্রীদের শেখানো হয়, বেশ যত্ন সহকারে।

এই স্কুলের মেয়েরা পড়াশুনোর ফাঁকে-ফাঁকে নানা সময়ে উৎসবে স্কুলটিকে মুখরিত করে তোলে। কচিকাঁচাদের প্রাণের স্পন্দন ও আনন্দ মূর্ত হয়ে ওঠে নবীনবরণ উৎসবে। আবিরে রাঙানো বসন্তোৎসবের বেশ-কিছু পরে আসে ২৫শে বৈশাখের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান। এ ছাড়া আছে নজরুলজয়ন্তী উৎসব ও স্কুল প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তাসের দেশ, শ্যামা ও চন্ডালিকা প্রভৃতি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলি স্কুলের ছাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ করে আনন্দ দিয়েছে সবাইকে।

খেলাধুলোতেও স্কুলের মেয়েরা এগিয়ে

পরেশচন্দ্র সরকার

ফোটো : অমিত দত্ত

কাগজের ঘূর্ণি

প্রথমে একটা কাগজকে লম্বায় ২০ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ২০ সেন্টিমিটার মাপে কেটে নাও। কাগজটা একটু শক্ত আর সামান্য মোটা হলে ভাল হয়। এবার পেনসিল দিয়ে কোনাকুনি দুটি লাইন টানো। ১নং ছবিতে যেমন দেখানো আছে।

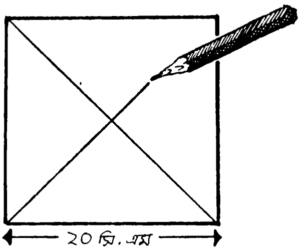

১নং ছবি

প্রত্যেকটা কোনা থেকে পেনসিল লাইন বরাবর ১১ সেন্টিমিটার মাপে একটা করে দাগ দাও। এবার দাগ দেওয়া ১১ সেন্টিমিটার মাপ পর্যন্ত কাঁচি দিয়ে চারটে কোণ কেটে নাও। ২নং ছবিটি ভালভাবে দেখলে বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না।

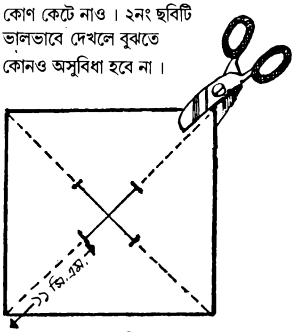

২নং ছবি

৩ ইঞ্চি মাপের একটা পেরেক নাও। প্রথমে মাঝখানে অর্থাৎ দুটো কোনাকুনি লাইন যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে সেখানে এবং প্রত্যেকটা ত্রিভুজের বাঁ কোনায় যেভাবে ৩নং ছবিতে দেখানো আছে সেইভাবে একটা করে ছিদ্র করে নাও।

এবার চারটে কোনা আস্তে করে বাঁকিয়ে মাঝখানের ছিদ্রের কাছে নিয়ে এসো। ৪নং ছবির মতো।

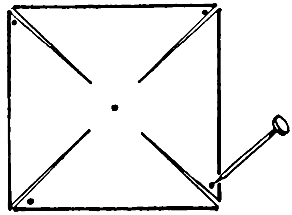

৩নং ছবি

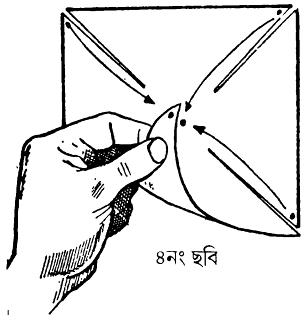

৪নং ছবি

পেরেকটা নিয়ে সবক'টা ছিদ্রের মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাও। খেয়াল রাখবে, পেরেকের মাথাটা উপরের দিকে থাকবে। ৫নং ছবিটি ভালভাবে লক্ষ করো।

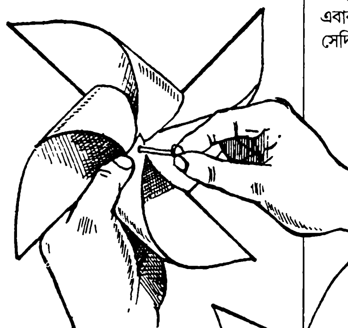

৫নং ছবি

একটা ১ সেন্টিমিটার চওড়া কাগজের ফালি নিয়ে ৬নং ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে সেইভাবে পাশটা আঠা দিয়ে জুড়ে নাও। এবার যেদিকে পেরেকটা বেরিয়ে আছে সেদিকে পাকানো কাগজটা লাগিয়ে নাও।

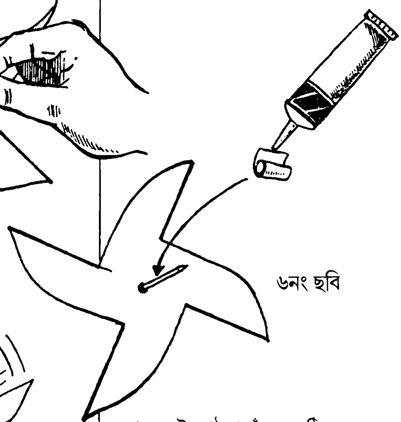

৬নং ছবি

এখন একটা কাঠ বা বাঁশের লাঠির মধ্যে পেরেকটা ঠুকে বসিয়ে নাও। চক্রটাকে আঙুল দিয়ে কয়েকবার ঘুরিয়ে একটু আলগা করে নিতে পারো। এবার হাওয়ার সামনে ধরো, দেখবে চক্র ঘুরতে শুরু করেছে। আরও ভাল হয়, প্রথমে যদি পোস্টার কালার দিয়ে পাখাগুলো সুন্দরভাবে রং করে নিতে পারো।

কবির

ভাগ্য আবার বিরূপ ! ডামাডোলের মধ্যে ববি স্মাইল্‌স আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে···এখন ওকে আবার খুঁজে পাই কী করে ?
ভস্ ভস্ ভস্
আমরা এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখছি ট্রেনটা যাচ্ছে···
এই রে ! ···মনে হয় আমাকে দেখেছে !
ওই তো ও বসে আছে !
মাস্টারমশাই ! ও মাস্টারমশাই ! পরের ট্রেনটা কখন ছাড়বে ?
পরের ট্রেন ?···কাল এই সময়ে···
হেরে গিয়েছি ! ও আমাকে আবার হারিয়ে দিয়েছে !··· তবে যদি···
এই !····দ্যাখো ! ওদিকে !
তাজ্জব কাণ্ড ! আমার গাড়ি নিজে-নিজেই চলে যাচ্ছে !
চলি, বন্ধুরা !···তোমাদের জন্য সুন্দর একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দেব !
অত্যন্ত দুঃখিত !···তবে এটা শুধু ধার নিচ্ছি !
হুররে ! ওদের ধরে ফেলছি ! আগের ট্রেনের ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি···

আমেরিকায় টিনটিন

হেল্লো ?...ব্লক ১৫২ ? একটা পাগলা এঞ্জিন মেলের পিছনে ছুটছে...হ্যাঁ...ওকে সাত নম্বরে পাঠাও...মেলের আগে যেন যেতে না পারে...
ঠিক আছে, বস্, নিশ্চিন্ত থাকুন !
উফ্ ! ঠিক সময়ে এসে পড়েছি ! মেলগাড়ি আসছে... ওর পিছনেই পাগলা এঞ্জিনটা...
যাচ্চলে ! আমাদের অন্য লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছে...
এক্ষুনি এঞ্জিন বন্ধ করে পিছিয়ে গেলেই ঠিক লাইনে উঠে যাব...
এইযা ! ব্রেক-লিভার জ্যাম । এখন বুঝতে পারছি এঞ্জিনটা মেরামতের জন্য যাচ্ছিল ।
!
ব্লক ১৬
জেম, লাইনটা সাফ করবার একটাই উপায় আছে—ডিনামাইট । হাতে ঢের সময় । পরের ট্রেন কাল সকালে...
জিম, ভাগ্য ভাল লাইনের ওপর ওই পাথরটা দেখেছি । সকালে মেলট্রেন এটায় ধাক্কা খেলে কী হত কল্পনা করো !...কী সর্বনাশ হত ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে ।

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** **সোনার তরী** মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ রোজেনজাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

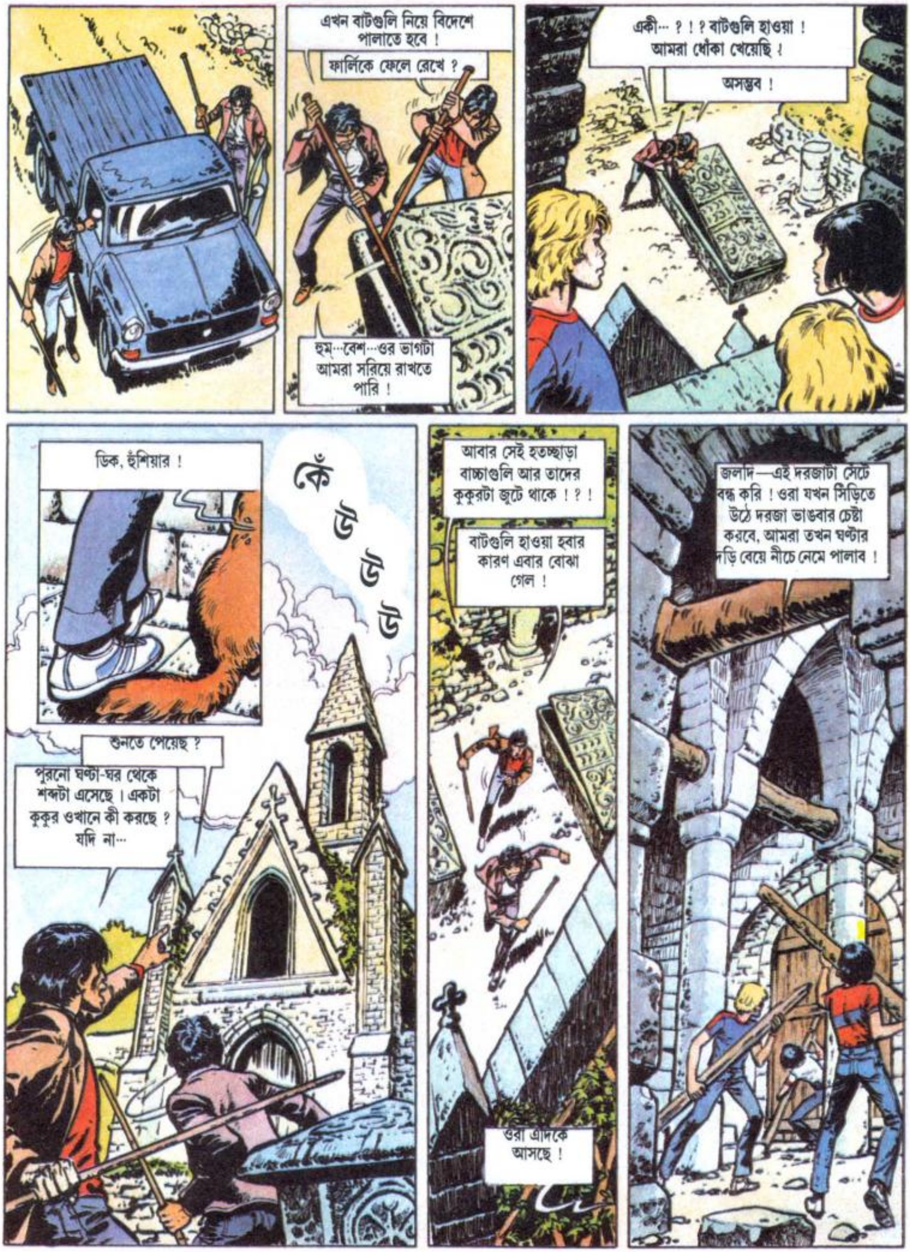

দড়াম !
তোমরা গিয়ে পুলিশকে খবর দাও । আমি এখানে থাকছি
জর্জ,তুমি কি পাগল হলে ?
কী বলছ ? ! ?
টিমি কখনও ওই দড়ি বেয়ে নামতে পারবে না ! আর টিমিকে আমি ওদের হাতে ফেলে রেখে যেতে পারব না ! তোমরা গিয়ে পুলিশ ডেকে আনো, আমি টিমির সঙ্গে থাকি !
তুমি থাকলে আমিও থাকছি !
কেন···আমাকে রক্ষা করতে ? ও কাজটা তোমার চেয়ে টিমি ঢের ভাল পারবে, ডিক !
ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে । জলদি যাও ! অ্যানকে নিরাপদ জায়গায় রেখে পুলিশকে খবর দেবে । তারপরে ফিরে এসে আমাকে সাহায্য করতে পারবে !
চললাম, জর্জ ! আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব !
মড়াত
গরর্‌র্‌

ডাক্তারবাবুর ম্যাপ

চুনীলাল রায়

বিকট একটা শব্দ করে হেঁচে ফেলল বৃকোদর। আচমকাই। রুমাল বের করে তাড়াতাড়ি নাক চাপা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাঁচির চোটে তার ড্রয়িং-এর কাগজপত্র সব ছিটকে পড়ল এদিক-ওদিক। ওয়ার্কশপ ফ্লোরের প্রায় সবাই দৌড়ে এল, "কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?"

"না, না, ব্যাপার তেমন কিছু নয়। নাকটাক চুলকে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসে বৃকোদর। তারপর জামার ভেতরের পকেট থেকে সাবধানে একটা ট্যাবলেট বের করে। এক গ্লাস জল নিয়ে ঢক করে গিলে ফেলে ট্যাবলেটটা।

তখনকার মতো ব্যাপারটা ওখানেই চুকে যায়। কিন্তু বৃকোদর জানে যে, এভাবে ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে ঘুরলে তো চলবে না। এরা ভীষণ সেনসিটিভ। তা ছাড়া এদের রকমসকমই আলাদা। ক'দিন আগেই একজন কর্মী কাজে যোগ দিতে এলেন। পর পর দু' দিন লেট হল তাঁর। কতই বা আর দেরি? সকাল ন'টায় কাজ শুরু, তা তিনি এলেন ন'টা একে। সঙ্গে-সঙ্গে রেড কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। দিয়ে দেওয়া হল এক মাসের মাইনে। এখানে তাঁর চাকরি নট।

এসব ভেবে বেশ ভয় পেয়ে যায়। তাই সে সুযোগ মতো বেশি করে ট্যাবলেট কিনে রাখতে চায়।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। মানে দাঁড় করাল বৃকোদর। বেলমোরের বেডফোর্ড অ্যাভিনিউ। সামনেই একটা পার্কিং জোন। খেয়াল করেছিল বৃকোদর। গাড়িটা রেখে এগিয়ে গেল ওষুধের দোকানের দিকে। উপায় নেই, আর উপায় নেই। বলতে-না-বলতেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে কঁটা হাঁচি দিল সে। রুমাল বের করার সময়ই পেল না। কী ভীষণ বাজে জিনিস এই সর্দি—ভাবতে গিয়েই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার। দেশ থেকে আসবার সময় অবশ্য বেশ কঁটা ট্যাবলেট ব্যাগে পুরে এনেছিল। কিন্তু তার সবই শেষ হয়ে গেছে।

"আমাকে কয়েকটা ট্যাবলেট দিন তো।" দোকানে গিয়ে বলল বৃকোদর।

কিন্তু শপের লোকটা বসেই থাকে। কী ব্যাপার? কানে শোনে না নাকি? বৃকোদর ভাবে। তারপর গলা চড়িয়ে বলে, "কী হল? আমকে ওষুধ দিন।"

দোকানের লোকটি এবার আড়মোড়া ভেঙে বলে, "কই, দেখি প্রেসক্রিপশন।"

"প্রেসক্রিপশন?" তার কথা শুনে বৃকোদরের চোখ কপালে উঠেছে তখন।

"ইয়েস সার, প্রেসক্রিপশনটা বের করুন।"

"এই ছোটখাটো ওষুধ কিনতেও ওসব লাগে নাকি?"

"তাই নিয়ম। না হলে…"বলেই শপের লোকটা বৃকোদরকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

বৃকোদর খুব অপমান বোধ করে। গজগজ করতে করতে বের হয়ে আসে সে। গাড়িতে চেপে বসে রেগেমেগে। নাঃ, আর ওষুধ কিনবে না সে। মনে-মনে ঠিক করে ফেলে। মজা এই—এসব ভাবতে-ভাবতেই একসময় সে হঠাৎ আবিষ্কার করে যে তার সর্দি সেরে গিয়েছে। নাকটা আর একেবারেই সুড়সুড় করছে না।

তবুও সাবধানের মার নেই। এক ডাক্তারবাবুকে দিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে নিয়ে বৃকোদর হাজির হয় এক ওষুধের দোকানে। দোকানের লোক বলে, "ঘুরে আসুন আধঘন্টা। ওষুধ তৈরি করতে হবে। এই নিন টোকেন।"

"কী আর করা, ঘুরতে-ঘুরতে বৃকোদর হাজির হয় সামনের এক পার্কে।

চেয়ারে বসে নানা কথা ভাবতে থাকে সে। মনে পড়ে এখানে আসার আগে এদেশের চিকিৎসক আর চিকিৎসা সম্বন্ধে সে কত গল্প-ই না শুনেছে।

কলেজ হস্টেলে তার রুমমেট ছিল শক্তিনগরের রবি বিশ্বাস, আনন্দময়ীতলার সমীর ভট্টাচার্য আর কালনার ক্ষুদিরাম মণ্ডল। ওরাই রসিয়ে-রসিয়ে বলত সেসব কথা।

"ডাক্তারবাবু রোগীকে দেখে তো সেদিন খুব খুশি, 'আরে, আজ তো আপনাকে দেখে আগের থেকে অনেক ভাল লাগছে। আমার তো মনে হচ্ছে যে, যে ওষুধটা আপনাকে সেদিন দিলাম তা আপনার খুব কাজে লেগেছে। তাই না?'

"'আজ্ঞে হ্যাঁ, শিশিতে লেখা নির্দেশ আমার খুবই কাজে এসেছে।' রোগী জবাব দেয়।"

"'তাই নাকি ? তাই নাকি ?' ডাক্তারবাবু বলে ওঠেন, 'কী নির্দেশ দেওয়া ছিল ?'

"'ওষুধের ছিপি শক্ত করে আটকে রাখো।' রোগী জবাব দিয়েই সরে পড়ে।"

রবির কথা শেষ হবার আগেই সমীর গরম আলুর চপে কামড় দিতে-দিতেই বলে, "তা, এই গল্পটা শোনো তা হলে।"

"রোগী বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার ওষুধের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

"'বেশ, বেশ। খুব খুশি হলাম শুনে। ওষুধটা আপনার খুব উপকারে এল বুঝি ?'

"'না না, আমি ওষুধটা ব্যবহারই করিনি।' লোকটা বিশদ করে। 'আসলে আমার কাকা একটা শিশি খেলেন—আর, আর বুঝলেন কিনা আমিই ওঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।' হাসতে হাসতে জবাব দেয় রোগী।"

এতক্ষণ তেল মুড়ি চানাচুর গালে ফেলে ওদের কথা উপভোগ করছিল ক্ষুদিরাম। এবার সে-ও মুখ খোলে, "তোমাদের কথা শুনেই বৃকোদর তো হাঁ হয়ে গিয়েছে। ওখানকার ডাক্তারবাবুদের কথা শুনলে তো ও বেচারি মারাই পড়বে।"

বৃকোদর উস্‌খুস্ করে বলে, "বলো না কী ব্যাপার ? শুনি।"

"তা হলে শোনো তবে বলি এবার," ক্ষুদিরাম তার কথা শুরু করে, "এক মানসিক রোগের চিকিৎসক একটা বাচ্চা মেয়ের সেন্স অব ভ্যালুস জানবার জন্যে পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। তিনি একটা চকচকে নতুন পেনি একটা কোয়ার্টার আর একটা পাঁচ ডলারের বিল টেবিলের ওপর রাখলেন। এগুলো এমনভাবে সাজানো হল যেন সব থেকে কম দামেরটা প্রথমে থাকে। তারপর বাচ্চা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই তিনটের মধ্যে কোনটা তুমি নিতে চাও ?' বাচ্চাটা প্রথমে একটু দোনোমোনো করল, তারপর পেনিটা দেখিয়ে বলল, 'আমি এটা চাই।' তারপর পাঁচ ডলারের বিলটা দেখিয়ে বলল, 'অবশ্য তুমি যদি এই বিলটাকে এই কাগজে মুড়ে আমাকে দাও তো খুব ভাল হয়।'"

ক্ষুদিরামের কথা শুনে রবি আর সমীর তো হেসে গড়িয়ে পড়ল। বৃকোদরের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

রবি বলে, "এরকমই একটা গল্প আমারও শোনা। অবশ্য সেটা একটু অন্য ধরনের। তোমরা যদি শুনতে চাও তো বলি।"

আড্ডাটা তখন বেশ জমে উঠেছে। তেলেভাজা মুড়ি চানাচুর এসেছে আবার। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতেই অন্যরা বলে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলোই না শুনি তোমার নতুন গল্প।"

"একজন ডাক্তারবাবু," রবি গল্প শুরু করে দেয়, "তাঁর এক রোগীকে দেখতে গিয়েছেন সেবার। বেচারি রোগী টাকা-পয়সার ভাবনায় দিশেহারা। মানসিক দিক থেকে একেবারেই ভেঙে পড়েছে। ডাক্তারবাবু তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলেন, 'এসব ভুলে যান। একটু হাল্কা হবার চেষ্টা করুন। এই দেখুন না ক'দিন আগেই আপনার থেকেও খারাপ অবস্থার একজনকে দেখলাম। তার সমস্যা কী শুনবেন ? তিনি জামা প্যান্ট করেছেন অনেক, কিন্তু দর্জির মজুরি দিতে পারছেন না।' আমি বললাম, 'আরে এই ব্যাপার ? ওসব টাকাকড়ির কথা একদম ভুলে যান।' ব্যস, ক'দিন পরেই গিয়ে দেখি তিনি একদম ফিট। আমাকে দেখেই বললেন, 'ডাক্তারবাবু, ইউ আর রিয়েলি গ্রেট। বুঝলেন ?' ডাক্তারবাবু এবার হাসতে হাসতে জানতে চান নতুন রোগীর কাছ থেকে। 'আমিই সেই দর্জি।' বিরস বদনে এবার জবাব দেয় নতুন রোগী। ডাক্তারবাবু শুনে তো হাঁ।"

সমীর এতক্ষণ তেমন কথা বলার সুযোগ পায়নি। সে হাসতে হাসতে এবার বলে, "তবে বৃকোদর যদি রাগ না করে তবে কাশি সারানো নিয়ে ওদেশের ডাক্তারবাবুর এক গল্প বলতে পারি।"

অন্যকে নিয়ে রসিকতা করতে পারলে তা-তো সবারই ভাল লাগে। রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করে সবাই। তাই ওরা আনন্দেই মত দেয়।

"একজন ভদ্রমহিলা ধূমপান ছেড়ে দিলেন। কোনও সাবধানবাণীই তিনি শোনেননি। তবে এবার কী ব্যাপার হল ? না, ওর পোষা টিয়া পাখির কাশি হয়েছিল। অনবরত কেশে যাচ্ছিল সে। পশু-চিকিৎসক তো ভাল করে দেখলেন। দেখা গেল, তার নিউমোনিয়া বা পিসিট্রাকোসিস্ কিছুই হয়নি। তবে কী হল ? ডাক্তারবাবু জানালেন, "ওর কর্ত্রী সিগারেট খেয়ে অনবরত কাশতেন। টিয়াপাখিটাও তা নকল করে সারাক্ষণ কেশেই চলেছিল। পাখিটাকে বাঁচাতে তাই মহিলা সিগারেটই ছেড়ে দিলেন।"

"তা ওদেশে যাদের অসুখ করে তারা কি চিকিৎসা করায় না ? তাদের রোগ কি সারে না ?" ভয়ে-ভয়ে এবার জানতে চায় বৃকোদর। বন্ধুদের হাসিঠাট্টায় তার মাথা ঝিমঝিম করছে তখন।

"ও এই কথা ?" ক্ষুদিরাম বলে, "আমিই তা হলে বলি। একজন লোকের দিনের পর দিন ঘুম হচ্ছে না। বড়ই ঝামেলায় পড়েছে সে। অনেক কিছুই করেছেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু রোগ আর সারে না। দিন-দিন রোগী আরও রোগা হয়ে যাচ্ছে চিন্তা-ভাবনায়। শেষে ডাক্তারবাবু এক নতুন ওষুধ বাতলালেন। রোগীকে ডেকে বললেন, 'শুনুন, বারবাডোজের পুরনো পানীয় জোগাড় করুন কিছুটা। এবার একটা বড় কাচের গ্লাসে কিছুটা চিনি নিন। পানীয়টা ঢেলে দিন তাতে। এবার ওই গ্লাসটা গরম জল দিয়ে ভর্তি করুন। চিনিটা নাড়ুন। ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিন। তারপর আস্তে-আস্তে চুমুক দিয়ে দিয়ে ওই পানীয় পান করুন। এভাবে প্রতিঘন্টায় ওই পানীয় গ্রহণ করতে হবে আপনাকে।'

"'কিন্তু ডাক্তারবাবু ?' অসহায়ভাবে তাকায় রোগী, 'এতে কি আমার অনিদ্রা-রোগ দূর হবে ?'

"'না না, আমি তো তা বলিনি,' ডাক্তারবাবু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন ? এই যে আপনার সারারাত ঘুম হচ্ছে না, এই কাজের মধ্যে থাকলে সে-চিন্তা থেকে আপনি এভাবে মুক্ত হতে পারবেন।'"

এতক্ষণ ওদের কথায় কান দেয়নি হায়দার আলি। ঘরের এক কোণে বসে চুপচাপ কাগজপত্র ওলটাচ্ছিল সে। ওর বাড়ি শিবপুরে। এদের সবারই বন্ধু। খেলার মাঠে হঠাৎই আলাপ হয়েছিল ওদের সঙ্গে। তারপর থেকেই সময় আর সুযোগ পেলে সে-ও এসে গল্প জমায় ওদের সঙ্গে। হায়দার পড়ছে হোমিওপ্যাথি। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে বন্ধুরা কী সব নিয়ে গুলতানি করছে, তা একটু কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল সে। তারপর যখন বুঝল যে ডাক্তার আর ডাক্তারি নিয়ে সবাই খুব রঙ্গ-রসিকতা করছে, তখন সে আর ঠিক থাকতে পারল না। কাছে সরে এল। বলল, "তা স্বদেশেও কি আর এরকম উদাহরণ নেই। ক্ষুদিরামের কথাতেই আসর ভঙ্গ করা কি আর ঠিক হবে ? ওটা তো আমারই লাইনের ব্যাপার। আমিও তো দু'-চার কথা বলতে পারি। তোমরাই বলো না ?"

ওর কথা শুনে সবাই নড়ে-চড়ে বসে। রবি বলে, "তা থাকবে না কেন ?"

"শোনো বলি তা হলে, সেবার আমাদের পাশের গ্রামে একজন

ডাক্তারবাবুর কাছে এক রোগী এসে হাজির, 'ডাক্তারবাবু।'

"'কীরে, কী ব্যাপার হল তোর আবার ?' চশমাটা ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করেন ডাক্তারবাবু।

"'আচ্ছা ডাক্তারবাবু,' হাত কচলায় রোগী, 'আমি বাঁচব তো ?' বলেই ডাক্তারবাবুর পা জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে সে।

"'আরে, ছাড়, ছাড়।' ডাক্তারবাবু টেনে তোলেন তাকে। ভরসা দিতে থাকেন, 'আরে তুই বাঁচবিই। জানিস, বড়-বড় পণ্ডিতেরা বলেছেন তোর যে রোগ হয়েছে সে রোগে দশ জনের ন' জনই মারা যায়। আরে কান্না থামা তুই। শোন না, তারপর কী বলি। জানিস, এই রোগে এর আগে আমার হাতে ন' জনই মারা গেছে। তুই হচ্ছিস এ-রোগের দশ নম্বর রোগী। তুই তো বাঁচবিই।'"

আলির কথা শুনে সবাই হাসতে থাকে। আলি আবার বলে, "তা হলে বুঝতেই পারছ কেমন ব্যাপার ? তা এবার শোনো আমার কথা। সেদিন আমাদের ক্লাসেও সার একটা গল্প বললেন। এক গ্রামে একদল বরযাত্রী গিয়েছে বর নিয়ে। গাঁয়ে গিয়ে দেখে সব বাড়ির সামনেই বাতি জ্বলছে—কোথাও একটা, কোথাও দুটো, কোথাওবা সাত-আটটা। ওরা ভাবল গাঁয়ে তো আর ইলেকট্রিক লাইট নেই, সেজন্য গ্রামবাসীরা বরযাত্রীদের সুবিধার জন্য আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। এক বাড়ির সামনে গিয়ে বরযাত্রীদের একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে তো ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হল। গৃহকর্তা বেরিয়ে এসে তাকে খুব যত্নআত্তি করলেন। পরীক্ষা করলেন। বরযাত্রীদের একজন খুব উসখুস করছিল। সে আর থাকতে পারল না। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে ?'

"'বলুন, বলুন ? কী জানতে চান আমার কাছে।'

"'আচ্ছা, আপনাদের এখানে সবার ঘরের সামনে আলো জ্বলছে কেন ?'

"'ওহো, জানেন না বুঝি ? এ গাঁয়ে সবাই ডাক্তার বদ্যি হেকিম। আর যাঁর হাতে যতজন রোগী মারা গেছেন তত আলো জ্বালানো আছে তাঁর বাড়ির সামনে।'

"'কিন্তু আপনার বাড়ির সামনে আলো নেই কেন ?' ভয়ে-ভয়ে জানতে চায় বরযাত্রীটি।

"'ওহো, এই কথা ? কালই একটা বাতি জ্বলে যাবে আমার বাড়ির সামনে।' হেসে জবাব দেন গৃহকর্তা।"

আলি তার গল্প শেষ করে। সেসব ঠাট্টা রসিকতা গল্প শুনে সবার কী হাসি সেদিন ! ওদের কথা শুনে বৃকোদর সেদিন তো থ' হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এ কী দেশ রে বাবা ? এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে বোধহয় সে।

এদিকে হঠাৎই চমক ভাঙে বৃকোদরের। কখন যে পার্কের চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছে সে খেয়ালই নেই। আরে ওষুধটা যে নিতে হবে—মনে পড়ে। আধ ঘন্টা হয়নি তো ? ঘড়িতে সময় দ্যাখে। আশ্বস্ত হয়, নাঃ, এখনও ক' মিনিট সময় হাতে আছে। উঠে পড়ে সে।

এবার তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওষুধের দোকানে গিয়ে টোকেনটা ধরিয়ে দেয় বৃকোদর। টোকেন নিয়ে দোকানের লোক একটা শিশি ধরিয়ে দেয় তাকে। বৃকোদর অবাক হয়ে দ্যাখে, তাতে টাইপ করে লেখা রয়েছে ডাক্তারবাবুর নাম, তার নাম, ক' ডোজ করে খেতে হবে। আর শেষে লেখা রয়েছে ওষুধের নাম। নামটা পড়ে অবাক হয়ে যায় সে। এ আবার কী ওষুধ রে বাবা ? কোনও শক্ত অসুখ হয়নি তো তার ? একটু আনমনা হয়ে যায় বৃকোদর।

ঘোর ভাঙে লোকটার কথায়। আমরা ডাক্তারবাবুকে ফোন করেছিলাম এর মধ্যে। তিনি কনফার্ম করেছেন যে এই প্রেসক্রিপশন তাঁরই দেওয়া। সাবধানে থাকবেন। বড় ছোঁয়াচে রোগ আপনার।

সাবধানেই ছিল সে। কিন্তু ক'দিন বাদেই আবারও তার গলা খুসখুস শুরু হয়ে গেল। বৃকোদর প্রায় কেঁদে ফেলল। সেদিনও ঘরে বসেই নিজের রান্না সারছিল। তৈরি খাবার। কেবল গরম করে নিলেই হল। খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল। আবার তার সেই রোগটা দেখা দিল। অথচ শশধরবাবু মানে তার ডাক্তার বন্ধু তো একথা বলেননি। বলেছেন, "হাওয়া বদল হলে এই রোগ তোর একদম সেরে যাবে।" কিন্তু তা দেশ থেকে এত দূরে এসেও সেই রোগের হাত থেকে আর পরিত্রাণ নেই যেন !

নাঃ, এবার অন্য একজন ভাল ডাক্তারকে দেখানো দরকার। ঠিক করে ফেলে সে। হাসপাতালেই চলে এল। ই, এন, টি, স্পেশালিস্টকে দেখাবে।

"স্পেশালিস্ট ? ই, এন, টি ? ও, ঠিক আছে। কার্ড দেখি।"

"কার্ড ? কিসের কার্ড ?" বিরক্ত হয়ে বলে বৃকোদর।

"জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখিয়েছেন ? তিনি কেস্ রেফার করেছেন ?"

"তাঁকে কেন দেখাব ? তাঁকে কী দরকার ?" অবাক হবার পালা এবার বৃকোদরের।

"তাঁকে না দেখালে, তাঁর মন্তব্য ছাড়া স্পেশালিস্টকে তো কেস দেওয়া যাবে না।"

বৃকোদরের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে এসব কথা শুনে। এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা তার আগে কোনওদিনই হয়নি। ভাবল বৃকোদর, এখানে হবে না। এই লোকগুলোই আসলে বাজে ! অকারণ সময় নষ্ট। মহা ফাঁকিবাজ। স্পেশালিস্টের নাম করে কাজে ফাঁকি দেবার ধান্দা।

এসব শুনে-শুনে বৃকোদর অল্প দিনেই বুঝে গিয়েছে এদেশের হালচাল। মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছে, হেথা নয়, হেথা নয়। অন্য কোনওখানে।

তাই নিজের কাজ সামলে সময়-সুযোগ মতো একদিন সে এসে হাজির হয় মন্টভিলের ফ্লেচার ড্রাইভ-এ।

কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা। জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখিয়েই কেস রেফার করাতে হবে। রোগীকে যেতে হবে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। কিন্তু গেলেই যে ডাক্তারবাবু সঙ্গে-সঙ্গে দেখে দেবেন, এমনও নয়। আগে থেকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। তার জন্য প্রথমে যেতে হবে রিসেপ্শনিস্টের কাছে। তিনি অনুগ্রহ করে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন। তারপর ডায়রি দেখবেন। সুবিধা মতো কোনওদিন সময় খালি থাকলে সেখানে নতুন রোগীকে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন। এসবের পর এক ফর্ম ধরিয়ে দেবেন রোগীর হাতে। তাতে নিজের নাম, বাবার নাম, মা-র নাম, কারও কোনও অসুখ আছে কি না, গত পাঁচ বছরে কোনও অসুখ করেছে কি না, তাঁদের কেউ মারা গিয়ে থাকলে কোন্ রোগে মারা গেছেন, রোগীর হাইট কত, ওয়েট কত, স্মোক করেন কি না, ইনসুরেন্স কভারেজ আছে কি না ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

এসব ভাবতেই বৃকোদর খুব উত্তেজিত হয়। এই পচা দেশ থেকে পালাতেই হবে। কিন্তু ওঃ, গলার খুসখুসটা ? ওটাই যে ক'দিন থেকে খুব জ্বালাচ্ছে। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। গলার স্বর ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গিয়েছে। বন্ধুরা আগে বলত, "কী রে গলায় ক'টা ব্যাঙ পুষেছিস ? আজ সেসব ভাবতে গিয়েই কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় বৃকোদর। নাঃ, ঘাড় ঝাঁকায় সে, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

আর এই ভাবতে গিয়ে কোনওরকম ম্যানেজ করে বোঁ করে সে হাজির হয়ে যায় ডাক্তার পল ডাডলি স্মিথের চেম্বারে। ডাঃ স্মিথ কান-নাক-গলার বিশেষজ্ঞ। হাঁফাতে থাকে বৃকোদর। আরে বাবা এ এক কম ঝামেলার ব্যাপার নাকি!

বিশেষজ্ঞের চেম্বারে ঢুকে দ্যাখে বৃকোদর, আরও ক'জন বসে আছেন সেখানে। সে হল সপ্তমজন। ডাক্তারের কাছেও রয়েছেন একজন। ব্যস, কী আর এমন সময় লাগবে? মনে-মনে খুব খুশি হয় সে। হাতঘড়িতে সময় দ্যাখে। সামনে রাখা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে-পালটে দ্যাখে।

কিন্তু হায় রে কপাল! রুগির সংখ্যা যে কমছেই না। সময় যে ওদিকে নিজের ইচ্ছেতে গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে! বইয়ের সব বিজ্ঞাপন সব খবর পড়ে কান চুলকে মাথা চুলকে সময় যে আর হচ্ছে না তার জন্য। ডাক্তারবাবু একটুও সময় কি দেবেন না তাকে? অথচ এদিকে রোগীদের এক-একজন করে ডাক্তারবাবুর খাস কামরায় ঢুকছে। কিন্তু সে যেন আর বের হতেই চাইছে না। বৃকোদর খুব অধৈর্য হয়ে পড়ে। ওদিকে এ ডাক্তারকে যে না দেখালেই নয়। তার গলার খুস্‌খুস্‌টা আবারও যে জানান দিচ্ছে।

এক সময় বৃকোদরের ডাক পড়ল। বৃকোদর নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নেয়। ডাক্তার স্মিথকে দেখে বৃকোদরের খুব ভরসা হয়, ইনি নিশ্চয়ই তাকে ভাল করে দেবেন। কী সুন্দর বিরাট চেহারা! বৃকোদরের বিরাট চেহারাও তার কাছে যেন লিলিপুট!

ডাক্তারবাবুর চোখে এক বিরাট চশমা। টেবিলে নানা ধরনের বই। বৃকোদর একঝলকে দেখে নিয়েছে। ডাক্তারবাবু গম্ভীর গলায় তাকে জিজ্ঞেস করেন, "নাম কী? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"বৃকোদর। ফ্রম ইন্ডিয়া।"

"ইন্ডিয়া? আমি ইন্ডিয়ার নাম শুনেছি। টেগোর, রবিশঙ্কর, সত্যজিতের।"

শুনে বৃকোদরের বুক ফুলে ওঠে। সে মুখটা একটু হাসি-হাসি করে। কিন্তু ডাক্তারবাবু ওসব নজরই করলেন না। কথা বলতে না বলতেই ডাক্তারবাবু তাঁর হাতের কাছে রাখা একটা ম্যাপ বের করে বসেন। পৃথিবীর ম্যাপে ভারতকে খুঁজে বের করে দেখে নেন তিনি। এবার বলেন, "ইন্ডিয়ার কোন্ জায়গায় তুমি থাকো?"

"বার্নপুর।" বৃকোদর জবাব দেয়।

"বার্নপুর? ওহো বার্নপুর।" বলেই ডাঃ স্মিথ তাঁর ম্যাপ বইয়ে চোখ রেখে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই আর খুঁজে পান না জায়গাটা। হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। রেগে ওঠেন। বিড়বিড় করে কী সব যেন বলেন। বৃকোদর ভয় পেয়ে যায়। একটু সরে দাঁড়ায়। ডাঃ স্মিথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। পাশের ঘরে চলে যান। বৃকোদরের বুধ ধড়ফড় শুরু হয়েছে তখন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসেন তিনি। বগলে মোটা একটা বই।

সেই বইটাই এবার খুলে ধরেন বৃকোদরের সামনে, "তুমি কোন্ জায়গায় কোথায় থাকো দেখিয়ে দাও এবার।"

ডাক্তারবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে হকচকিয়ে যায় বৃকোদর। সে মনে-মনে ঠাকুর দেবতার নাম করতে থাকে। আর ভয়ে-ভয়ে বইটা টেনে নেয়। দ্যাখে একটা ম্যাপ-বই। সমস্ত দেশের ম্যাপ আলাদা আলাদা রয়েছে তাতে। ইন্ডিয়া বের করেই তাড়াতাড়ি বার্নপুর খুঁজতে থাকে সে।

"কী হল?" ডাক্তার স্মিথ জানতে চান।

"না, তেমন কিছু নয়।" তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেয় বৃকোদর। তারপর ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে মন দিয়ে সে চেষ্টা চালিয়ে যায়। যাক। কপাল তার ভালই বলতে হয়। আসানসোল নামটা পেয়ে গেল সে। উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে। প্রায় চেঁচিয়েই বলে, "ইয়েস্ ডক্টর। এই যে জায়গাটা দেখছেন, এর নাম আসানসোল।"

ডাক্তারবাবু থামিয়ে দেন তাকে, "তাতে কী হল? হোয়ার ইজ্ ইয়োর বার্নপুর? শো মি বার্নপুর।" ডাক্তার স্মিথ তাঁর পাইপ ঠুকতে ঠুকতে বলেন।

বৃকোদর মাথা চুলকোয়, "ডাক্তারবাবু।"

"ইয়েস, ইয়েস, ক্যারি অন ক্যারি অন।" ডাক্তার স্মিথ তার দিকে আড়চোখে তাকান।

"এই আসানসোল জায়গাটার কাছেই আমাদের বার্নপুর। ইউ সি ভেরি নিয়ার টু দিস প্লেস।"

বৃকোদর তার কথা তখনও শেষ করেছে কী করেনি, ডাক্তার পল ডাডলি স্মিথ তার হাত চেপে ধরলেন। কিছু বুঝে ওঠবার আগে ডাক্তার স্মিথ তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন একটার পর একটা ঘর ছাড়িয়ে ভেতরের দিকের একটা ঘরে। ঘরটার দেওয়াল মেঝে ছাদ জুড়ে সারা পৃথিবীর বিশাল এক ম্যাপ। ডাক্তারের অদ্ভুত শখ! মনে-মনে ভাবে বৃকোদর। ওদিকে ডাক্তার স্মিথ ঘরের কোণে রাখা এক বিরাট আলমারি খুলে সেখান থেকে বই বের করে কী সব যেন দেখছেন, খুঁজছেন। এবার একটু সাহস হয় তার। সেও মন দিয়ে গভীর উৎসাহে ম্যাপটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। কিন্তু দেখতে গিয়েই তার মুখ হাঁ হয়ে যায়।

"ডাক্তার স্মিথ।" অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে।

"ওয়েল। ইয়েস মাই বয়। হোয়াটস দ্য রং?" ডাক্তার স্মিথ এগিয়ে আসেন। জানতে চান সমস্যাটা কী?

ম্যাপে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরগুলিতে নানা রঙের পিন আটকানো। কোনওটা লাল কোনওটা বা নীল আবার কোনওটা সাদা— গুনে গুনে দ্যাখে বৃকোদর। কিন্তু কেন? ছেলেমানুষের মতো অবাক বিস্ময়ে জানতে চায় সে।

ওর কথা শুনে হা-হা করে হেসে ওঠেন ডাক্তার। প্রাণখোলা হাসি। বিরাট চেহারা হাসির দমকে কাঁপতে থাকে। হা-হা। "ভাল, ভাল, খুব ভাল প্রশ্ন করেছ তুমি।" হাসতে হাসতে বলেন তিনি। পিঠ চাপড়ে দেন তার।

"এই যে দেখছ রেড পিন হংকং শহরের গায়ে লাগানো, এর মানে হচ্ছে এই শহরের নব্বইজনেরও বেশি লোককে আমি চিকিৎসা করেছি।"

কথা বলতে বলতে ডাক্তার স্মিথ তাকে টেনে আনেন ম্যাপের গায়ে, "এই দ্যাখো। ভিভ্‌জিওয়রের সবক'জনই হাজির এই ম্যাপে। এই দ্যাখো ইন্ডিয়ার দিল্লি শহরের তিরিশজনকে দেখেছি আমি, তার জন্যে ব্লু মার্কিং। এই দ্যাখো, এই দ্যাখো উলানবাটোরের ষাটজনেরও বেশি। চুংকিং, হাইনান, পেগু, মৌলমেন, জাকর্তা, বাঙ্গালোর, ব্রিসবেন, পেশোয়ার, আম্মান, আঙ্কারা, তেহরান, কান্দাহার, কোয়েটার পঞ্চাশজনেরও বেশি লোক, বুখারেস্ট, মেলবোর্ন, রাওয়ালপিণ্ডি, টুরিন, লিয়, লিভারপুল, ভ্যালেন্সিয়া, লিসবন, ডাবলিন, সুভা, অসলো, অটোয়া, বুদাপেস্ত, প্রাগ, বন, গাটেবার্গ, কুয়ালালামপুর, সোফিয়া, সারাজিভো, তাসখন্দ, হেলসিঙ্কি, মন্টিভিডিও, লিমা, বোগোটা, ব্রাসিলিয়া, হাভানা, পোর্ট আউ-প্রিন্স, কারাকাস, কায়রো, কোনাক্রি, লসাকা, ত্রিপোলির চল্লিশজনেরও বেশি লোক। এই দ্যাখো, দ্যাখো।" এই একনাগাড়ে বলতে বলতে ছড়ি হাতে ডাক্তার সব জায়গাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি নিজেও যেন লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, আবার অন্য জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়। বলতে বলতে

ডাক্তার স্মিথ সারা দুনিয়ার সব পিন মারা জায়গাগুলো দেখিয়ে দেন।

বৃকোদরের অবসন্ন হতাশ ভাব দেখে এবার কেন জানি করুণা হয় ডাক্তারবাবুর। তিনি এসে একটু নাড়া দেন বৃকোদরকে। ঘোর কাটে তার, "ডাক্তারবাবু।" কাঁদো-কাঁদো মুখ তখন বৃকোদরের।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত ঘাবড়ে যেও না। তোমার চিকিৎসা করব আমি।" ডাক্তার আশ্বাস দেন তাকে।

"সত্যি? সত্যি বলছেন আপনি?" বৃকোদর যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না।

"ওয়েল মাই ডিয়ার বয়। তুমি দেখতেই পাচ্ছ।" ম্যাপের দিকে ফিরে তাকান তিনি, "সারা দুনিয়ায় আমার পেশেন্ট ছড়িয়ে রয়েছে। সারা পৃথিবীর লোক জানে আমার নাম। কেবল বার্নপুর, তোমার বার্নপুরের লোক আমার নাম জানে না। কিন্তু আমার নাম তারা জানবে না তাও কি হয় না কি? তুমি কী বলো?"

"ঠিক কথা, ঠিক কথা। না, না, বার্নপুরেও আপনার নাম পৌঁছে যাওয়া দরকার।"

উৎসাহে ঘনঘন মাথা নাড়ে বৃকোদর।

"ব্যস, ব্যস," ডাঃ স্মিথের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "আর এজন্যই আমি তোমার চিকিৎসা করব।"

"সত্যি বলছেন আপনি?" আনন্দে চিক্‌চিক্ করে ওঠে বৃকোদরের মুখ।

"হুম্-ম।" ডাক্তার এবার খুব গম্ভীর হয়ে যান। তারপর বৃকোদরকে একটা চেয়ারে এনে বসান। ভাল করে পরীক্ষা করতে থাকেন তাকে। তার গলার মধ্যে চামচ দিয়ে পরীক্ষা তো সব ডাক্তারই করেছেন আগে। কিন্তু ডাঃ স্মিথ অন্য নানানরকম যন্ত্রপাতি দিয়ে তার নাক কান গলা সব একটার-পর-একটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। একটা বেল্ট বেঁধে দিলেন তার গলায়। তারপরই ইলেকট্রিক আলো ফেলে-ফেলে ভাল করে গলার ভেতরটা দেখতে লাগলেন। ডাক্তার স্মিথ এত কসরত করছিলেন যে বলার নয়।

"ডাক্তারবাবু।" বৃকোদর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে। "আমার রোগটা কি মারাত্মক? সারবে তো?"

ডাক্তারবাবু বোধহয় শুনতে পাননি প্রথমে। তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বৃকোদর আবারও বলে কথাটা। এবার ডাক্তারবাবু জবাব দেন, "তোমাকে অটোভ্যাকসিন থেরাপি করাতে হবে।" ডাক্তারের নির্লিপ্ত জবাব।

"অ-টো-ভ্যা-ক্-সিন থে-থেরাপি?" ঢোক গেলে বৃকোদর। তোতলাতে থাকে সে, "সেটা আবার কী?" নিরুপায় হয়ে জানতে চায় সে।

"তোমার গলা থেকে লালা সংগ্রহ করে নেওয়া হবে। তারপর সেই লালা কালচার করে চৌষট্টিটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হবে। তিনি বিশদ করেন। জলের মতো বুঝিয়ে দেন সবকিছু।

"চৌষট্টিটা?" বৃকোদর থই পায় না, "তারপর?" বলতে গিয়েও গলায় আটকায়।

"তারপর? তারপর আবার কী? তুমি প্রতি সপ্তাহে আসবে আর একটা করে ইন্‌জেকশন নিয়ে যাবে। এ তো খুব সোজা ব্যাপার।"

"ডাক্তারবাবু?" বৃকোদর জানতে চায়। "এতে কত খরচপাতি হবে?"

বৃকোদরের কথা শুনে ডাক্তারবাবু যেন একটু থমকে যান। কী যেন ভাবতে বসেন। হিসেব করেন মনে-মনে। তারপর জবাব দেন, "ধরো আট-দশ হাজার ডলার। একটু বেশিও হতে পারে।"

"আট-দশ হাজার ডলার!" ডাক্তারের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ে বৃকোদর।

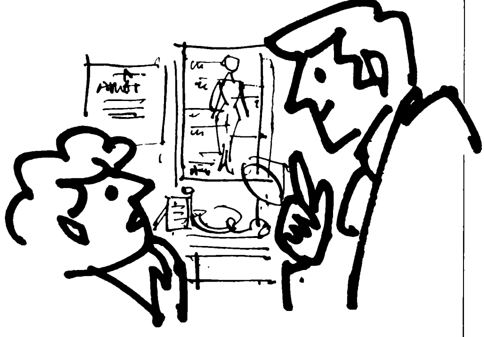

"এতেই পিছিয়ে যাচ্ছ তুমি?" ডাক্তার অবাক হন, "জানো, আরও কত খরচ করতে হয় আমার কাছে চিকিৎসা করাতে?"

"কিন্তু ডাক্তারবাবু তা তো বুঝলাম," বৃকোদর অনেকটা সহজ হয়েছে, "তবে আমার অসুখ এতে সারবে কি? কোনও গ্যারান্টি আছে?" বৃকোদর সরাসরি জানতে চায়।

"আরে বোকা ছেলে," ডাক্তার হেসে ফেলেন ওসব কথা শুনে, "গ্যারান্টি? গ্যারান্টি কে দেবে? গ্যারান্টি কি দেওয়া যায়? অতই সহজ?'

"তবে? তবে?" বৃকোদর লাফিয়ে ওঠে এবার, "তবে কেন আমি এত কষ্ট করব? কেন এত অকারণ অর্থ খরচ করব ইন্‌জেকশন নিতে?"

"আরে থামো থামো। এত চটছ কেন?" ডাক্তারবাবু তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, তারপর পাইপে এক টান দিয়ে বলেন, "দ্যাখো, চিকিৎসা করানো না-করানো তোমার ইচ্ছের ব্যাপার।" উদাসভাবে কথাগুলো বলে চুপ করেন তিনি।

"তবে আমি চলি। টাটা, গুডবাই।" হাত নাড়ে বৃকোদর। বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

"আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও।" তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরেন ডাক্তার।

"বলুন কী বলবেন?" বৃকোদর এবার তার বিরক্তি আর চাপতে পারে না।

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার স্মিথ তাকে বগলদাবা করে ফেলেন। টানতে-টানতে নিয়ে যান তাঁর ছোট ঘরের ভেতর। চেয়ারে বসিয়ে দেন বৃকোদরকে। আবার গলায় সেই যন্ত্র পরিয়ে দেন।

"আরে করছেন কী, করছেন কী?" হাঁসফাঁস করতে করতে বলে বৃকোদর।

"ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না," ডাক্তার স্মিথ তাকে অভয় দেন, "তোমার গলা থেকে লালা নিয়ে নিচ্ছি। তোমার চিকিৎসা করবই আমি। করবই।"

"কিন্তু টাকা? টাকা দেব কোথা থেকে?"

"আরে সে-কথা থাক। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে একটা ম্যাপ পাঠিয়ে দিও, যাতে বার্নপুর রয়েছে। বড় ম্যাপ হলে খুব ভাল হয়।"

কথা শুনে বৃকোদর তো ট্যারা। ওদিকে ডাক্তার পল ডাডলি স্মিথ তখন হাসছেন হোহো করে। তাঁর হাসির দমকে তখন পুরো বাড়িটাই যেন কাঁপছে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ধাঁধা

ছোট্‌কার লেখার টেবিলে দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে একগাদা বই। সবই মোটাসোটা চেহারার। কেননা, সবই অভিধান জাতীয়। কত-যে অভিধান ছোট্‌কার। হরিচরণ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, সংসদ, চলন্তিকা। সমার্থ শব্দকোষ, যথাশব্দ, মণিমঞ্জুষা। পারিভাষিক শব্দকোষ, সুবল মিত্র, ব্যবহারিক অভিধান। শুধু বাংলার জন্যই এত। এ ছাড়াও রয়েছে ইংরেজি অভিধান। সেগুলোর জন্য অবশ্য দেওয়ালে টাঙানো লম্বা একটা কাচের র‍্যাক। তাতেও সব ধরেনি। ঘরের আর-এক প্রান্তের বইয়ের র‍্যাকেও আছে নানানরকম বিদেশী অভিধান।
এবার ধাঁধা চাইতে গিয়ে দেখি, টেবিলের অভিধানগুলোর গায়ে তিনটে তাস উলটো করে আটকে রেখেছে ছোট্‌কা। পরপর তিনটে তাস। মুখ দেখা যাচ্ছে না। আমাকে দেখেই ছোট্‌কা

বলল, "আগে আমার প্রশ্নের উত্তর চাই। তারপর ধাঁধা পাবে সতুবাবু।"
আসলে, প্রশ্নের মধ্যেই যে লুকনো রয়েছে ধাঁধা, প্রশ্ন শুনেই তা বুঝলাম। সুতরাং প্রশ্নটাই বলি।
প্রথম ধাঁধা ॥ তোমার সামনে রয়েছে পরপর তিনটে উলটো-করা তাস। কিছু সূত্র বলা হচ্ছে তোমায়। যেমন—
(ক) ইশকাপনের বাঁ দিকে রয়েছে একটি হরতনের তাস।
(খ) সাহেবের ডান দিকে রয়েছে একটি টেক্কা।
(গ) রুহিতনের বাঁ দিকে রয়েছে একটি বিবি।
(ঘ) ইশকাপনের বাঁ দিকে রয়েছে সাহেব।
(ঙ) রুহিতনের ডান দিকে রয়েছে ইশকাপনের তাস।
পরপর কীভাবে রয়েছে আর তাসগুলো কী-কী, উদ্ধার করতে পারো? আর-একটা কথা, বাঁ দিকে মানে যে সবসময় গায়ে-গায়ে রাখা তাস বোঝাবে, তা নয়। একটা ডিঙিয়ে আর-একটার কথা বলা হচ্ছে, এমনও হতে পারে। এবার বলো, কার পরে কী তাস?
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ ফুল লেখক?
তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
তক্রঅচলা
গতবারের উত্তর ॥ (১) যেহেতু ডিমের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-এর মধ্যে, তাই শর্ত মিলিয়ে একমাত্র উত্তর হতে পারে ৭৮। ৭৮টি ডিম ছিল ঝুড়িতে। (২) ধকল। (৩) মটরমালা।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

এ-খেলার মূল চেহারাটা পাবে ধাঁধার রাজা স্যাম লয়েডের বইতে। সেটা তোমরা নিজেরাই পড়ে নেবে। আমরা এখানে ওই খেলারই একটা সহজ চেহারা শিখব।
অনেক এক-মাপের চৌকো কাগজ নাও। একটা রুলটানা খাতার পাতা চারভাগ করলে যেমন মাপের হয়, কাগজগুলোর টুকরো তেমন মাপের হলেই চলবে। এবার যতজন বন্ধুকে একবারে খেলাটা দেখাবে, তত টুকরো আলাদা করে নাও।
নিয়েছ? এবার প্রত্যেকটা কাগজের মাঝখানে নীচে দেখানো ছবির মতো ঘর কেটে,

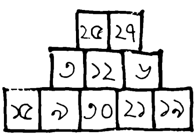

শূন্য ঘরে, যেমন দেখানো তেমন, সংখ্যাগুলো লিখে ফেলো। লিখে কাগজগুলো আবার দুটো ভাঁজ দিয়ে রেখে দাও।
ব্যস, খেলা তৈরি।
বন্ধুদের বলো, তারা প্রত্যেককে একটা করে কাগজ তুলে নিক। আগেই খুলবে না। প্রত্যেকে হাতে নিক একটা পেন বা পেনসিল। এবার তুমি 'স্টার্ট' বললেই তারা কাগজটা খুলে ফেলবে। কাগজের তিন সারিতে রয়েছে বেশ-কিছু সংখ্যা। এটা হচ্ছে চাঁদমমারি। হাতের পেন বা পেনসিল হল তীর।
বন্ধুরা এবার এমনভাবে হাতের পেন বা পেনসিল দিয়ে প্রত্যেক সারি থেকে একটা করে সংখ্যা বেছে নিয়ে তাতে দাগ দেবে, যাতে কিনা সংখ্যা তিনটের যোগফল হয় ঠিক ৫০। বেশিও হবে না, কমও হবে না।
যে আগে ঠিকমতো সংখ্যায় দাগ দিয়ে তোমার হাতে কাগজ জমা দেবে সেই জিতবে।
আসলে কোন্ তিনটে সংখ্যায় দাগ পড়বে তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছ? ঠিকই ধরেছ, ২৫, ৬ ও ১৯— এই তিনটেতে দাগ পড়বে। আর, তা হলেই যোগফল হচ্ছে ৫০।

মজারু

কত কথা

একটা শব্দের অক্ষর উলটেপালটে অন্য শব্দ তৈরির খেলাটা তোমাদের অনেকেরই ভাল লেগেছে। যতদিন জোগাড় করতে পারব ততদিন তেমন শব্দ মাঝেমধ্যে দিয়ে যাব। এবারও চারটে দিচ্ছি : (ক) সাহস। (খ)

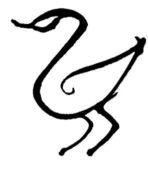

নজর। (গ) জবান। (ঘ) মালব।
এবার দ্যাখো, এগুলো থেকে কী-কী শব্দ দাঁড়ায়।

২। নীচের আটটি শব্দকে জোড় মিলিয়ে চারটি শব্দ বানাতে হবে। দুই সারিতে শব্দগুলো দেওয়া হল, ঠিকমতো জোড় মেলাও :

কাল	হংস
মায়া	সর্প
হিন্দু	কান্না
রাজ	কুশ

৩। কোন্ গাছে জল আছে?

উত্তর : ১। (ক) সহসা (খ) রজন (গ) বাজন (ঘ) বমাল। ২। কালসর্প, মায়াকান্না, হিন্দুকুশ, রাজহংস। ৩। হিজল।

কথক

ধাঁধানো ছবি

বিন্দু-চিহ্ন বরাবর লাইন টেনে যেতে হবে ১ নম্বর থেকে ৩১ নম্বর পর্যন্ত। ছবির পাতায় এখনই দেখা যাচ্ছে কিছু ছবি। লাইন টানার পর ফুটে উঠবে সম্পূর্ণ ছবিটি। তখন দেখো হুকের শেষে কী রয়েছে।

চিত্রক

হাসিখুশি

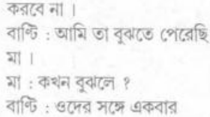

কয়েকদিনের মধ্যে ভূমিকম্প হবে এইরকম বিপদসঙ্কেত পাওয়ার পর বুবুনের বাবা বুবুনকে অনেক দূরে কাকার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকদিন পর কাকার চিঠি এল, তাতে লেখা, 'বুবুনকে ফেরত পাঠাচ্ছি, তার বদলে এদিকে ভূমিকম্প পাঠিয়ে দাও।'

মা : দ্যাখো বাণ্টি, তুমি স্কুলের বড় ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করবে না।
বাণ্টি : আমি তা বুঝতে পেরেছি মা।
মা : কখন বুঝলে ?
বাণ্টি : ওদের সঙ্গে একবার মারামারি করবার পর।

কিসের ফোটো

গত সংখ্যায় ছিল কাগজ-কাটা ছুরির হাতলের ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

ট্যানগ্রাম

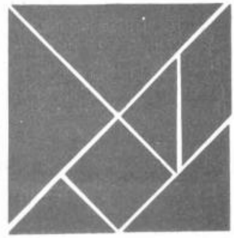

ট্যানগ্রামের সাহায্যে কিছু তৈরি করতে গেলে তোমাকে ক্রমশ দেখার শক্তি বাড়াতে হবে। আসলে সব ছবি আমাদের মনের মধ্যে জমা থাকে। তাই অল্প একটু আদল থেকেই পুরো ছবিটা দেখতে পাই। যেমন মেঘ দেখে মনের মধ্যে কত ছবি ফুটে ওঠে, কখনও মনে হয় হাতি, আবার কখনও মনে হয় বিশাল কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। তেমনই

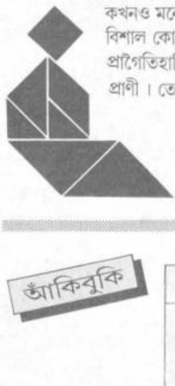

ট্যানগ্রামের সাতটা টুকরো দিয়ে মনের অসংখ্য ছবির রূপ দেওয়া যায়। এবারও কিছু মানুষের ভঙ্গিমা দেখানো হল। আর নীচে রইল আর-একটা রহস্য। সমাধান করতে পারো কি না দ্যাখো।

প্রবীর

আঁকিবুকি

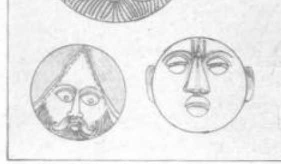

কতরকমের মানুষ

ত্রিভুজ এবং বৃত্ত দিয়ে শুধু মানুষের মুখের আদল পেয়েছিলাম আমরা। এবার দ্যাখো আঁকার পাতায় কতরকমের মানুষ। এর বাইরে তুমিও কল্পনা করে অন্যরকম মানুষ এঁকে দ্যাখো না পারো কি না!

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণীয় মানুষ, বরণীয় জীবন

জীবন জ্যোতি কথা
ইন্দিরা দেবী
ওরিয়েন্ট লংম্যান
১২ টাকা

ছোটদের প্রিয় লেখিকা ইন্দিরা দেবী'র 'জীবন জ্যোতি কথা'-য় দেশ-বিদেশের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের বর্ণময় জীবনের অংশবিশেষ রূপায়িত হয়েছে। ছোট অথচ অসাধারণ সব ঘটনা দিয়ে ভরা এঁদের জীবনকথা। ২১ জন মনীষীর জীবনী এই বইটির মধ্যে আছে। ছোটদের খুব ভাল লাগবে।

আর সহজ সরল ভাষায় লেখা এই কাহিনীগুলি গল্পের মতো করে বলেছেন লেখিকা ইন্দিরা দেবী। বুদ্ধ, মহাবীর, কনফুসিয়াস, চন্দ্রগুপ্ত, অতীশ দীপঙ্কর, সন্ত তুকারাম, গুরু নানক, যোয়ান অব আর্ক, নেপোলিয়ন, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবাজি, নেতাজি, শ্রীঅরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাশের মতো মানুষের কথা এই বইটির মধ্যে আছে। সুন্দর ছাপা, প্রচ্ছদও বেশ ভাল। সুন্দর ছবি এঁকেছেন কৃষ্ণেন্দু চাকী। সাদামাটা প্রচ্ছদ। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবার মতন এই বইটি অনায়াসে ছোটদের প্রিয় সঙ্গী হতে পারে।

কাজল চক্রবর্তী

ছন্দে গড়া হরেক ছড়া

ঘুম ভাঙা নদী
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী
অক্ষর, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-১
১০ টাকা

হরেকরকম তিরিশটি ছড়া নিয়ে বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর এই ছড়ার বই। 'ছড়া' নামের অনেক ছড়া। বাসের ছড়া, পুজোর ছড়া, ভুতুড়ে ছড়া, সব্বার ছড়া—এমনকী, ছন্নছড়া। পড়তে ভাল লাগে। বইটির নাম-ছড়া থেকে বলি, 'দরজা

খোলা পেয়ে ভোরের/ঘুম ভাঙা এক নদী/ যাচ্ছিলো ঢেউ ভেঙে ভেঙে/একলা নিরবধি।/ও নদী তুই একটা কথা/ বলিস্ মায়ের কাছে/ তার সে খোকা পথের ধুলায়/ দিব্যি সুখে আছে।' ছড়াকারের ছোট্ট পাহাড়ঘেরা ভূখণ্ড 'আগরতলা' নামে একটা ছড়াও আছে। তাতে...'শকুন্তলা ডুবু ডুবু'...'মধ্যিপাড়া জলের তল'... 'জল উঁকি দেয় প্রতাপগড়ে'। এরকম বানভাসির ছবি। বইটির মধ্যে দু-একটি মুদ্রণ প্রমাদ বড় চোখে লাগে যা ছড়া ও কবিতার বইয়ে থাকা ঠিক নয়। কৃষ্ণধন আচার্যের প্রচ্ছদ ঝকঝকে ও মনোরম। সব মিলিয়ে 'ঘুম ভাঙা নদী' ছোটদের খুব ভাল লাগবে।

উত্থানপদ বিজলী

ছোট্ট হাতের নতুন লেখা

ককরোচী
মউলি মিত্র
প্রকাশনা : মেদিনীপুর
৮ টাকা

কোনও-কোনও লেখা থাকে, যা নাকউঁচু কঠোর আলোচকেরও সংযমের বাঁধ ভেঙে দেয়। সম্ভ্রম উচ্ছ্বাস আদায় করে নেয়। 'ককরোচী' বইটি সেইরকম। মউলি নবম

শ্রেণীতে পড়ে। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান পায়। আবার সে লেখেও এবং অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে মউলি লেখিকা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে। তার সেই স্বপ্নের প্রথম প্রকাশ এই বইটি। প্রায় এক নিশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলা যায়। চোদ্দ বছর বয়সের একটি মেয়ের হাত থেকে এত চমৎকার লেখা পড়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। ককরোচীতে রয়েছে সাতটি গল্প। দুটি নাটক। লেখাগুলির পটভূমিকা, চরিত্র নির্বাচন, ভাষায়, বর্ণনায়, এক অন্য আস্বাদ।

অঞ্জন সিকদার

ছোটদের জন্য প্রয়োজনীয় বই

প্রবাদের আড়ালে
বন্দনা গুপ্ত
এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
কলকাতা-৭৩
১০ টাকা

মাঝেমধ্যে হঠাৎ এমন দু-একটি বই হাতে এসে পড়ে, যা দেখে বড় ভাল লাগে। তখন মনে হয়, শুধু ছোটদের বিনোদনের জন্যই নয়, গড়ে তোলার মতো মূল্যবান বইও একালে গুনতিতে কম হলেও ছাপা হয়।
ভাষাকে অলঙ্কৃত এবং জোরদার করতে বাংলায় প্রচুর প্রবাদ-বাক্যের ব্যবহারের কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রবাদের মাধ্যমে একটি বড় শিক্ষাও তুলে ধরা হয়েছে, যা কিশোর মনকে সৎ ও সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর প্রায় সবটাই এসেছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে।
আবার প্রাচীন এবং লৌকিক কাহিনী থেকেও মানুষের মুখে-মুখে প্রচলিত হতে-হতে একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। ফলে অনেক সময় তার অর্থ এবং চরিত্রও বদলে গেছে।
এ-সম্পর্কে লেখিকা পাঠককে সচেতন করে দিয়ে একটি যথার্থ কাজ করেছেন।
মূল্যবান বইটির মলাট মোটামুটি চলনসই হলেও, ভেতরের ছবি এবং ছাপা অত্যন্ত অগোছালো। প্রকাশক একটু যত্নবান হলে বইয়ের গুরুত্ব আরও যে বাড়ত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
ছোটদের মানসিক ও মানবিক গঠনের দিকে নজর রেখে এমন একটি পুস্তক রচনা করেছেন বলে লেখিকাকে ধন্যবাদ। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটিও চমৎকার।

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এক চামচ যোয়ানের আরকের গুণে...
কাল রাতে ভরপেট নেমন্তন্ন খেয়েও খোকনের পেটের গোলমাল হয় নি... তাই ইস্কুলও কামাই হ'ল না !
পেটের গোলমালের জন্য খোকনের কখনও স্কুল কামাই হয় না। কারণ, পেটের গোলমাল, বদহজম, অম্বল, পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর, বুকজ্বালা ... সব কিছুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সেরা ও সহজ উপায়–বেঙ্গল কেমিক্যালের অ্যাকোয়া টাইকোটিস আমি সব সময়েই বাড়িতে রাখি। এই ঘনীভূত যোয়ানের আরক নিয়মিত ব্যবহার করলে হজমশক্তি বাড়ে।
সম্পূর্ণ খাঁটি প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী, অ্যাকোয়া টাইকোটিস শরীরের কোন ক্ষতি করে না। সকলের পক্ষেই নিরাপদ–শিশুই হোক বা বৃদ্ধই হ'ন।
100 ml
AQUA PTYCHOTIS
CONC.
হাতের কাছেই রাখুন বেঙ্গল কেমিক্যালের
অ্যাকোয়া টাইকোটিস
(যোয়ানের আরক)
পঞ্চাশ বছরের বিশ্বস্ত বন্ধু
BC PL
বেঙ্গল কেমিক্যালস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
naa 8923

একটুখানি রিন বোলান....তাতেই দেখুন কাপড়ে শুভ্রতার কি চমক! সে এমন এক শুভ্রতা, যা অন্য কোনো ডিটারজেন্ট কেকের সাধ্যের বাইরে।

সুপার পাওয়ার রিন-এর মহাশক্তিই এর কারণ। সেইজন্যই তো রিন – আনে শুভ্রতার চমক বেশী, কাপড় ধোয় রাশি রাশি। আর আপনার রিন লাগে একটুখানি।

মহাশক্তি রিন

হিন্দুস্তান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন